উচ্চতর

উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান

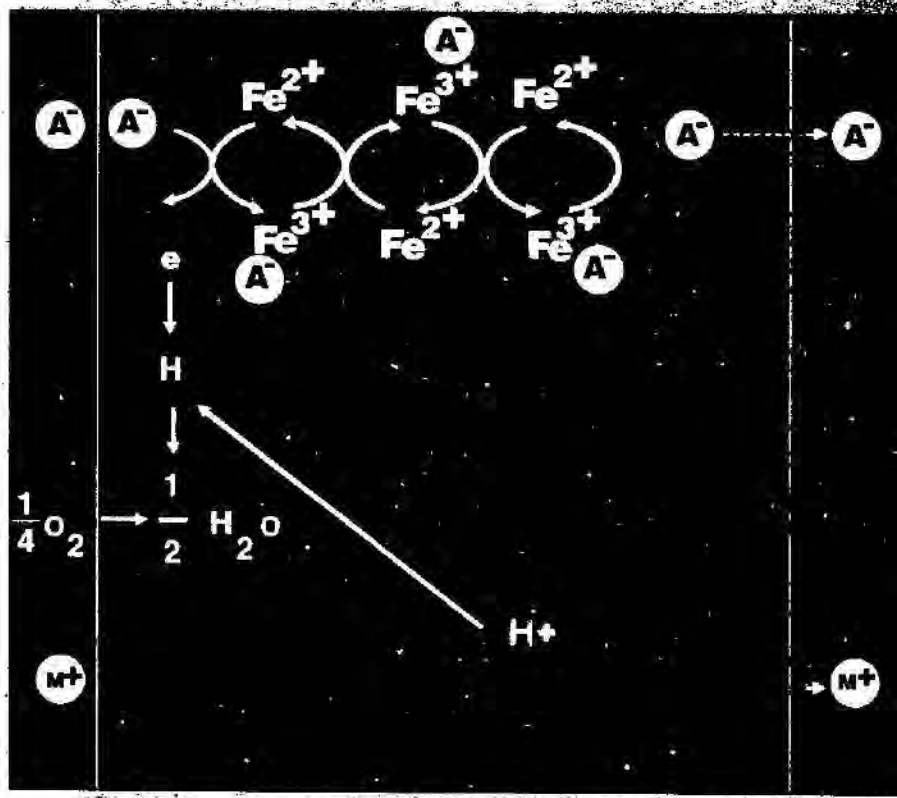

নিশীথ কুমার পাল

উচ্চতর উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান

[২য় খণ্ড]

ড. নিশীথ কুমার পাল
প্রফেসর
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

BANSDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

উচ্চতর উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)
[উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানবিষয়ক]

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪০৮/মার্চ ২০০২

বা/এ ৪২২০
(২০০১–২০০২ পাঠ্যপুস্তক : জীকচি ২)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ

জীকচি ২৯৪

প্রকাশক
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রণে
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ফাউজুল কবীর

মূল্য
একশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র

BANSDOC Library

UCCHATARA UDVID SHARIRBIJNAN (Advanced Plant Physiology) Vol. II by Dr. Nishith Kumar Paul. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : March 2002. Price : Taka 195.00 only.

ISBN 984-07-4229-9

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হলেও বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে ভাল পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা এখনও অপ্রতুল। এ কারণে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটছে। তাদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত বিষয়বস্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য তা সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটির শিরোনাম 'উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান' হলেও বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাণরসায়ন সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। একটি পৃথক গ্রন্থে উদ্ভিদ প্রাণরসায়ন সম্পর্কে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো। কলেবর অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হলো।

বর্তমান খণ্ডে (দ্বিতীয় খণ্ডে) নাইট্রোজেন বিপাক, লিপিড বিপাক, দ্রবের স্থানান্তর, বৃদ্ধি, উদ্ভিদ হরমোন, ফটোপিরিয়ডিজম, ভার্নালাইজেশন, বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও সুপ্তাবস্থা, উদ্ভিদের চলন, বায়োএনার্জেটিক ও জৈব ঘড়ি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে উদ্ভিদে পানি পরিশোষণ, রসের আরোহণ, প্রস্বেদন ও পানি নির্গমন, খনিজ পুষ্টি, খনিজ লবণ পরিশোষণ, উৎসেচক, সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনার সময় গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত লেখকদের পুস্তক এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীর সাহায্য নিয়েছি। আমি তাঁদের কাছে ঋণী। গ্রন্থটি লেখার ব্যাপারে আমার শিক্ষক-সহকর্মী প্রফেসর এ.টি.এম. নাদেরুজ্জামান ও প্রফেসর এম. শামসুর রহমান, সাবেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর যদুলাল কর্মকার পুস্তকটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থাকে তবে এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হবো। গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বাংলা একাডেমীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিশীথ কুমার পাল

BANBEDOC Library
Dhaka

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-সহকর্মী
প্রফেসর এম. মোজাহেদ হোসেন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	নাইট্রোজেন বিপাক	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	লিপিড বিপাক	৪০
তৃতীয় অধ্যায়	:	দ্রবের স্থানান্তর	৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	বৃদ্ধি	৭৩
পঞ্চম অধ্যায়	:	উদ্ভিদ হরমোন	৯৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	ফটোপিরিয়ডিজম	১৩৫
সপ্তম অধ্যায়	:	ভার্নালাইজেশন	১৬১
অষ্টম অধ্যায়	:	বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও সুপ্তাবস্থা	১৭৩
নবম অধ্যায়	:	উদ্ভিদের চলন	১৮৬
দশম অধ্যায়	:	বায়োএনার্জেটিক	১৯২
একাদশ অধ্যায়	:	জৈব ঘড়ি	২০৩
		গ্রন্থপঞ্জি	

BANDOG Library Dhaka

প্রথম অধ্যায়

নাইট্রোজেন বিপাক

উদ্ভিদদেহে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়াও নাইট্রোজেন বিদ্যমান। উদ্ভিদদেহের অধিকাংশ নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রকার জৈব-যৌগ, যেমন- প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, ক্লোরোফিল, ভিটামিন ইত্যাদি আকারে থাকে। উদ্ভিদের মোট শুষ্ক ওজনের (dry weight) শতকরা ৫ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত হলো নাইট্রোজেনঘটিত জৈব-যৌগ পদার্থ। এদের মধ্যে প্রোটিন সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে থাকে এবং এটি প্রোটোপ্লাজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোষে নানা প্রকার বিপাক কার্যের জন্য দায়ী এনজাইম প্রোটিন দ্বারা গঠিত। অনেক বীজে প্রোটিন অদ্রবণীয় সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিপাক কার্যে নাইট্রোজেন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং এর অভাবে উদ্ভিদে নানা প্রকার রোগের লক্ষণ দেখা যায়। তাই উদ্ভিদে নাইট্রোজেনের পরিশোষণ এবং নাইট্রোজেনঘটিত জৈব-যৌগের সংশ্লেষণ কার্বনের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নাইট্রোজেনের উৎস

উদ্ভিদ প্রধানত চারটি উৎস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। যথা—

১. নাইট্রেট নাইট্রোজেন : নাইট্রেট উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। মূল মৃত্তিকা থেকে নাইট্রেট আয়ন (NO_3^-) আকারে পরিশোষণ করে। নাইট্রেট আয়ন ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট (negatively charged) হওয়ায় মৃত্তিকার ক্লে (clay) এবং হিউমাস কণার সাথে আবদ্ধ থাকে না। তাই উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত না হলে নাইট্রেট বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে অন্যত্র চলে যায়।

২. অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন : মৃত্তিকায় অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+) আকারে অ্যামোনিয়া থাকে। অ্যামোনিয়াম আয়ন ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট (ক্যাটায়ন) হওয়ায় ক্লে এবং হিউমাস কণার সাথে এটি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। তাই মৃত্তিকায় অবস্থানকালে এটি ধুয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। এজন্য জমিতে অ্যামোনিয়াম সার প্রয়োগ করলে অপচয়জনিত ক্ষতি কম হয়। তবে ভালোভাবে কর্ষিত জমিতে মৃত্তিকাস্থ কতগুলো ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রিক অ্যাসিডে (HNO_3) পরিণত হয়। এ ব্যাকটেরিয়া মৃত্তিকায় নাইট্রিক অ্যাসিড নিঃসৃত করে এবং এটি হাইড্রোজেন (H^+) এবং নাইট্রেট আয়নে (NO_3^-) বিশ্লিষ্ট হয়। এ পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন (nitrification) বলা হয়। জলাবদ্ধ এবং অকর্ষিত জমিতে ব্যাকটেরিয়া ভালভাবে ক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয় বলে মৃত্তিকায় অ্যামোনিয়াম আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে।

৩. জৈব নাইট্রোজেন : কতকগুলো উদ্ভিদ অজৈব নাইট্রোজেনের সাথে সাথে জৈব নাইট্রোজেনও গ্রহণ করতে পারে। অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যামাইড (amide) নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে কাজ করে। ইউরিয়া জৈব নাইট্রোজেনের একটি প্রধান উৎস। কেউ কেউ মনে করেন যে, ইউরিয়েজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ইউরিয়া অ্যামোনিয়া এবং CO_2 এ পরিণত হয়।

$$NH_2 - \underset{\text{ইউরিয়া}}{\overset{\overset{O}{\|}}{C}} - NH_2 \xrightarrow{\text{ইউরিয়েজ}} 2NH_3 + CO_2$$

৪. **মৌল নাইট্রোজেন :** যদিও বায়ুমণ্ডলে প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, তবুও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ সরাসরি এ নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। কতিপয় ব্যাকটেরিয়া এবং নীল-সবুজ শৈবাল মৌল নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে।

নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Nitrogen fixation)

N কে নাইট্রোজেন পরমাণু এবং N_2কে ডাই-নাইট্রোজেন (dinitrogen) বলা হয়। যেসব জীব নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে, তাদেরকে ডায়াজোট্রফ (diazotroph) বলে। ডাই-নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান (প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ)। এ নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় (inert) এবং উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ কর্তৃক এটি ব্যবহৃত হয় না। কেবল সংবন্ধিত (fixed) নাইট্রোজেন, যেমন- নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে ডাই-নাইট্রোজেন (N_2) অন্যান্য পদার্থের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে সক্ষম। বায়ুমণ্ডলের মুক্ত ডাই-নাইট্রোজেনের রাসায়নিক যৌগের নাইট্রোজেনে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে। এ পদ্ধতি প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়, আবার শিল্পক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবেও হতে পারে। অতি উচ্চ তাপে (প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ সেলসিয়াস) এবং উচ্চ চাপে [প্রায় ২০০ বার (bar)] ডাই-নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি করে। এই অ্যামোনিয়া রাসায়নিক সার প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতিতে ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন দুভাবে হয়। যথা : (১) ভৌত ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন এবং (২) জীবজ ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন।

১. **ভৌত ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন** (Physical dinitrogen fixation) : প্রকৃতিতে ভৌত ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের পরিমাণ প্রায় শতকরা দশ ভাগ। প্রতিদিন পৃথিবীতে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার বার বজ্রপাত ঘটে। বজ্রপাতের সময় বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেন শক্তি বিশ্লিষ্ট করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোক্সাইল (OH) রেডিক্যাল তৈরি করে। এ মুক্ত পরমাণু ও রেডিক্যাল খুবই ক্রিয়াশীল। প্রথমে অক্সিজেন পরমাণু ডাই-নাইট্রোজেনের সাথে মিলিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) এবং পরে অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের সাথে মিলে নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড (NO_2) প্রস্তুত করে। এসব অ্যাসিড বৃষ্টির পানির সাথে মৃত্তিকায় পতিত হয় এবং মৃত্তিকাস্থ খনিজ পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে নাইট্রেট (NO_3^-) এবং নাইট্রাইট (NO_2^-) লবণ উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ নাইট্রেট হিসেবে এ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে

$$N_2 + O_2 = 2NO \text{ (নাইট্রিক অক্সাইড)}$$
$$2NO + O_2 = 2NO_2 \text{ (নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড)}$$
$$2NO_2 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$$

২. **জীবজ ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন** (Biological nitrogen fixation) : অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগ ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন জীবজ উপায়ে সংঘটিত হয়। জীবজ ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন প্রক্রিয়াকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা (ক) মুক্তজীবী (free-living or asymbiotic) এবং (খ) মিথোজীবী (symbiotic) ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন।

ক. মুক্তজীবী বা ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন : তিন প্রকারের জীব সরাসরি বায়ুমণ্ডলের ডাই-নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করতে পারে। এরা হলো ব্যাকাস দলের *Azotobacter* নামক বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়াম, ব্যাসিলাস দলের *Clostridium* নামক অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়াম এবং প্রায় চল্লিশ প্রজাতির নীল-সবুজ শৈবাল (যেমন- *Nostoc, Anabaena, Cylindrosperma, Scytonema, Calothrix* ইত্যাদি)। যেসব নীল-সবুজ শৈবাল নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে তাদের হেটারোসিস্ট (heterocyst) আছে, প্রকৃতপক্ষে হেটারোসিস্টের মধ্যেই ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধন হয়। ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া এবং শৈবাল মৃত্তিকায় বাস করে এবং এদের মৃত্যুর পর দেহমধ্যস্থ নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ পদার্থগুলো (অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন ইত্যাদি) ভেঙে মৃত্তিকায় নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়াম হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ এ নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। ধানক্ষেতে নীল-সবুজ শৈবাল নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

খ. মিথোজীবী ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন : এক্ষেত্রে ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবাল মুক্তভাবে ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে না। এরা উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূলে এবং পাতায় মিথোজীবীরূপে বাস করে। ব্যাকটেরিয়া এবং শৈবাল ডাই-নাইট্রোজন সংবন্ধন করে পোষক উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং এর বিনিময়ে পোষক উদ্ভিদ থেকে শর্করাজাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকে। এ প্রকারের সহ-অবস্থানকে মিথোজীবিতা বলে।

মিথোজীবিতা : লেগুম

দশ হাজারেরও বেশি উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতি ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী জীবের পোষক হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে Papilionaceae উপগোত্রের উদ্ভিদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এই গোত্রের শতকরা ৮৫ ভাগ, Mymoceae গোত্রের শতকরা ২৫ ভাগ এবং Sesalpinaceae গোত্রের খুব কম সংখ্যক প্রজাতি ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। সিম্বায়োটিক ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী জীবগুলো সাধারণত পোষক উদ্ভিদের মূলে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ঘটে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটির মধ্যে বাস করে, এ গুটিকে নডিউল (Nodule) বলে। দুই-তিনটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে ; যেমন- গ্রীষ্মমণ্ডলীয় লেগুম *Sesbiana rostrata* তে কাণ্ডের নডিউল তৈরি হয়। Almaceae গোত্রের *Parasponia* (প্রথমে একে ভুলবশত *Trema* বলা হতো) হলো একমাত্র অ-লেগুম উদ্ভিদ যাতে রাইজোবিয়াল মিথোজীবী আছে।

বিভিন্ন প্রজাতির *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া এই নডিউলে বাস করে। যেমন- *Pisum, Vicia, Lathyrus, Lens*-এ *Rhizobium leguminosarum, Trifolium*-এ *R. trifolii, Phaseolus*-এ *R. phaseoli. Medicago, Melilotus, Trigonella* -এ *R. meliloti, Lupinus, Ornithopus*-এ *R. Lupini, Glycine max*-এ *R. japonicum* এবং *Vigna, macroptilium* - এ 'কাউপি রাইজোবিয়া' বাস করে। কাউপি রাইজোবিয়াতে *Rhizobium*-এর অনেক প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত।

লেগুম মূলে সংক্রমণ কৌশল

লেগুম উদ্ভিদের মূলরোম দিয়ে সংক্রমণ ঘটে এবং পরে মূলরোম কুঞ্চিত হয়ে যায়। একটি নালি (একে সংক্রমণসূত্র বলে) তৈরি হয় এবং এর ভিতর দিয়ে ব্যাকটেরিয়া মূলের কর্টেক্সে প্রবেশ করে। মূলের যে অঞ্চলে এরা অবস্থান করে যেখানে বড় বড় কোষ দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটির সৃষ্টি হয়। একে নডিউল বলে। কর্টেক্সের সম্পূর্ণ জায়গা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পূর্ণ হলে

ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং এসময় এরা ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে সক্ষম। কদাচিৎ যেসব উদ্ভিদের কাণ্ডে নডিউল তৈরি হয়, সক্ষেত্রে পত্রবৃন্ত দিয়ে সংক্রমণ ঘটে। নডিউলের কোষে লাল রঙের এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে। এ রঞ্জক পদার্থকে লেগহিমোগ্লোবিন (leghaemoglobin) অর্থাৎ লেগুমের হিমোগ্লোবিন) বলে। একে অক্সিজেন পরিবহণকারী প্রোটিনও বলে। কার্যকর নডিউলে উচ্চমাত্রায় (১৫০ থেকে ৭০০ মাইক্রোমোল) লেগহিমোগ্লোবিন থাকে। এটি ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নডিউলের কোষে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়ামের দ্রুত শ্বসনের জন্য কোষের মধ্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ব্যাপনে লেগহিমোগ্লোবিন সহায়তা করে। *Parasponia*-এর নডিউলে এটি অনুপস্থিত বলেই মনে হয়।

রাইজোবিয়াল মিথোজীবিতার দুটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমটি হলো ব্যাকটেরিয়া এবং পোষক উদ্ভিদের পরস্পরকে চেনার জন্য একটি পন্থা এবং দ্বিতীয়ত, যে আক্রমণ ঘটে তা প্যাথোজেনিক নয়। বিশ্বাস করা হয় যে রাইজোবিয়ার জন্য পোষক উদ্ভিদ আকর্ষণকারী পদার্থ তৈরি করে এবং বর্ধনশীল মূলের অগ্রভাগে এক প্রকার আঠালো বস্তু তৈরি হয়। এর সাহায্যে মূলের সাথে রাইজোবিয়া ভালভাবে লেগে থাকে। রাইজোবিয়া অক্সিনের মতো এক প্রকার পদার্থ তৈরি করে, যার জন্য মূলরোম কুঞ্চিত হয়ে যায়।

নডিউলকে দুটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে—

১. **নিয়ত** (Determinate) **নডিউল** : এটি সাধারণত গোলাকার, এদের সংক্রমণ সূত্র অপেক্ষাকৃত ছোট। উদাহরণ সয়াবিনের সাথে *R. japonicum* এর নডিউল।

২. **অনিয়ত** (Indeterminate) **নডিউল** : এটি লম্বাটে, কখনো কখনো শাখান্বিত এবং সংক্রমণসূত্র দীর্ঘ। উদাহরণ মটরশুঁটির সাথে *R. leguminosarum*-এর নডিউল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদের তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদে অনিয়ত নডিউল বেশি পাওয়া যায়।

যেহেতু ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া (NH_3) কোষের জন্য ক্ষতিকারক, তাই প্রকৃতপক্ষে কোনো মুক্ত অ্যামোনিয়া জমা হয় না, এটি দ্রুত জৈব-নাইট্রোজেনে পরিণত হয়।

নিয়ত নডিউলসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় লেগুম সাধারণত ইউরিডিস (Ureides, যেমন- Allantion ও Allantoic Acid) হিসেবে সংবন্ধিত নাইট্রোজেন আত্তীকরণ করে। এদের কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত নিম্ন (C : N=1:1) এবং এ অবস্থায়ই সংবন্ধিত নাইট্রোজেন পোষক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদের অ্যাসপারজিন + গ্লুটামিনের তুলনায় ইউরিডিস কম দ্রবণীয়। এসব উদ্ভিদে প্রায় ১৮° সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায় নডিউল তৈরি হয় না এবং এর চেয়ে কয়েক ডিগ্রি কম তাপমাত্রায় এদের ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন বন্ধ হয়ে যায়।

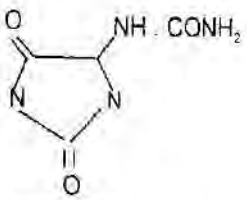

অ্যালানটোইন

সাধারণভাবে, নাতিশীতোষ্ণ লেগুমের অনিয়ত নডিউলে সংবন্ধিত ডাই-নাইট্রোজেন অ্যাসপারজিন+গ্লুটামিন হিসেবে আত্তীকরণ হয়। প্রায় ৫° সেলসিয়াসের মতো নিম্ন তাপমাত্রায়ও

এদের নডিউল তৈরি এবং ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন হয়। অ্যাসপারজিনের C : A অনুপাত হলো ২ : ১, তাই এটি কম কার্যকর মধ্যবর্তী পদার্থ (অধিক ফটোসিনথেট ব্যবহার করে) এটি অধিকতর দ্রবণীয়।

অ্যাকটিনোরাইজাল অনুষঙ্গ (Actinorhizal association) : যেসব উদ্ভিদে নডিউল তৈরি হয়, কিন্তু Leguminosae গোত্রের নয় এমন উদ্ভিদের কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই জানা গেছে। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো Fagales বর্গের অন্তর্গত *Alnus* (অ্যালডার)। এ জাতীয় উদ্ভিদের নডিউলে রাইজোবিয়া থাকে না, তবুও এরা ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এ জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদ হলো : *Shepherdia* এবং *Ceanothus* (বর্গ Rhamnales), *Myrica* এবং *Comptonia* (বর্গ Myracales), *Casuarina* Casuarinales), *Coriaria* (Coriarale), *Dryas* (Rosales) এবং অন্যান্য আরো উদ্ভিদ – ১২০টিরও অধিক প্রজাতি। এসব উদ্ভিদের কার্যকর নডিউল প্রায়ই গোলাপি বর্ণের (pink) হয় ; অ্যান্থোসায়ানিন রঞ্জক পদার্থের জন্য, লেগহিমোগ্লোবিন নয়, এই রঙ হয়। এই উদ্ভিদের নডিউলে যে অণুজীব থাকে এবং ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধন করে, তাদেরকে মাত্র ১৯৭০ দশকের শেষে শনাক্ত করা হয়েছে। এই অণুজীবগুলো ব্যাকটেরিয়ার Itreptoicites গোত্রের এর গণ *Frankia* এর অন্তর্গত।

Frankia কর্তৃক গঠিত অনুষঙ্গকে সাধারণভাবে 'অ্যাকটিনোরাইজাল অনুষঙ্গ' বলা হয়, কেননা এই অণুজীবদের সাথে অ্যাকটিনোমাইসিটির বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। মূলরোম সাধারণত (কিন্তু সবসময় নয়) কুঞ্চিত হয়। *Comptonia* এবং কতিপয় উদ্ভিদে সংক্রমণ সূত্র আছে। অনুজীবের ফিলামেন্ট কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াসকে এক পার্শ্বে সরিয়ে দেয়। সক্রিয় ডায়াজেট্রফির সাথে ফোস্কার মতো বস্তুর উপস্থিতির সম্পর্ক আছে, এটি নাইট্রোজিনেজ ক্রিয়াকলাপের স্থান বলেই প্রতীয়মান হয়। এইভাবে এরা সংক্রামিত হয়।

সায়ানোব্যাকটেরিয়াল অনুষঙ্গ (Cyanobacterial association) : ছত্রাক থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদ অন্য সব উদ্ভিদের সাথেই ডায়াজেট্রফিক সায়ানোব্যাকটেরিয়া অনুষঙ্গ তৈরি করে।

ছত্রাকের সাথে মিথোজীবিতা : একটি ছত্রাক এবং একটি শৈবালের মধ্যে মিথোজীবিতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো লাইকেন। অনেক লাইকেনে সঙ্গী হিসেবে সায়ানোব্যাকটেরিয়া থাকে এবং এগুলো আবার ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে সক্ষম। এরকম লাইকেনের ১৮টি গণ শনাক্ত করা হয়েছে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছত্রাকের থ্যালাসের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে, অথবা উপত্বকীয় স্তরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

লিভারওর্টের সাথে মিথোজীবিতা : *Blasia pusilla* এবং *Caricula densa* নামক লিভারওর্টের সাথে *Nostoc*-মিথোজীবিতা ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে বলে জানা গেছে। এই লিভারওর্টের থ্যালাসে একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর আছে। এতে *Nostoc*-এর একটি প্রজাতি থাকে এবং এরা অনেকগুলো হেটারোসিস্ট তৈরি করে।

Pteridophyta-র সাথে মিথোজীবিতা : Pteridophyta-র মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডায়াজেট্রফিক অনুষঙ্গ হলো *Azolla*, এক প্রকার ক্ষুদ্রকার পানি-ফার্ন, এবং *Anabaena* এর একটি প্রজাতির সাথে মিথোজীবিতা। *Azolla*-এর পাতার গোড়ার দিকে একটি গহ্বরে *Anabaena* বাস করে এবং অসংখ্য হেটারোসিস্ট তৈরি করে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় *Azolla-Anabaena* অনুষঙ্গ প্রতি বছর প্রতি হেক্টরে ৬০০ কেজির মতো ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

সাইকাডের সাথে মিথোজীবিতা : সায়ানোব্যাকটেরিয়ার সাথে কতকগুলো সাইকাডের মিথোজীবিতা হয় যা পূর্বে উল্লেখিত মিথোজীবিতা থেকে ভিন্নতর। পোষক উদ্ভিদের মূলে সায়ানোব্যাকটেরিয়া বাস করে এবং আক্রান্ত মূল উপরের দিকে উঠে যায় এবং গুচ্ছাকার হয়। এদেরকে কোরালয়েড মূল বলে। এক্ষেত্রে *Nostoc* ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

***Gunnera-Nostoc* মিথোজীবিতা :** গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সাথে সায়ানোব্যাকটেরিয়ার অনুষঙ্গের একমাত্র উদাহরণ হলো *Gunnera* এর সাথে *Nostoc*-এর মিথোজীবিতা। *Gunnera* এর প্রায় ৪০টি প্রজাতি আছে এবং এর বিশেষত্ব হলো যে, কাণ্ডে নডিউল তৈরি হয় এবং নডিউলে *Nostoc*-এর স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বেশি হেটারোসিস্ট হয়। এরা প্রতি বছর প্রতি হেক্টরে প্রায় ৭০ কেজি ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

মাইকোরাইজাল অনুষঙ্গ (Mycorhizal, association) : ব্যক্তবীজী উদ্ভিদসহ অনেক উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূলের সাথে ছত্রাকের মাইসেলিয়াম সংযুক্ত থাকে (একে মাইকোরাইজি বলে) যা এ সমস্ত উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন এবং কখনো কখনো এদের নডিউলের মতো বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মাইকোরাইজার সাথে মূলের ডায়াজোট্রফি সম্পর্ক আছে। যেহেতু মাইকোরাইজা ইউক্যারিওটিক, তাই এটিই একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত নন-প্রোক্যারিওটিক ডায়াজোট্রফ। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ নির্দেশ করে যে, আপাত মাইকোরাইজাল ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন হয় সম্ভবত উদ্ভিদের রাইজোস্ফেয়ারে অবস্থিত মুক্তজীবী ডায়াজোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার জন্য। তাই এই অনুষঙ্গকে সুসংগঠিত ডায়াজোট্রফিক মিথোজীবিতা বলা যাবে না।

পাতায় নডিউল অনুষঙ্গ (Leaf nodule association) : কতকগুলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ, যেমন- *Psychotria* এর পাতায় ক্ষুদ্রাকার নডিউল আছে এবং এতে ব্যাকটেরিয়া বাস করতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়ামের নাম হলো *Klbsiella rubiacearum*। এটি প্রতীয়মান হয় যে, পোষক উদ্ভিদের জন্য সুস্পষ্টভাবে উপকারী হলেও, কিন্তু এরা ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে না, তাই পাতায় নডিউল মিথোজীবিতাকে আর ডায়াজোট্রফিক বলে গ্রহণ করা হয় না।

বায়োসিনোসেস(Biocoenoses)

উপরিউক্ত অনুষঙ্গ হলো প্রকৃত মিথোজীবিতা কারণ এদের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় পরস্পরিক নির্ভরশীলতা আছে। সাধারণভাবে পোষক উদ্ভিদও অণুজীব উভয়েরই শারীরতাত্ত্বিক এবং অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন হয়। বিগত তিন দশকের গবেষণায় ডায়াজোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া এবং পোষক উদ্ভিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং কখনো কখনো প্রায় সুবিধাবাদী সম্পর্ক লক্ষ্যিত হয়েছে। এদেরকে বায়োসিনোসেস বলে। এদের মধ্যে আছে উদ্ভিদের মূলের সাথে (রাইজোসিনোসেস) অথবা পাতার (ফাইলোসিনোসেস) সাথে অনুষঙ্গ, এসব ক্ষেত্রে শারীরতাত্ত্বিক এবং অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন খুব সামান্যই হয় অথবা একেবারে হয় না, তবে একটি কিংবা উভয় অনুষঙ্গীরই কিছু উপকার হয়।

রাইজোসিনোসেস : *Paspalum notatum* এবং *Azotobacter paspali*, *Azospirillum* প্রজাতি এবং ঘাস এবং দানাশস্য।

ফাইলোসিনোসেস : যদিও পাতায় অর্বুদের মিথোজীবিতাকে ডায়াজোট্রফিক বলে প্রতীয়মান হয় না, তবে ডায়াজোট্রফসহ অন্যান্য অণুজীবের ভাল আবাসস্থল যে পাতার পৃষ্ঠ

ফাইলোস্ফেয়ার), সে বিষয়ে খুব সামান্যই সন্দেহ আছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ, যেমন– কফি, তুলা এবং আখের পাতায় *Azotobacter* থাকতে পারে।

জুসিনোসেস (Zoocoenoses)

মানুষ, গিনিপিগ এবং শূকরের মল থেকে ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথক করা হয়েছে। এগুলো আবার গবাদিপশু, ভেড়া এবং হরিণের পৌষ্টিক নালিতেও বিদ্যমান। ভেড়ার পৌষ্টিক নালি থেকে *Desulfotomaculum ruminis* পৃথক করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পোষক স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাইট্রোজেন সমতায় (balance) পৌষ্টিক নালিতে অবস্থিত ডায়াজোট্রফের খুব সামান্য অবদান আছে। প্রাণীর সাথে অনুষঙ্গের সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত উদাহরণ হলো উইপোকার সাথে অনুষঙ্গ।

সংবন্ধনকৃত নাইট্রোজেনের বৃহদাংশ ব্যাকটেরিয়া এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়া পোষক উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। এসব উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটলে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ পদার্থগুলো মৃত্তিকায় মিশে যায় এবং নানাপ্রকার জীবাণুর আক্রমণে নাইট্রেট অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখনই এ নাইট্রেট অন্যান্য উদ্ভিদ পরিশোষণ করতে পারে।

ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের প্রাণরাসায়নিক ব্যাখ্যা

ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধনের প্রাণরাসায়নিক ধাপগুলো এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে জানা সম্ভব হয় নি। নিচে যে ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধনের প্রাণরাসায়নিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং কোথাও কোথাও কাল্পনিক। তবে ডাইনাইট্রোজেন সংবন্ধনের তিনটি প্রধান ধাপের অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

প্রথম ধাপে নাইট্রোজিনেজ বিক্রিয়ার জন্য শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এ শক্তি বিজারিত ফেরিডোক্সিনে (ferredoxin) জমা থাকে।

দ্বিতীয় ধাপে বিজারিত ফেরিডোক্সিন থেকে বিজারণ ক্ষমতা একটি অজ্ঞাত ইলেক্ট্রন অ্যাকটিভেটরে স্থানান্তরিত হয়। একে X নামে অভিহিত করা হয় এবং এটি ভিন্ন এক প্রকার পদার্থ হতে পারে, তবে কারো কারো মতে এটি নাইট্রোজিনেজ এনজাইমের একটি সক্রিয় অংশ। নাইট্রোজিনেজ এনজাইমের গঠনশৈলী বেশ জটিল এবং এটা দুপ্রকার প্রোটিন দ্বারা গঠিত, উভয়েই গাঢ় ধূসর রঙের এবং একটি ছাড়া অপরটি সক্রিয় নয়।

উভয়েই জটিল প্রোটিন : বড় প্রোটিনটি চারটি এবং ছোট প্রোটিনটি দুটি সাব-ইউনিট দ্বারা গঠিত। উভয় প্রোটিনেই লোহা ও সালফার পরমাণু আছে। বড় প্রোটিনটিতে প্রতি অণুর জন্য দুটি করে মলিবডেনাম (Mo) পরমাণু আছে। ম্যাগনেসিয়াম (Mg^{2+}) হলো নাইট্রোজিনেজের অপর একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

'X' এর প্রকৃতি যাই হোক না কেন, বিজারিত অবস্থায় এটি ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের তৃতীয় ধাপে ইলেক্ট্রন প্রদান করে, যার ফলে ডাই-নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াতে (NH_3) পরিণত হয়। এটি নাইট্রোজিনেজ এনজাইমের অপর সক্রিয় অংশে (Y) হতে পারে।

বিভিন্ন জীবাণুতে বিভিন্নভাবে ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ATP এবং বিজারিত ফেরিডোক্সিন তৈরি হয়। নীল-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া) সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে বলে এরা সালোকসংশ্লেষণের আলোক পর্যায় থেকে সরাসরি ATP এবং বিজারিত ফেরিডোক্সিন পায়। ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারীর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে *Clostridium pasteurianum* নামক ব্যাকটেরিয়ামের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। এ ব্যাকটেরিয়ামের কোষের নির্যাস ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে সক্ষম। এ নির্যাসে পাইরুভিক অ্যাসিড

সরবরাহ করলে ATP এবং বিজারিত ফেরিডোক্সিন তৈরি হয়। এ প্রক্রিয়ার কিছু অংশ শ্বসনে আলোচিত পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেটিভ ডিকার্বোক্সিলেশনের মতোই।

প্রথমে পাইরুভিক অ্যাসিড থায়ামিন পাইরোফসফেটের (TPP) সাথে বিক্রিয়া করে থায়ামিন পাইরোফসফেট কমপ্লেক্সে পরিণত হয় এবং পরে এতে ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

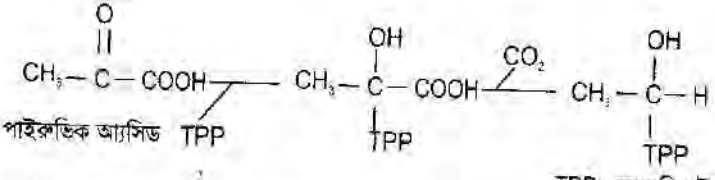

TPP - অ্যালডিহাইড কমপ্লেক্স

পরের ধাপে TPP অ্যালডিহাইড কমপ্লেক্স কোএনজাইম-এ পরিণত হয়। কিন্তু সবাত শ্বসনে আলোচিত পথের তুলনায় এ পথ ভিন্নতর। এক্ষেত্রে লাইপয়িক কিংবা ইলেক্ট্রন প্রবাহতন্ত্র অংশগ্রহণ করে না। এদের পরিবর্তে *C. pasteurianum*-এ (এটি অবায়ুজীবী) TPP-অ্যালডিহাইড কমপ্লেক্সের জারণের সাথে সাথে ফেরিডোক্সিন বিজারিত হয়।

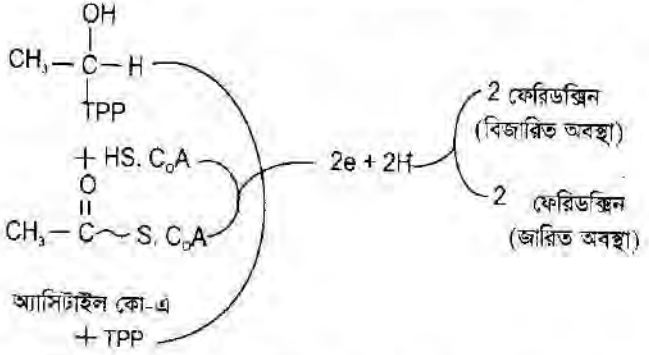

এ জীবে ক্রেবস্ চক্র অনুপস্থিত থাকায়, প্রথমে অ্যাসিটাইল কো-এ অজৈব ফসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিটাইল ফসফেট তৈরি করে।

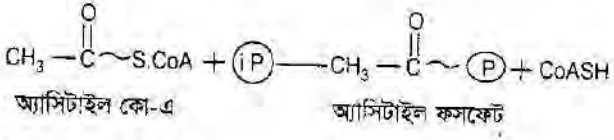

পরের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটাইল ফসফেট থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেট ADP তে স্থানান্তরিত হয়।

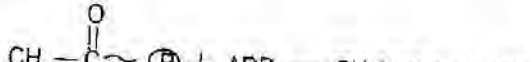

ইলেক্ট্রন অ্যাকটিভেটর X সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানা গেছে। বিজারিত ফেরিডোক্সিন X বিজারিত করে। এ বিজারণের সময় ATP ব্যবহৃত হয়।

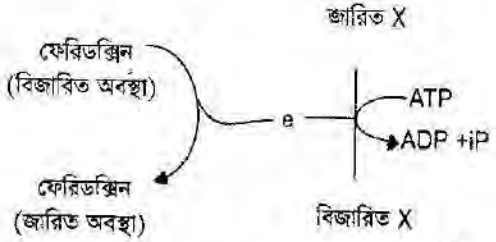

বিজারিত X-এর বিজারণের ক্ষমতা খুবই বেশি। ১.১ চিত্রে ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের পথ দেখানো হয়েছে।

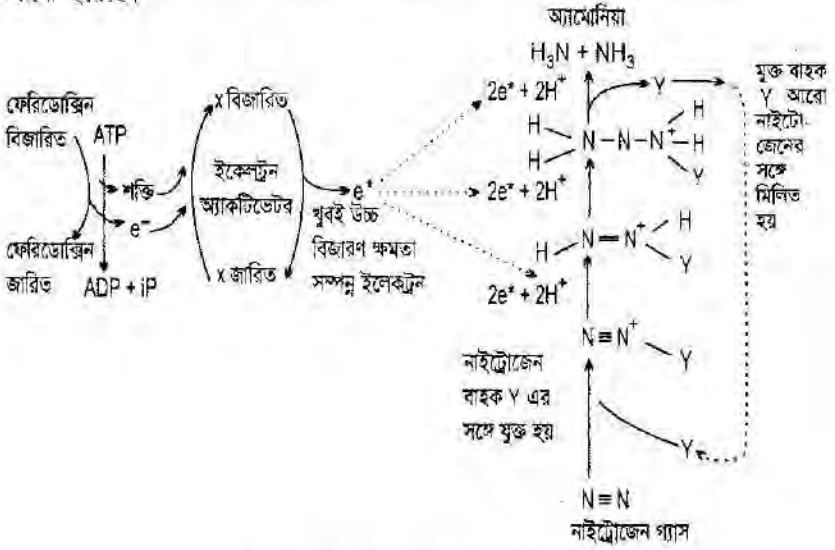

চিত্র ১.১ : ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের কল্পিত পথ

এক অণু ডাই-নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ায় বিজারিত করতে ৬টি ইলেক্ট্রনের প্রয়োজন হয়।

$$6C + 6H^+ + N_2 \longrightarrow 2NH_3$$

এ প্রক্রিয়া এক ধাপে সম্পন্ন হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। সম্ভবত নিম্নলিখিত ধাপের জোড়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয় :

$$N_2 \xrightarrow[2e]{2H^+} HN=NH \xrightarrow[2e]{2H^+} H_2N-NH_2 \xrightarrow[2e]{2H^+} 2NH_3$$

ডাই-ইমাইড হাইড্রাজিন অ্যামোনিয়া

ডাই-ইমাইড এবং হাইড্রাজিনের অস্তিত্ব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। এর কারণ সম্ভবত বাহকের সাথে ডাই-নাইট্রোজেনের যুক্ত হওয়া থেকে পরিশেষে অ্যামোনিয়া যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী পদার্থগুলো (intermediates) খুব দৃঢ়ভাবে বাহক Y–এর সাথে লেগে থাকে। বাহকের সাথে লেগে থাকা নাইট্রোজেন সম্ভবত তিনবার (চিত্র ১) বিজারিত হয়। ইলেক্ট্রন অ্যাকটিভেটর X থেকে মুক্ত ইলেক্ট্রন খুবই বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এটি ধাপে ধাপে ডাই নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে।

নাইট্রেটের বিজারণ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে নাইট্রেট (NO_3^-) পরিশোষণ করে। কিন্তু উদ্ভিদে এ অবস্থায় নাইট্রোজেন আত্তীকরণ হয় না। নাইট্রেট বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়াতে পরিণত এবং এ অ্যামোনিয়া নানা প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ সংশ্লেষণে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। নাইট্রেট থেকে অ্যামোনিয়া রূপান্তরের পথ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\underset{\text{নাইট্রেট}}{NO_3} \xrightarrow[\text{রিডাকটেজ}]{\text{নাইট্রেট}} \underset{\text{নাইট্রাইট}}{NO_2} \xrightarrow[\text{রিডাকটেজ}]{\text{নাইট্রাইট}} \underset{\text{হাইপোনাইট্রাইট}}{HNO} \longrightarrow \underset{\text{হাইড্রোঅক্সাইল -অ্যামিন}}{NH_2OH} \xrightarrow[\text{রিডাকটেজ}]{\text{হাইড্রোঅক্সাইল অ্যামিন}} \underset{\text{অ্যামোনিয়া}}{NH_3}$$

উপরোক্ত মধ্যবর্তী বস্তুগুলোর (intermediates) মধ্যে হাইপোনাইট্রাইটের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

নাইট্রেট রিডাকটেজ এক প্রকার জটিল এনজাইম (আণবিক ওজন ২০০ থেকে ৩০০ কিলোড্যাল্টন) এবং এতে FAD, হিম (heme, Cyt. b_{557}) এবং মলিবডেনাম (Mo) আছে। NAD(P)H (সালোকসংশ্লেষণ অথবা শর্করার জারণে সৃষ্ট) হতে ইলেক্ট্রন, এনজাইমের ইলেক্ট্রন, পরিবহণ শৃঙ্খলের মাধ্যমে নাইট্রেটে স্থানান্তরিত হয়।

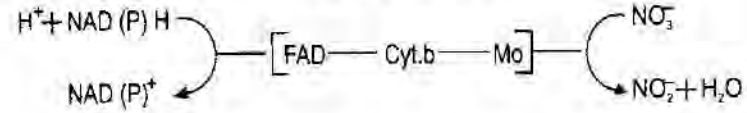

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে নাইট্রেট রিডাকটেজ হয় সাইটোপ্লাজমে না হয় ক্লোরোপ্লাস্টে। ক্লোরোপ্লাস্টের বহিঃস্থ ঝিল্লিতে এটি হাল্কাভাবে লেগে থাকে।

নাইট্রাইট রিডাকটেজ এনজাইমে (আণবিক ওজন প্রায় ৬০ কিলোড্যাল্টন) একটি টেট্রানিউক্লিয়ার লোহা-সালফার কেন্দ্র এবং সিরোহিম (siroheme) আছে। এক্ষেত্রে বিজারিত ফেরিডোক্সিন ইলেক্ট্রন দাতা হিসেবে কাজ করে। বিজারিত ফেরিডোক্সিন থেকে নাইট্রাইটে ইলেক্ট্রন পরিবহণ নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে।

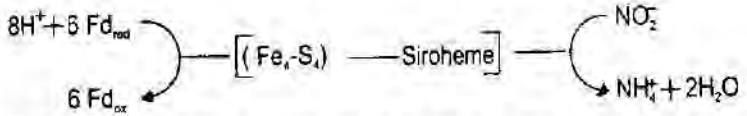

সম্প্রতি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মুক্ত মধ্যবর্তী বস্তু ছাড়াই নাইট্রাইট সরাসরি বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। সালোকসংশ্লেষী নাইট্রাইট রিডাকটেজ নামক এনজাইমটি ক্লোরোপ্লাস্টে উপস্থিত থাকে। একটি ফেরিডোক্সিন নির্ভরশীল নাইট্রাইট রিডাকটেজ মূলের কলাতেও থাকে।

অ্যামাইনো অ্যাসিড

উদ্ভিদে অনেক ধরনের রাসায়নিক যৌগ থাকে। তবে গুরুত্বপূর্ণ নাইট্রোজেনঘটিত জৈব পদার্থের মধ্যে প্রোটিন একটি। প্রোটিন অণু খুবই বৃহৎ এবং এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সালফারের সমন্বয়ে গঠিত। অ্যামাইনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি কার্বোক্সাইল গ্রুপ (-COOH) এবং একটি অ্যামাইনো গ্রুপ ($-NH_2$) থাকে। এর সাধারণ সংকেত নিম্নরূপ :

$$R-\underset{\displaystyle NH_2}{\overset{\displaystyle H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH$$

উপরোক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো প্রাথমিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। কেননা কার্বোক্সিল গ্রুপের সন্নিকটবর্তী কার্বনের (আলফা-কার্বন) সাথে অ্যামাইনো গ্রুপ ($-NH_2$) যুক্ত থাকে। R-এর বিভিন্নতার জন্য প্রাথমিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ R একটি সাধারণ হাইড্রোজেন অণু হতে পারে অথবা জটিল জৈব গ্রুপও হতে পারে। গ্লাইসিন ($NH_2-CH_2.COOH$) একটি সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেখানে R=H। এখন পর্যন্ত সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে যে, উদ্ভিদের প্রোটিনে মাত্র কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। ১.১ টেবিলে এই কুড়িটি অ্যামাইনো এসিডের গঠন দেখানো হয়েছে।

যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনে থাকে তা আবার অনেক কোষে মুক্ত অবস্থায়ও থাকতে পারে। কতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের উপাদান নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদে কমপক্ষে দুশোটি এরকম অ্যামাইনো অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরকম অ-প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো এল-অরনিথিন এবং এল-সাইট্রুলিন, এরা ইউরিয়া বিপাকের মধ্যবর্তী বিপাকীয় বস্তু এবং আরজিনিনের জৈব সংশ্লেষণে অংশ নেয়। অ্যালানিনের একটি আইসোমার, বিটা-অ্যালানিন, কোষে মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং ভিটামিন প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, কোএনজাইম-এ এবং অ্যাসাইল কেরিয়ার প্রোটিনের একটি উপাদান হিসেবেও থাকে।

ব্যাকটেরিয়া এবং উদ্ভিদ কুড়িটি প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষণ করতে সক্ষম। কিন্তু প্রাণীরা এসব অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষণ করতে পারে না বলে নয়টি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। এই নয়টি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো লাইসিন, আইসোলিউসিন, মিথিওনিন, থ্রিওনিন, আরজিনিন, ফিনাইল অ্যালানিন, ট্রিপটোফ্যান, লিউসিন এবং ভ্যালিন। সত্যিকার অর্থে টাইরোসিন এবং সিস্টেইন হলো অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড, কিন্তু এ দুটি যথাক্রমে ফিনাইল অ্যালানিন এবং মিথিওনিন থেকে সংশ্লেষিত হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার অ্যামইনো অ্যাসিডের গঠন সারণি ১.১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১.১ : বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন

	নাম	গঠন
ক.	মনোঅ্যামাইনো মনোকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড	
১.	গ্লাইসিন	NH_2-CH_2-COOH
২.	অ্যালানিন	$CH_3-CH(NH_2)-COOH$
৩.	ভ্যালিন	$(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$
৪.	লিউসিন	$(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$
৫.	আইসোলিউসিন	$CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(NH)-COOH$
খ.	মনোঅ্যামাইনো ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড	
৬.	গ্লুটামিক অ্যাসিড	$HOOC-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$
৭.	অ্যাসপারটিক অ্যাসিড	$HOOC-CH_2-CH(NH_2)-COOH$
গ.	ডাইঅ্যামাইনো মনোকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড	
৮.	আরজিনিন	$H_2N-C(=NH)-NH-CH_2-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$
৯.	লাইসিন	$H_2N-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$
ঘ.	হাইড্রোঅক্সিল সম্বলিত	
১০.	থ্রিওনিন	$CH_3-CH(OH)-CH(NH_2)-COOH$
১১.	সেরিন	$CH_2(OH)-CH(NH_2)-COOH$

৬. সালফার সম্বলিত

১২. সিস্টিন

১৩. সিস্টেইন

১৪. মিথিওনিন

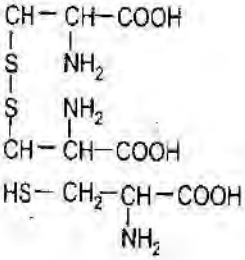

৮. অ্যারোমেটিক

১৫. ফিনাইল অ্যালানিন

১৬. ট্রায়োসিন

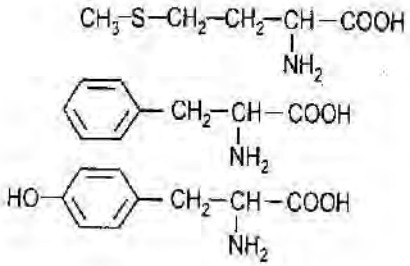

ছ. হেটারোসাইক্লিক

১৭. ট্রিপটোফ্যান

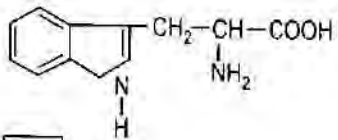

১৮. প্রোলিন

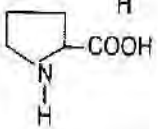

১৯. হাইড্রোক্সি প্রোলিন

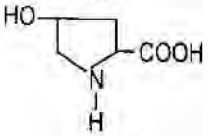

২০. হিস্টিডিন

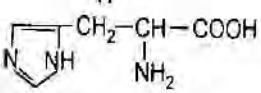

অ্যামাইনো অ্যাসিডের ধর্মাবলি

সহজে পরিদৃষ্ট হয় এমন দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের ধর্ম, এদের গঠন সম্পর্কে (কঠিন এবং দ্রবণে উভয় অবস্থায়) তথ্য প্রদান করে। যেমন– কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া অ্যামাইনো অ্যাসিড সাধারণত পানিতে দ্রবণীয় এবং মৈব-দ্রাবক, যেমন– ইথার, ক্লোরোফরম এবং অ্যাসিটোনে অদ্রবণীয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠনের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি ভৌত ধর্ম হলো এদের উচ্চ গলনাঙ্ক।

দ্রবণে অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠন পরীক্ষা করে ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের আচরণ ভালভাবে বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ অ্যালানিনে যেহেতু একটি কার্বোক্সাইল এবং একটি অ্যামাইনো গ্রুপ থাকে, তাই এটি অ্যাসিড এবং ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে।

এরকম যৌগকে অ্যাম্ফোটেরিক (amphoteric) পদার্থ বলে। যদি কিছু পরিমাণ কঠিন অ্যালানিনকে পানিতে দ্রবীভূত করা হয়, তাহলে এই দ্রবণে pH প্রায় নিরপেক্ষ (neutral) হবে। যদি এই দ্রবণে ইলেক্ট্রোলাইট রাখা হয় এবং ইলেক্ট্রোড বরাবর পটেনশিয়ালের একটি পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সরে যাবে না। এটি প্রমাণ করে যে, অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো নিরপেক্ষ অণু, কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যালানিনকে বলা হয় জুইটারআয়ন (Zwitterion)।

অ্যালানিন (আধানবিহীন) অ্যালানিন (জুইটারআয়ন)

অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংশ্লেষণ

নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষণ হয়। যথা : (১) রিডাকটিভ অ্যামাইনেশন (reductive amination) এবং (২) ট্রান্সঅ্যামিনেশন (transamination)।

১. **রিডাকটিভ অ্যামাইনেশন :** এ পদ্ধতিতে কোনো কিটোঅ্যাসিড (এটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতোই, তবে আলফা-কার্বনের সাথে অ্যামাইনো গ্রুপের পরিবর্তে একটি অক্সিজেনের পরমাণু যুক্ত থাকে) প্রথমে অ্যামোনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে ইমাইনো (imino) অ্যাসিড তৈরি করে ; পরের ধাপে এটি বিজারিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। এ বিক্রিয়া বিপরীতমুখী এবং নিম্নরূপ—

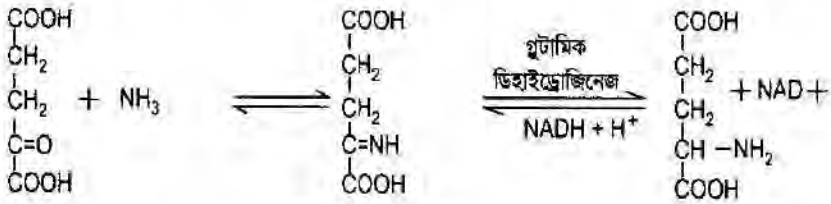

আলফা - কিটো - গ্লুটারিক অ্যাসিড | আলফা - ইমাইনো - গ্লুটারিক অ্যাসিড | গ্লুটারিক অ্যাসিড (অ্যামাইনো অ্যাসিড)

প্রথম ধাপটি সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, কিন্তু দ্বিতীয় ধাপটি গ্লুটামিক ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড ছাড়াও আরো কয়েকটি কিটো-অ্যাসিড রিডাকটিভ অ্যামাইনেশন পদ্ধতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে। তবে এদের গুরুত্ব খুবই সীমিত।। যেমন–

অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড + NH_3 ⇔ অ্যাসপারটিক অ্যাসিড

ফিউমারিক অ্যাসিড + NH_3 ⇔ অ্যাসপারটিক অ্যাসিড

পাইরুভিক অ্যাসিড + NH_3 ⇔ অ্যালাইনিন

২. ট্রান্সঅ্যামিনেশন : এ পদ্ধতিতে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপ একটি কিটো অ্যাসিডের কার্বোনাইল গ্রুপে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে গ্লুটামিক অ্যাসিড অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড তৈরি করে। ট্রান্সঅ্যামিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং পাইরিডক্সাল ফসফেট (pyridoxal phosphate) কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে। বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো :

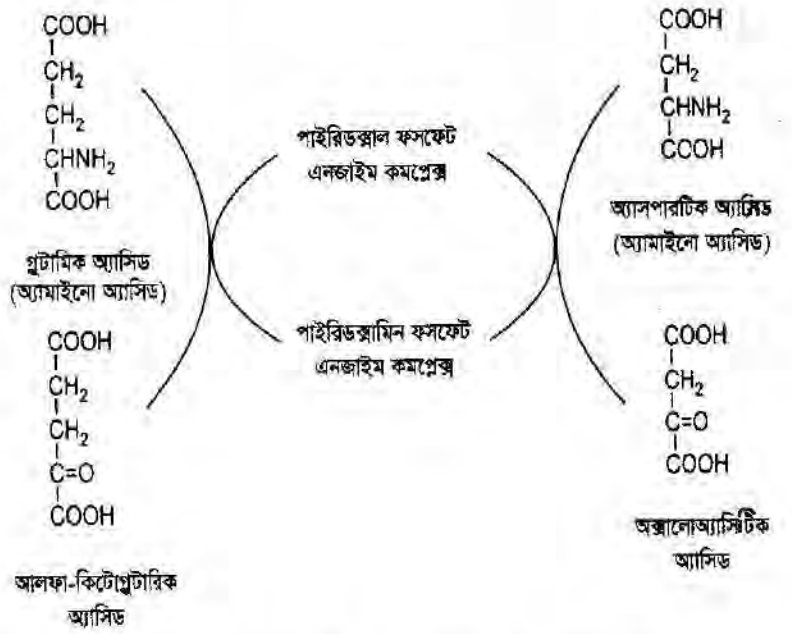

উপরোক্ত বিক্রিয়া ছাড়াও আরো কয়েকটি ট্রান্সমিনেজ বিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন–

গ্লুটামিক অ্যাসিড + পাইরুভিক অ্যাসিড $\xrightarrow[\text{এনজাইম}]{\text{ট্রান্সমিনেজ}}$ অ্যালানিন (অ্যামাইনো অ্যাসিড) + আলফা-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড

প্রোটিন (Protein)

প্রোটিন উচ্চ আণবিক ওজনসম্পন্ন (৫,০০০ থেকে ৫০,০০,০০০) অতিকায় অণু। অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড পরপর জোড়া লেগে প্রোটিন অণু গঠন করে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রমবিন্যাস এবং সংখ্যার জন্য প্রোটিনের বিভিন্নতা হয়। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সাইল গ্রুপ অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে। এ ধরনের বন্ধনী প্রোটিন অণুতে যার বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে পেপটাইড (peptide) বন্ধনী বলে।

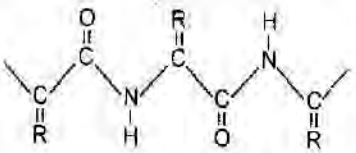

পেপটাইড বন্ধনী

একটি যৌগের মধ্যে যদি দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে, তবে ঐ যৌগকে ডাইপেপটাইড বলে ; তিনটি থাকলে ট্রাইপেপটাইড এবং অনেকগুলো থাকলে পলিপেপটাইড বলে। প্রোটিন অণুতে অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে বলে প্রোটিনকে পলিপেপটাইডও বলে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়।

প্রোটিনের কার্যের ভিন্নতা : সবগুলো প্রোটিন কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে তৈরি হলেও সব জীবজ যৌগের মধ্যে প্রোটিনের কার্যের সবচেয়ে বেশি ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এদের কার্যের ভিন্নতার সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো হাজার হাজার এনজাইমের প্রত্যেকটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং এটি আবার একটি সুনির্দিষ্ট প্রোটিন। তাই বিভিন্ন প্রকার এনজাইম সম্পর্কবিহীন অনেক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, যেমন– একটি C–C বন্ধনী তৈরি, একটি ইস্টারের আর্দ্রবিশ্লেষণ, একটি অ্যালকোহলের জারণ অথবা একটি অ্যারোমেটিক বলয়ের হাইড্রোক্লিলেশন। প্রোটিন বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রতিটি একটি নির্দিষ্ট পদার্থকে বহন করে, যেমন– অক্সিজেন, একটি ধাতব আয়ন অথবা একটি মেটাবোলাইট। অন্যান্য প্রোটিন ঝিল্লিতে অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট যৌগের রিসেপটর হিসেবে কাজ করে। কোষে অণুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন জীবের জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায় বলে শরীর থেকে রক্তের অপচয় কম হয়।

প্রোটিনের গঠন : সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটি প্রোটিন অণুর জীবজ ধর্মাবলি এর গঠনের সাথে সম্পর্কিত। প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুগুলো একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। কোনো কোনো প্রোটিনে আবার একাধিক পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে এবং এটি বিশেষ ধরনের কৌণিক যোজক (ডাইসালফাইড বন্ধনী) দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। পলিপেপটাইড অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাসকে বলা হয় প্রোটিনের প্রাইমারি গঠন ভঙ্গিমা।

অনেক গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, পেপটাইড এবং ডাইসালফাইড বন্ধনীই প্রোটিনে একমাত্র সংযোজক নয়, এবং এই প্রাইমারি গঠন ভঙ্গিমা প্রোটিনের সব জৈব–রাসায়নিক আচরণ ব্যাখ্যা করতেও সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনে যেসব বল ক্রিয়া করে সেসব ছাড়াও আরো কিছু ভৌত–রাসায়নিক বলের প্রভাবে প্রোটিন অণুতে পলিপেপটাইডগুলো এক বিশেষ ধরনের পেঁচানো আকৃতি (helical shape) গঠন করে, একে বলা হয় প্রোটিনের সেকেন্ডারি গঠন ভঙ্গিমা। প্রোটিনের চিত্তাকর্ষক জীবজ ধর্মাবলির অধিকাংশই এই সেকেন্ডারি গঠনের দরুন হয়।

প্রোটিনের এই সেকেন্ডারি গঠন ভঙ্গিমায় হাইড্রোজেন বন্ধনীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর একই সাথে দুটি তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণুর (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা থেকেই হাইড্রোজেন বন্ধনীর সৃষ্টি। হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে মোটে একটি ইলেক্ট্রন। হাইড্রোজেন যখন এই ইলেক্ট্রনটির দ্বারা সমযোজ্যতা (covalency) মাধ্যমে কোনো তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সাথে যুক্ত হয় তখন তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের পরমাণুটি হাইড্রোজেন ও তার মধ্যেকার ইলেক্ট্রন যুগলকে (electron pair) নিজের দিকে বেশির ভাগ টেনে নিতে সমর্থ হয়। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুটি খানিকটা ধনাত্মক আধান প্রাপ্ত হয়। এই ধনাত্মক আধানের জন্যই হাইড্রোজেন পরমাণু তখন অপর কোনো ঋণাত্মক পরমাণুকে স্থির বৈদ্যুতিক বলের সাহায্যে আকর্ষণ করতে পারে এবং হাইড্রোজেন বন্ধনী সৃষ্টি হয়।

স্বতন্ত্রভাবে হাইড্রোজেন বন্ধনী খুবই দুর্বল ; এর বন্ধনী শক্তি প্রতি গ্রাম অণুতে মাত্র ৫ থেকে ১০ কিলোক্যালরি। কিন্তু প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডের মতো অতিকায় অণুতে একে অন্যের মিলিত প্রয়াসে শক্তিশালী করে তোলে এবং প্রোটিনের কুণ্ডলাকার গঠনকে সুস্থায়ী হতে সাহায্য করে। পলিপেপটাইডের হাইড্রোজেন বন্ধনী গঠিত হয় সাধারণত একটি পেপটাইডের নাইট্রোজেন সংলগ্ন হাইড্রোজেন পরমাণু এবং অপর একটি পেপটাইডের দ্বিযোজী অক্সিজেন পরমাণুর সাথে। হাইড্রোজেন বন্ধনী ছাড়াও, লবণ সংযোগ (salt link) এবং ভ্যানডার ওয়ালস বলও কুণ্ডলাকার গঠন বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কুণ্ডলাকার বা বিস্তৃত শৃঙ্খল পলিপেপটাইড অণু কিভাবে একে অপরের সাপেক্ষে বিন্যস্ত থাকে তাই নিয়ে প্রোটিনের টারশিয়ারি পর্যায়ের গঠন ভঙ্গিমা। একাধিক কুণ্ডল বৈদ্যুতিক তারের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে থাকতে পারে। আবার বিস্তৃত শৃঙ্খল পলিপেপটাইড একে অন্যের সমান্তরালে জুড়ে গিয়ে জড়ানো চাদরের আকার (pleated sheet) নিতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, কুণ্ডলাকার ও বিস্তৃত শৃঙ্খল অণুগুলো পরস্পর জড়িয়ে পেঁচিয়ে এক অপরূপ ভঙ্গিমা নেয়। টারশিয়ারি পর্যায়ের গঠনভঙ্গিমার এসব ক্ষেত্রেই আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পলিপেপটাইড কুণ্ডলীটি আবার আরো অন্যান্য অসমযোজী (non-covalent) বন্ধনী দ্বারা দৃঢ় হয়। এসব পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াও (interaction) প্রোটিনের টারশিয়ারি গঠনভঙ্গিমার অন্তর্গত। জীবজ ক্রিয়াকলাপে প্রোটিনের সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি পর্যায়ের গঠনভঙ্গিমার ভূমিকা অপরিহার্য ও সুনির্দিষ্ট। সাইটোপ্লাজমের অনেক ধর্মই প্রোটিন অণুর সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি পর্যায়ের গঠনভঙ্গিমার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রোটিনের কোয়াটারনারি গঠন হলো একটি প্রোটিন এককের (unit) অনুষঙ্গের (association) মাত্রা। যেমন ফসফোরাইলেজ এনজাইমের দুটি একই রকম উপএকক (subunit) আছে যা আলাদাভাবে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু একটি ডাইমার (dimer) হিসেবে যুক্ত হলে কার্যকর এনজাইম তৈরি হয়। এই প্রকার গঠনকে বলা যায় একটি সমসত্ত্ব (homogenous) কোয়াটারনারি গঠন ; ভিন্ন প্রকার একক হলে একটি অসমসত্ত্ব (homogenous) কোয়াটারনারি গঠন তৈরি হয়। এরকম প্রোটিনের উপএককের বর্ণনায় আরেকটি টার্ম ব্যবহার করা হয়, তা হলো প্রোটোমার (protomer) এবং প্রোটোমার দিয়ে প্রোটিন গঠিত হলে তাকে অলিগোমেরিক প্রোটিন বলা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে হিমোগ্লোবিন একটি অলিগোমেরিক প্রোটিন এবং এতে অসমসত্ত্ব কোয়াটারনারি গঠনভঙ্গিমা আছে। দুটি একই রকম আলফা-শৃঙ্খল প্রোটোমার এবং দুটি একই রকম বিটা-শৃঙ্খল প্রোটোমার দিয়ে এটি গঠিত।

প্রোটিনের গঠনগত পরিবর্তন (Denaturation of protein) : প্রোটিনের বিভিন্ন রকম গঠনগত পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন রকম প্রোটিনের উপর এর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই পরিবর্তন রাসায়নিকভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়া। উচ্চ তাপমাত্রা, pH-র পরিবর্তন, অতিবেগুনি রশ্মি প্রভৃতি প্রভাবকের মাধ্যমে এই পরিবর্তন ঘটে। কিভাবে এই প্রভাবকগুলো প্রোটিনের গঠনগত পরিবর্তন ঘটায় তা ভালভাবে জানা যায় নি, তবে প্রভাবকগুলো অসমযোজী বন্ধনী নষ্ট করে দেয়। কতকগুলো প্রোটিনের আংশিক পরিবর্তনের জন্য তাদের জীবজ কার্য করার ক্ষমতা নষ্ট নাও হতে পারে, কিন্তু কতকগুলো প্রোটিনের সামান্য পরিবর্তনের জন্যই কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রোটিনের গঠনগত পরিবর্তনের জন্য প্রোটিনের অনেক ধর্ম, যেমন- দ্রবণীয়তা, সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা, ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এলেও এই ধর্মাবলির পুনরুদ্ধার হয় না।

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ : প্রোটিনের দ্রবণীয়তা এবং এর কতকগুলো ভৌত ও রাসায়নিক গুণের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যথা :

১। সরল প্রোটিন (simple protein) এবং
২। সংযুক্ত প্রোটিন (conjugated protein)

১। সরল প্রোটিন : এ জাতীয় প্রোটিনকে এনজাইম অথবা অ্যাসিড দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। দ্রবণীয়তা গুণের উপর ভিত্তি করে সরল প্রোটিনকে নিম্নলিখিত ছয়টি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

ক. **অ্যালবুমিন** (Albumin) : এটি পানিতে এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ প্রয়োগ করলে এটি জমাট বেঁধে যায় (coagulate) যবের বিটা-অ্যামাইলেজ অ্যালবুমিনের সুন্দর উদাহরণ।

খ. **গ্লোবিউলিন** (Globulin) : গ্লোবিউলিন পানিতে হয় অদ্রবণীয় না হয় খুব সামান্য দ্রবণীয়। এটি লঘু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ প্রয়োগে এটিও জমাট বেঁধে যায়। বীজে সঞ্চিত প্রোটিনে গ্লোবিউলিন থাকে।

গ. **গ্লুটেলিন** (Glutelin) : এটি নিরপেক্ষ দ্রবণে অদ্রবণীয়, কিন্তু লঘু অম্ল কিংবা ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবণীয়। গ্লুটেলিন প্রধানত খাদ্যশস্যের (cereals) দানায় থাকে। গমের গ্লুটেনিন এবং ধানের অরাইজেনিন (oryzenin) গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

ঘ. **প্রোলামিন** (Prolamine) : প্রোলামিন পানিতে অদ্রবনীয়, কিন্তু ৭০ থেকে ৮০% ইথাইল অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। তবে এটি নির্জলা (absolute) ইথাইল অ্যালকোহলে দ্রবণীয় নয়। ভুট্টার জেইন (zein), গমের গ্লিডিন (glidin) এবং যবের হরডিন (hordein) প্রোলামিনের উদাহরণ।

ঙ. **হিস্টোন** (Histone) : আরজিনিন এবং লাইসিনজাতীয় ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড হিস্টোনে অধিক থাকে এবং এটি পানিতে দ্রবণীয়। এ প্রোটিন নিউক্লিয়াসে নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়।

চ. **প্রোটামিন** (Protamin) : প্রোটামিনেও ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড অধিক থাকে এবং এটিও পানিতে দ্রবণীয়। প্রোটামিনও নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত থাকে।

২। সংযুক্ত প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে অ্যামাইনো অ্যাসিড নয় এমন পদার্থ যুক্ত থাকে, তাদেরকে সংযুক্ত প্রোটিন বলে। শেষোক্ত পদার্থকে প্রোসথেটিক গ্রুপ (prosthetic group) বলে। সংযুক্ত প্রোটিনকে নিম্নলিখিত পাঁচটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক. **নিউক্লিওপ্রোটিন** (Nucleoprotein) : অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত।

খ. **গ্লাইকোপ্রোটিন** (Glycoprotein) : অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং শর্করা দ্বারা গঠিত।

গ. **লিপোপ্রোটিন** (Lipoprotein) : অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং লিপিড দ্বারা গঠিত। এ প্রোটিন পানিতে অদ্রবণীয় এবং কোষের বিভিন্ন প্রকার ঝিল্লি লিপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত।

ঘ. **ক্রোমোপ্রোটিন** (Chromoprotein) : অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ (যেমন- ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড, হিমোগ্লোবিন) দ্বারা গঠিত।

ঙ. **মেটালোপ্রোটিন** (Metalloprotein) : অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং কতকগুলো ধাতু, যেমন- তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি সহযোগে গঠিত।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)

প্রোটিন যেমন অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত, নিউক্লিক অ্যাসিডও তেমনি অনেক নিউক্লিওটাইড (nucleotides) দ্বারা গঠিত হয়। অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে এক-অণু নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন করে। নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু খুব দীর্ঘ এবং এদের আণবিক ওজন কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়।

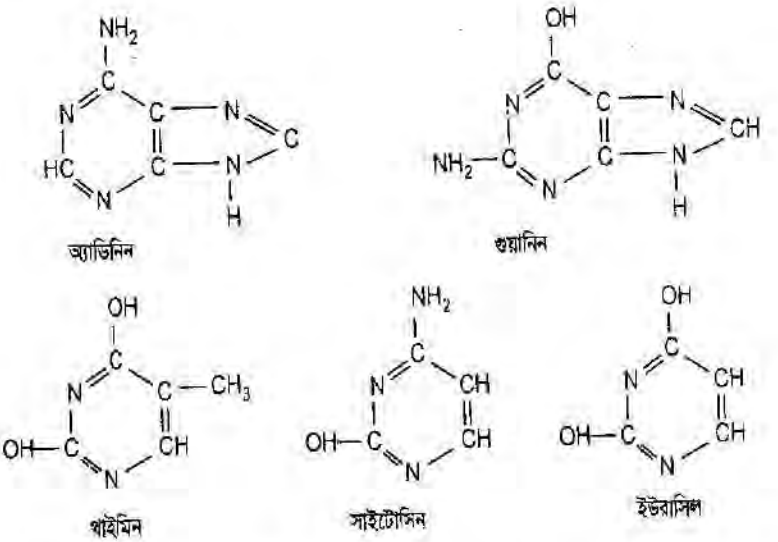

চিত্র ১.২ : পিউরিন ও পিরিমিডিন ক্ষারকের রাসায়নিক গঠন

প্রত্যেক নিউক্লিওটাইডে তিনটি পদার্থ থাকে। যথা– নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (nitrogenous base), পাঁচ-কার্বনযুক্ত পেন্টোজ শর্করা (pentose sugar) এবং ফসফোরিক অ্যাসিড। শর্করা ডি-অক্সিরাইবোজ ধরনের হলে ঐ নিউক্লিক অ্যাসিডকে ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) বলে। রাইবোজ শর্করা দ্বারা রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) গঠিত।

নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারকগুলো প্রধানত দুরকমের। যথা– পিউরিন (purine) এবং পিরিমিডিন (pyrimidine)। পিরিমিডিনে কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু দিয়ে তৈরি একটি ছয় সদস্যযুক্ত বলয় (ring) থাকে। পিউরিন পাঁচ ও ছয় সদস্যযুক্ত দুটি বলয় দিয়ে তৈরি। এ বলয়গুলোও কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরমাণু দিয়ে গঠিত। প্রধান দুটি পিউরিন ক্ষারক হলো অ্যাডিনিন (adenine) গুয়ানিন (guanine) এবং পিরিমিডিন ক্ষারকগুলো হলো থাইমিন (thymine), সাইটোসিন (cytosine) ও ইউরাসিল (uracil) (চিত্র ১.২)। DNA-তে সাধারণত অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), থাইমিন (T) ও সাইটোসিন (C) থাকে। RNA তে অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিন থাকে।

শর্করা এবং নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক একসাথে নিউক্লিওসাইড (nucleoside) গঠন করে। নিউক্লিওসাইডের সাথে ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত হলে নিউক্লিওটাইড তৈরি হয়। অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র গঠন করে।

ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) : ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াটসন এবং ক্রিক (Watson and Crick) DNA এর গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। DNA অণুতে দুটি দীর্ঘ পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র থাকে। এ সূত্র দুটি একটি মধ্যরেখার (central axis) চারদিকে পরস্পর পেঁচিয়ে থাকে এবং একটি ডবল হেলিক্স (double helix) তৈরি করে। DNA অণুর আকৃতি ঘুরানো সিঁড়ির মতো।

DNA অণুর সূত্র দুটির কাঠামো ফসফোরিক অ্যাসিড ও শর্করা দিয়ে তৈরি এবং সূত্র দুটি নাইট্রোজেন ক্ষারক দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত থাকে অর্থাৎ একটি ক্ষারক যুক্ত থাকে অন্য সূত্রের আরেকটা ক্ষারকের সাথে। অ্যাডিনিন সবসময় থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে এবং গুয়ানিন সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাথে যুক্ত থাকে।

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) : RNA এর আণবিক ওজন ২০,০০০ থেকে ১০,০০০,০০০ পর্যন্ত হয়। অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে একটি RNA অণু গঠন করে। DNA এর সাথে RNA এর রাসায়নিক গঠনের কতকগুলো পার্থক্য আছে। (ক) DNA এর শর্করা হলো ডিঅক্সিরাইবোজ ধরনের এবং RNA এর শর্করা হলো রাইবোজ ধরনের। (খ) DNA এর থাইমিন ক্ষারকের পরিবর্তে RNA তে ইউরাসিল থাকে। (গ) DNA অণু দ্বি-সূত্রবিশিষ্ট গঠন হয় এবং RNA অণুতে একটি সূত্র থাকে।

রাইবোজ শর্করা ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে RNA এর নিউক্লিওটাইডের কাঠামো তৈরি করে। শর্করার সাথে নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারকগুলো যুক্ত থাকে। RNA অণু একটি সূত্র দিয়ে তৈরি হলেও কখনো কখনো এ দীর্ঘ সূত্রটি কোনো কোনো জায়গায় ভাঁজ হওয়ার ফলে দ্বি-সূত্রবিশিষ্ট গঠন দেখায়। এসব অংশে ক্ষারকগুলো জোড়ায় অবস্থান করে অর্থাৎ সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে এবং অ্যাডিনিন ইউরাসিলের সাথে যুগ্ম অবস্থান করতে পারে।

কাজের উপর ভিত্তি করে RNAকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা –

১. স্থানান্তরকারী RNA (transfer RNA or t-RNA),
২. বার্তাবহ RNA (messenger RNA or m-RNA) এবং
৩. রাইবোজোমীয় RNA (ribosomal RNA or r-RNA

১. **স্থানান্তরকারী** RNA : এটি দ্রবীভূত RNA (soluble RNA বা s-RNA বা adapter RNA) নামেও পরিচিত। মোট RNA এর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হলো স্থানান্তরকারী RNA। ৭০ থেকে ৮০ টি নিউক্লিওটাইড দ্বারা এই RNA এর একটি অণু গঠিত। t-RNA এর একটি প্রান্তে সবসময় সাইটোসিন-সাইটোসিন-অ্যাডিনিন (-C-C-A) ক্ষারক থাকে। প্রান্তের অ্যাডিনিন ক্ষারক অংশেই অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয়। t-RNA বিভিন্ন রকমের হয়। প্রত্যেক অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য অন্তত একটি নির্দিষ্ট t-RNA থাকে। সুতরাং কোষের কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য কুড়িটি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নির্দিষ্ট t-RNA আছে। সুনির্দিষ্ট t-RNA সুনির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে ঐ অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রোটিন উৎপাদনের স্থানে নিয়ে আসে। t-RNA এর একদিকে তিনটি ক্ষারক নিয়ে গঠিত অ্যান্টিকোডন (anticodon) থাকে এবং এ অংশটাই m-RNA এর নির্দিষ্ট স্থানে t-RNA কে যুক্ত করে।

২. **বার্তাবহ** RNA : মোট RNA এর ৫ শতাংশ হলো m-RNA। DNA এর ছাঁচে m-RNA তৈরি হয়। DNA ছাঁচের ক্ষারকগুলোর পরিপূরক ক্ষারক এ RNA তে থাকে। যদি একটি DNA ছাঁচের ক্ষারকের বিন্যাস A-T-T-G-A-C ইত্যাদি হয়, তবে ঐ ছাঁচ থেকে তৈরি RNA এর ক্ষারকগুলো হবে U-A-A-C-U-G ইত্যাদি। RNA তৈরি সময় DNA অণুর সূত্র দুটির মধ্যবর্তী হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে যায়। মুক্ত নিউক্লিওটাইডগুলো DNA সূত্রের যথাযথ স্থানে যুক্ত হয়ে m-RNA গঠন করে। এ m-RNA পরে নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসে ও প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে। প্রোটিনে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাস m-RNA এর মাধ্যমে DNA নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **রাইবোজোমীয়** RNA : রাইবোজোমের RNAকে রাইবোজোমীয় RNA বলে। r-RNA নিউক্লিয়াসে তৈরি হয় ও পরে সাইটোপ্লাজমে আসে। মোট RNA-এর প্রায় ৪০ শতাংশ হলো r-RNA।

প্রোটিন সংশ্লেষণ (Protein synthesis) : প্রোটিন সংশ্লেষণ বেশ জটিল প্রক্রিয়া। এটি তিনটি ধাপে হয়। নিচে এই ধাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. অ্যামাইনো অ্যাসিডের সক্রিয়ণ (activation of amino acid),
২. স্থানান্তরকারী RNAএর সাথে সক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের যুক্তকরণ (attachment of activated amino acid to s-RNA) ,এবং
৩. রাইবোজোমে পলিপেপটাইডের গঠন (formation of poly peptids on the ribosome)।

১. **অ্যামাইনো অ্যাসিডের সক্রিয়ণ :** সাইটোপ্লাজমের অসমসত্ত্ব (Heterogenous) স্থান থেকে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের বাছাই সম্পন্ন হয় নির্দিষ্ট এনজাইমের সহযোগে, প্রত্যেকটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য কমপক্ষে একটি সক্রিয় এনজাইম আছে। ATP-এর উপস্থিতিতে সক্রিয় এনজাইম উচ্চশক্তিসম্পন্ন এনজাইম বন্ধনী অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাডিনাইলেট (E-AA-AMP) তৈরিতে প্রভাবিত করে এবং পাইরোফসফেট (pp) ছেড়ে দেয়।

২. **অ্যামাইনো অ্যাসিড-S-RNA যৌগ উৎপাদন :** এ ধাপে সক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিড স্থানান্তরকারী RNA এর সাথে মিলিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড -s-RNA যৌগ গঠন করে। ধারণা করা হয় যে, s-RNA এবং সক্রিয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যকার যুক্তিবিন্দু হচ্ছে প্রান্তিক অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিডের রাইবোজ শর্করার দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কার্বন।

৩. **পলিপেপটাইড গঠন :** রাইবোজোমে পেপটাইড গঠিত হয়। প্রায় অর্ধেক রাইবোজোমীয় RNA এবং অর্ধেক প্রোটিন দ্বারা রাইবোজোম গঠিত। বার্তাবহ RNA নিউক্লিয়াস থেকে বার্তা বহন করে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোজোমের গায়ে লেগে থাকে। এরপর অ্যামাইনো অ্যাসিড-s-RNA যোগ বার্তাবহ RNA এর উপর একটি নির্দিষ্ট ক্রমে স্থাপিত হয়। এভাবে পর পর স্থাপিত একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপ অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপের সাথে মিলিত হয়ে পেপটাইড বন্ধনী গঠন করে এবং স্থানান্তরকারী RNA মুক্ত হয়। বহুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্ন অনুক্রমে পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড তথা প্রোটিন গঠিত হয়। চিত্র ১.৩-এ প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হয়েছে।

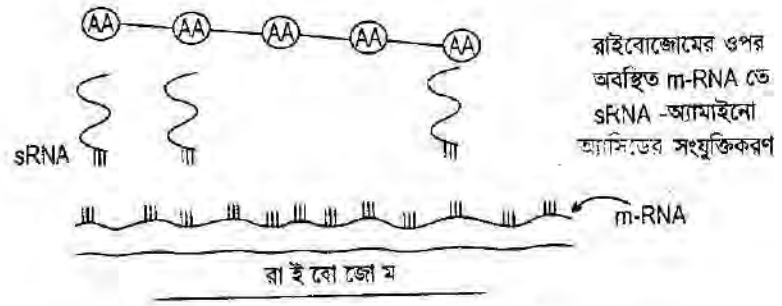

চিত্র ১.৩ : প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপ

নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle) সবুজ উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়াম যৌগ হিসেবে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, অসবুজ উদ্ভিদ (কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া এবং ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া ব্যতীত) এবং সব প্রাণী নাইট্রোজেনের জন্য উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য মৌলিক খনিজ পদার্থের মতো (যেমন– পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি) মাতৃ প্রস্তর (parent rock) থেকে মৃত্তিকা তৈরির সময় নাইট্রোজেন থাকে না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের পচনক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ (যেমন প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড) থেকে নাইট্রোজেন আবার মৃত্তিকায় ফিরে আসে। মৃত্তিকাস্থ কতকগুলো ব্যাকটেরিয়া এবং নীল-সবুজ শৈবাল বায়ুমণ্ডলের মুক্ত ডাই-নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে এবং অজৈব নাইট্রোজেনে পরিণত হয়ে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিদ্যমান জটিল নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের পচনক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১. **অ্যামোনিয়াকরণ** (Ammonification) : উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের এবং প্রাণীর মলমূত্রের নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ প্রথমে কয়েক প্রকার মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এ পদ্ধতিকে অ্যামোনিয়াকরণ বলে। *Bacillus ramosus*, *B. vulgaris* এবং *B. mycoides* হলো অ্যামোনিফাইং (ammonifying) ব্যাকটেরিয়া।

কতকগুলো ছত্রাকও অ্যামোনিফাই-এ অংশগ্রহণ করে। মুক্ত অ্যামোনিয়ার একটি অংশ মৃত্তিকায় অ্যামোনিয়াম আয়নে পরিণত হয় যা উদ্ভিদ পরিশোষণ করতে পারে।

২. **নাইট্রিকরণ** (Nitrification) : কয়েক শ্রেণির ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেটে জারিত করে। *Nitrosomonas* গণের ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইটে এবং *Nitrobacter* গণের ব্যাকটেরিয়া নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিণত করে। এ পদ্ধতিকে নাইট্রিকরণ এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে নাইট্রিফাইং (nitrifying) ব্যাকটেরিয়া বলে। উদ্ভিদ এ নাইট্রোজেন পরিশোষণ করতে পারে অথবা ডিনাইট্রিকরণ (denitrification) প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যেতে পারে।

চিত্র ১.৪ : নাইট্রোজেন চক্র

৩. **ডিনাইট্রিকরণ** (Denitrification) : *Bacillus denitrificans* ব্যাকটেরিয়ামের ক্রিয়ার ফলে ডিনাইট্রিকরণ হয়।

নাইট্রোজেন পরমাণু বা অণুর এরূপ চক্রাকারে চলাচলকে নাইট্রোজেন চক্র বলা হয়। নাইট্রোজেনের এরূপ চক্রাকারে চলাচলের জন্য মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না এবং বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণও অপরিবর্তিত থাকে। ১.৪ চিত্রে নাইট্রোজেন চক্র দেখানো হয়েছে।

উপক্ষার (Alkaloid)

প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ভিদ থেকে পৃথকীকৃত সব জৈব ক্ষারককে উপক্ষার (অর্থাৎ ক্ষারকের মতো) বলা হতো। এই সংজ্ঞা অনুসারে অনেক প্রকার যৌগকে উপক্ষার হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

উপক্ষার নিয়ে গবেষণার অগ্রগতির সাথে সাথে এর সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কনিগস (Konigs) প্রস্তাব করেন যে, উপক্ষার হলো প্রাকৃতিক জৈব ক্ষারক যাতে একটি পাইরিডিন বলয় আছে। তবে এই সংজ্ঞা অনুসারে মাত্র কয়েক প্রকার জৈব যৌগ উপক্ষারের অন্তর্গত হয়। তাই কিছুকাল পরে লেডেনবার্গ (Ladenburg) পুনরায় উপক্ষারের সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। তাঁর প্রস্তাবিত সংজ্ঞা অনুসারে উপক্ষার হলো উদ্ভিদের প্রাকৃতিক যৌগ, এটি ক্ষারধর্মী এবং একটি হেটারোসাইক্লিক বলয়ে কমপক্ষে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে। লেডেনবার্গের সংজ্ঞা অনুসারে কৃত্রিম যৌগ এবং প্রাণী থেকে প্রাপ্ত যৌগ উপক্ষারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এটি স্বীকার করতে হয় যে এখন পর্যন্ত উপক্ষারের সংজ্ঞা দেওয়া বেশ কঠিন।

উপক্ষারের নামকরণ : বিভিন্নভাবে উপক্ষারের নামকরণ করা হয়। যে উদ্ভিদ থেকে উপক্ষারটি পাওয়া যায় তার গণ (generic) নাম থেকে (যেমন– হাইড্রাস্টিন, অ্যাট্রোপিন), তার প্রজাতির (specific) নাম থেকে (যেমন কোকেইন, বেলাডোনিনি), যে ওষুধ তৈরি হয় তার সাধারণ নাম থেকে (যেমন– আরগোটামিন), শারীরতাত্ত্বিক কার্য থেকে (যেমন– এমিটিন, মরফিন) এবং কখনো কখনো উপক্ষারের আবিষ্কারকের নাম অনুসারে (যেমন– পেলিটিয়েরিন) উপক্ষারের নামকরণ করা হয়। কখনো কখনো মূল উপক্ষারের নামের প্রারম্ভে অথবা শেষে কিছু কিছু যুক্ত করে একই উৎস থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য উপক্ষারের নামকরণ হয় (যেমন– কুইনিন, হাইড্রোকুইনিন, কুইনিডিন)। রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে সব উপক্ষারের নামের শেষে 'ine' সংযুক্ত থাকবে।

রাসায়নিক গঠন : সাধারণত উপক্ষারে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে, যদিও কতকগুলো উপক্ষারে, (যেমন– আরগোটামিন) পাঁচটি পর্যন্ত নাইট্রোজেন পরমাণু থাকতে পারে। একটি প্রাইমারি অ্যামিন (RNH_2), সেকেন্ডারি অ্যামিন (R_2NH) অথবা টারশিয়ারি অ্যামিন (R_3N) হিসেবে নাইট্রোজেন থাকতে পারে।

নাইট্রোজেন পরমাণুতে একটি অংশীদারহীন (unshared) ইলেক্ট্রন জোড় থাকায়, এই যৌগগুলো ক্ষারীয় এবং এদের ধর্মাবলি অ্যামোনিয়ার মতো। ক্ষারের মাত্রার যথেষ্ট তারতম্য হয় এবং এটি নির্ভর করে অণুর গঠন এবং অন্যান্য কার্যকর গ্রুপের উপস্থিতি ও অবস্থানের উপর। অ্যামোনিয়ার মতো খনিজ অ্যাসিডের দ্বারা উপক্ষার এদের লবণে রূপান্তরিত হয়।

সাধারণ ধর্ম

উপক্ষার সাধারণত বর্ণহীন, স্ফটিকাকার, অ-উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ, যা পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথামল, ইথার, ক্লোরোফরম ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। কয়েকটি উপক্ষার তরল যা পানিতে দ্রবণীয়, যেমন– কনিনি (coniine), নিকোটিন এবং কয়েকটি রঙিন, যেমন– বারবেরিন (berberine) হলো হলুদ। অধিকাংশ উপক্ষার তিক্ত স্বাদের এবং আলোকে সক্রিয়। সাধারণত এগুলো টারশিয়ারি নাইট্রোজেন যৌগ এবং একটি বলয়ে সাধারণত টারশিয়ারি স্থানে একটি অথবা দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে ; অধিকাংশ উপক্ষারের অক্সিজেনও আছে। ফসফোমোলিবডিক অ্যাসিড, পিকরিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম মারকিউরো-আয়োডাইড ইত্যাদির দ্রবণে উপক্ষার অদ্রবণীয় অধঃক্ষেপ তৈরি করে। এই অধঃক্ষেপের অনেকগুলোর সুনির্দিষ্ট স্ফটিকের মতো আকার আছে এবং উপক্ষার শনাক্তকরণে এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

উপক্ষার নিষ্কাশন : সাধারণভাবে, উদ্ভিদকে ভালভাবে গুঁড় করার পর ইথানলে দ্রবীভূত করে প্রাপ্ত তলানিতে লঘু অজৈব অ্যাসিড যোগ করা হয়. তারপর এসব উপক্ষারকে সোডিয়াম কার্বোনেট যোগ করে আলাদা করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রবণে, যেমন- ইথার, ক্লোরোফরম ইত্যাদি, নিষ্কাশন করা হয়। এভাবে যে ক্ষারকের মিশ্রণ পাওয়া যায়, তা থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে একক যৌগগুলোকে আলাদা করা হয়. নিষ্কাশনের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পদ্ধতিতে ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়।

উপক্ষারের শ্রেণিবিভাগ : উপক্ষারের গঠন জানার বহু পূর্বে উপক্ষারের উৎসকে ঐ যৌগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই উপক্ষারের শ্রেণিবিভাগ যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিতে ছিল না। এমনকি বর্তমানে অনেকগুলো উপক্ষারের গঠন জানার পরেও উপক্ষারের শ্রেণিবিভাগ ততোটা নিয়মবদ্ধ নয়। এতদসত্ত্বেও, উপক্ষারের অণুতে উপস্থিত নিউক্লিয়াসের প্রকৃতি অনুসারে উপক্ষারের শ্রেণিবিভাগ সম্ভবত সবচেয়ে সন্তোষজনক। আলোচনার সুবিধার্থে উপক্ষারকে নিম্নলিখিত সাতটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

১. ফিনাইলইথিলামিন,
২. পাইরোলিডিন,
৩. পাইরিডিন,
৪. পাইরোলিডিন-পাইরিডিন,
৫. কুইনোলিন,
৬. আইসোকুইনোলিন এবং
৭. ইন্ডোল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকক্ষেত্রে একই উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপক্ষারের প্রায়ই একই রকম রাসায়নিক গঠন আছে. তাই কখনো কখনো উপক্ষারের উৎস রাসায়নিক সাদৃশ্য নির্দেশ করতে পারে।

১. ফিনাইলইথিলামিন গ্রুপ

এই গ্রুপের অন্তর্গত অনেক যৌগ জানা গেছে, এদের কিছু প্রাকৃতিক এবং কিছু কৃত্রিম। এদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক কার্য হলো রক্তচাপ বৃদ্ধি করা ; তাই এদেরকে প্রায়ই 'চাপ ওষুধ' নামে অভিহিত করা হয়।

ক. ইফিড্রিন (Ephedrine) : *Ephedra* গণের উদ্ভিদে এটি পাওয়া যায় এবং শ্বাসকষ্টের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এফিড্রিনের আণবিক সংকেত হলো $C_{10}H_{15}ON$।

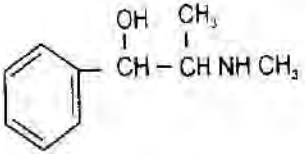

ইফিড্রিন

খ. **হরডেনিন** (Hordenine) : এটি অঙ্কুরিত যবের বীজে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_{10}H_{15}ON$।

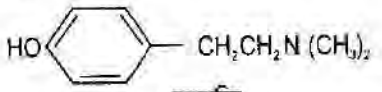

হরডেনিন

২. পাইরোলিডিন গ্রুপ

হাইগ্রিন (Hygrine) : এটি কোকো উপক্ষারের একটি। এর আণবিক সংকেত $C_8H_{15}ON$।

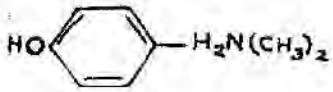

৩. পাইরিডিন গ্রুপ

ক. **রিসিনিন** (Ricinine) : রেড়ির বীজে এটি পাওয়া যায়। এটি খুব বিষাক্ত উপক্ষার নয় এবং বিরেচক (purgative) ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর রাসায়নিক সংকেত $C_8H_8O_2H_2$।

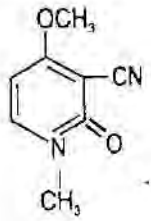

রিসিনিন

খ. **সুপারির উপক্ষার** (Areca nut) : সুপারি কয়েক প্রকার উপক্ষারের উৎস এবং এগুলো হলো নিকোটিনিক অ্যাসিডের আংশিক হাইড্রোজেনযুক্ত ডেরিভেটিভ। এরিকাইডিন (arecaidine)-এর আণবিক সংকেত $C_7H_{11}O_2N$ এবং এরিকোলিন (arecoline)-এর আণবিক সংকেত $C_8H_{13}O_2N$।

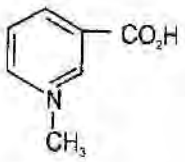

এরিকাইডিন

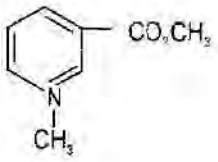

এরিকোলিন

গ. **হেমলক উপক্ষার** : এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপক্ষার হলো কনিনি (coniine)। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসকে হেমলকের তেল পান করিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। এর আণবিক সংকেত হলো $C_7H_{12}N$।

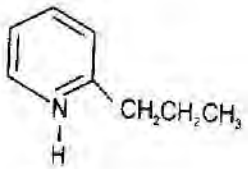

কনিনি

ঘ. পাইপারিন (Piperine) : এটি মরিচ, বিশেষ করে গোল মরিচে *(Piper nigrum)* পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_{17}H_{19}O_3N$।

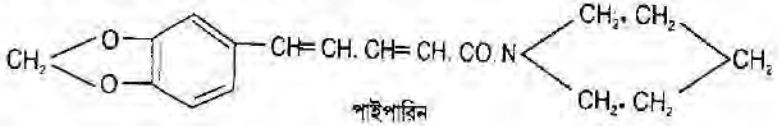

পাইপারিন

৪. পাইরোলিডিন-পাইরিডিন গ্রুপ

ক. তামাকের উপক্ষার : তামাকের পাতায় অনেকগুলো উপক্ষার আছে, যেমন- নিকোটিন, নিকোটিমিন, নরনিকোটিন ইত্যাদি। এদের মধ্যে নিকোটিন সম্পর্কে ভালভাবে জানা গেছে। এর আণবিক সংকেত $C_{10}H_{14}N_2$।

নিকোটিন

খ. Solanaceae-র উপক্ষার : অ্যাট্রোপিন, হায়োসসায়ামিন এবং স্কোরেপোলামিন এই শ্রেণির অন্তর্গত। অ্যাট্রোপিনের আণবিক সংকেত হলো $C_{17}H_{23}O_3N$ এবং এটি *Atropa belladonna* নামক উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

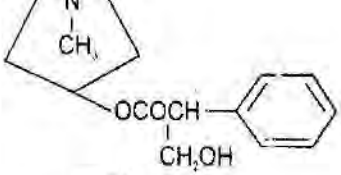

অ্যাট্রোপিন

গ. কোকো উপক্ষার : কোকেইন, ট্রোপাকোকেইন, বেজোআইলেকগোনিন, হাইগ্রিন ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। কোকো উদ্ভিদের *(Erythroxylon coca)* পাতায় কোকেইন পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_{17}H_{21}O_4N$ এবং এটি পানিতে সামান্য দ্রবণীয়।

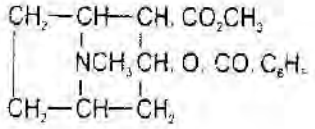

কোকেইন

৫. কুইনোলিন গ্রুপ

(ক) সিনকোনা উপক্ষার : সিনকোনাইন এবং কুইনাইনসহ আরো অনেক প্রকার উপক্ষার *Cinchona* -এর বিভিন্ন প্রজাতির বাকলে পাওয়া যায়। সিনকোনাইনকে সিনকোনা উপক্ষারের মাতৃ-পদার্থ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে, কিন্তু কুইনাইন হলো এ গ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়। সিনকোনাইনের আণবিক সংকেত $C_{19}H_{22}OH_2$ এবং কুইনাইনের $C_{20}N_{24}O_2N_2$।

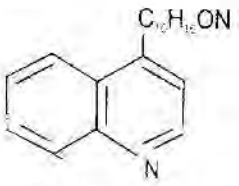

সিনকোনাইন

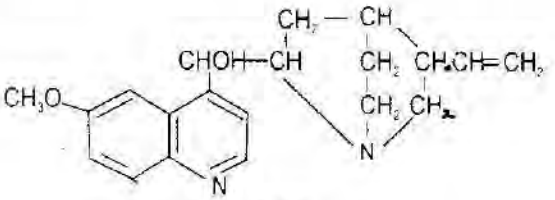

কুইনাইন

৬. আইসোকুইনোলিন গ্রুপ

ক. অপিয়াম উপক্ষার : *Papaver somniferum* উদ্ভিদ থেকে অনেক উপক্ষার পৃথক করা হয়েছে এবং গঠন অনুসারে এদেরকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে :

আইসোকুইনোলিন গ্রুপ, যেমন– প্যাপাভেরিন এবং ফিনানথ্রিন গ্রুপ, যেমন– মরফিন, কোডিন এবং থিবেইন। প্যাপাভেরিনের আণবিক সংকেত $C_{20}H_{21}O_4N$।

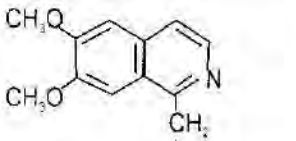

প্যাপাভেরিন

Papaver somniferum -এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মরফিন, এর আণবিক সংকেত $C_{17}H_{19}O_3N$। আফিম হলো এই উদ্ভিদের অপক্ব ফলের বায়ু শুষ্ক দুগ্ধবৎ রস এবং হিরোইন হলো ডাইঅ্যাসিটাইল মরফিন।

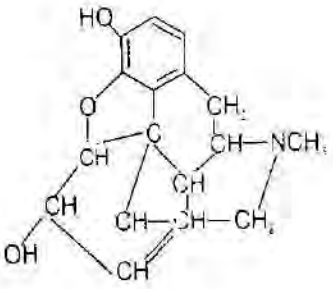

মরফিন

৭. ইন্ডোল গ্রুপ

কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপক্ষারের গঠনে একটি ইন্ডোল বলয় থাকে। *Strychnos* উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত স্ট্রিকনিন এবং ব্রুসিন (ডাই-মিথোঅক্সি স্ট্রিকনিন) এবং *Physostigma* উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ফিজোস্টিগমিন এই গ্রুপের অন্তর্গত। তবে স্ট্রিকনিন এবং ব্রুসিনে একটি কুইনোলিন নিউক্লিয়াসও থাকে, তাই কেউ কেউ এদেরকে কুইনোলিন গ্রুপে রাখার পক্ষপাতি। *Rauwolfia* উদ্ভিদের রেসারপিন, সারপেনটিন, অ্যাজমালিন ইত্যাদি উপক্ষার এবং *Catharanthus* উদ্ভিদের ভিনব্লাস্টিন, ভিনক্রিস্টিন ইত্যাদি হলো ইন্ডোল উপক্ষার। প্রথম শ্রেণির উপক্ষারও উচ্চ রক্তচাপ কমাতে বেশ কার্যকর এবং শেষোক্ত শ্রেণির উপক্ষার ক্যান্সার প্রতিরোধী।

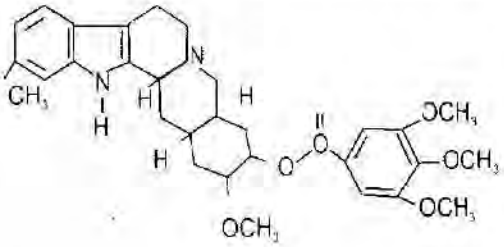

রেসারপিন

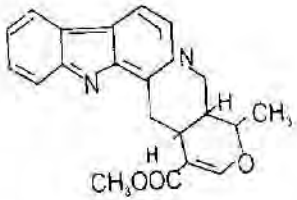

সারপেনটিন

উপক্ষারের জৈব-সংশ্লেষণ

অনেক উপক্ষারের জৈব-সংশ্লেষণের অগ্রবর্তী পদার্থ হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং এদের থেকে উদ্ভূত হয় অ্যামাইনো অ্যালডিহাইড এবং অ্যামিন। কিটো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো এসিড তৈরি হতে পারে।

উপক্ষারের গঠনের এতো বিভিন্নতার জন্য এটি গ্রহণযোগ্য নয় উপক্ষারের জৈবসংশ্লেষণের একটিমাত্র পথ আছে। তাই অনেকগুলো পথের প্রস্তাব করা হয়েছে, এদের একেকটি হলো একই রকম গঠনের বিভিন্ন উপক্ষারের জৈব-সংশ্লেষণের জন্য।

ফিনাইল ইথিলামিন উপক্ষার : ফিনাইলঅ্যালানিন থেকে (এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড) এই উপক্ষারের জৈব-সংশ্লেষণ আরম্ভ হয়।

পাইরোলিডিন উপক্ষার : এই উপক্ষারের জৈব-সংশ্লেষণের প্রারম্ভিক পদার্থ হলো পাইরোলিন এবং অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। প্রথমটি উদ্ভূত হয় অরনিথিন এবং এর নিকট সম্পর্কীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে এবং শেষোক্তটি উদ্ভূত হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে।

পাইরিডিন উপক্ষার : একটি পলি-বিটা-কিটো অ্যাসিডের সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে পাইরিডিন বলয় তৈরি হয়।

পাইরোলিডিন-পাইরিডিন উপক্ষার : পাইরিডিন বলয় প্রারম্ভিক যৌগ তৈরির জন্য অ্যাসেটিক অ্যাসিড অথবা গ্লিসারল ব্যবহার করে।

ট্রোপেন উপক্ষার : প্রারম্ভিক যৌগ হলো অরনিথিন এবং অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সিকিমিক (Shikimic) অ্যাসিড পথ থেকে বেনজিন বলয় তৈরি হয়।

আইসোকুইনোলিন উপক্ষার : টাইরোসিন (এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড) থেকে প্যাপাভারিন তৈরি হয়।

ইন্ডোল উপক্ষার : অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডোল উপক্ষার হলো জটিল মাল্টিসাইক্লিক অণু। জৈব সংশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণার প্রাথমিক অবস্থাই জানা যায় যে, এই প্রকার উপক্ষারে একটি ট্রিপ্টামিন যুক্ত হয়। বর্তমানে জানা গেছে যে উপক্ষার অণুর অ-ট্রিপ্টোফ্যান অংশের উদ্ভব হয় মনোটারপেনয়েড থেকে। তিনটি মনোটারপেনয়েড কাঠামো থেকে অধিকাংশ জটিল ইন্ডোল উপক্ষারের সংশ্লেষণ হয়। এদেরকে বলা হয় অ্যাসপিডোস্পারমা, করিনানথি এবং ইবোগা প্রকার।

উপক্ষারের বিস্তার

উপক্ষারের ওষুধি মূল্য জানার পর থেকে উপক্ষার তৈরি করে এমন উদ্ভিদের অধিক উপক্ষারযুক্ত স্ট্রেইন উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সচেষ্ট হন। উপক্ষার তৈরিকারক উদ্ভিদে শতকরা ০.০১ ভাগের বেশি উপক্ষার থাকে। উপক্ষারের পরিমাণ বংশগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে পরিবেশের জন্যেও এর যথেষ্ট পার্থক্য হয়। ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের তুলনায় আবেশিত পলিপ্লয়েড উদ্ভিদে বেশি পরিমাণে উপক্ষার থাকে।

কোনো কোনো প্রজাতিতে বিভিন্ন উপক্ষারের অনুপাত একই থাকে, কিন্তু অন্যান্য উদ্ভিদে এই অনুপাতের যথেষ্ট পার্থক্য হয়। যেমন- *Atropa belladonna* তে হায়াসিন : হায়োসায়ামিনের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু *Papaver somniferum*-এর মোট অপিয়াম উপক্ষার এবং মরফিন অংশের অনুপাত সুনির্দিষ্ট থাকে না। উপক্ষার তৈরির উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময়ের ঋতুগত, জলবায়ুগত এবং মৃত্তিকাগত পার্থক্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। উদ্ভিদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে উপক্ষারের পরিমাণের পরিবর্তন হয়। যেমন- *Atropa belladonna*-র কচি পাতার প্রধান উপক্ষার হলো হায়োসিন, কিন্তু পাতার বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং পরিশেষে মোট উপক্ষারের একটি নগণ্য উপাদানে পরিণত হয়।

উপক্ষার তৈরিকারক উদ্ভিদের সব কলাতেই উপক্ষার থাকে, সাধারণত কোষ-গহ্বরে লবণ হিসেবে থাকে। এগুলো প্রায়ই সঞ্চয়ী অঙ্গে বেশি পরিমাণে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে উপক্ষারের অবস্থানের যে পার্থক্য দেখা যায় তা অংশত ঘটে সংশ্লেষণ স্থানের পার্থক্যের কারণে।

উদ্ভিদরাজ্যের সব গ্রুপেই উপক্ষার তৈরিকারী উদ্ভিদ দেখা যায় না। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে লেগুমিনোসি, প্যাপাভারেসি, রেনানকুলেসি, রুবিয়েসি, সোলানেসি এবং বারবেরিডেসি

হলো উপক্ষার তৈরিকারী উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ গোত্র। ল্যাবিয়েটি এবং রোজেসি গোত্রের উদ্ভিদের উপক্ষার থাকে না বললেই চলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে অ্যামারিলিডেসি এবং লিলিয়েসি গোত্রের উদ্ভিদ উপক্ষার তৈরি করে। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে খুব সামান্য উপক্ষার থাকে (যেমন- ট্যাক্সাসি)। এছাড়াও কতিপয় ছত্রাক এবং টেরিডোফাইট উদ্ভিদ উপক্ষার তৈরি করে। এমন কি কতকগুলো প্রাণীও উপক্ষার তৈরি করে।

যেহেতু উপক্ষার হলো উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট, তাই এদের কার্য সম্বন্ধে জানার জন্য অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলছে। এগুলো উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে কোনো কাজে আসে না, যদিও কিছু কিছু উপক্ষারের রাসায়নিক গঠন কতিপয় বৃদ্ধিকর দ্রব্যের মতোই। কতিপয় গবেষক অবশ্য উদ্ভিদে উপক্ষারের কিছু কিছু সম্ভাব্য কার্যের কথা বলেছেন। ক্ষারক হিসেবে এদের মৃত্তিকার ক্যাটায়নের সাথে বিনিময় হতে পারে, তাই আয়োনিক সমতা বজায় থাকে। তবে এটি একটি সাধারণ কার্য হবে না, কেননা- সব উদ্ভিদেই উপক্ষার থাকে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, যেহেতু উপক্ষারে নাইট্রোজেন থাকে, তাই এটি দ্রবণীয় সঞ্চিত নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, সঞ্চয়ী অঙ্গে উপক্ষার জমা হয়, কিন্তু এগুলো আবার পাতা ও কাণ্ডে জমা হয়, যা সঞ্চার সর্বোত্তম স্থান নয়। কতকগুলো উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগমের সময় শস্যের উপক্ষার নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে মোট নাইট্রোজেনের তুলনায় এর পরিমাণ এতো সামান্য যে, তা তাৎপর্যহীন। কৃত্রিমভাবে ক্ষুধার্ত উদ্ভিদে উপক্ষারের পরিমাণ বেশিই থাকে, এটি নির্দেশ করে যে, প্রয়োজনের সময় উপক্ষারের নাইট্রোজেন লভ্য হয় না।

পোকামাকড় এবং তৃণভোজী প্রাণীকে দূরে সরিয়ে রেখে উপক্ষার উদ্ভিদের রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক একবীজপত্রী উদ্ভিদে উপক্ষার পাওয়া গেছে এবং এটি থেকে ধারণা হয় যে, প্রাথমিক জলজ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ থেকে উপক্ষার তৈরিকারী উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে। জলজ পরিবেশে তৃণভোজী প্রাণীর আক্রমণ এত নগন্য যে, এদের ক্ষেত্রে উপক্ষারের রক্ষাকারী ভূমিকার কোনো গুরুত্ব নেই, তাই কতিপয় একবীজপত্রী উদ্ভিদ স্থলে আগমণের পর তাদের আলাদাভাবে উপক্ষার তৈরির ক্ষমতা এসেছে। শৈবাল উপক্ষার তৈরি করে না। উপক্ষার তৈরিকারী অধিকাংশ জলজ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ভাসমান পাতা আছে, নিমজ্জিত নয়। যদি উপক্ষার উদ্ভিদের একমাত্র বর্জ্য নিষ্কাশনকারী ভূমিকা পালন করে, তাহলে এটি সম্ভব যে, অনেক জলজ উদ্ভিদে উপক্ষারের অনুপস্থিতি জলজ পরিবেশে পানিতে দ্রবণীয় বর্জ্যপদার্থ নির্গমনের সহায়তার সাথে সম্পর্কিত।

আইসোপ্রিনয়েড উপক্ষার

যদিও উদ্ভিদের অধিকাংশ উপক্ষার অ্যামিন কিংবা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপত্তি হয় (নাইট্রোজেন পরমাণু বলয়ের একটি অংশ, এদেরকে প্রকৃত উপক্ষার বলে), তথাপিও উদ্ভিদে কিছু সংখ্যক শারীরতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক আছে যা আইসোপ্রিনয়েড থেকে তৈরি হয় এবং জৈব-সংশ্লেষণের শেষের দিকে নাইট্রোজেন সংযোজিত হয়। প্রকৃত অর্থে এ রকম যৌগ হলো নাইট্রোজেনঘটিত আইসোপ্রিনয়েড কিন্তু যেহেতু উপক্ষারের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এদের আছে, তাই এদেরকে সাধারণভাবে উপক্ষার বলা হয়।

কতগুলো উপক্ষার উৎপত্তিগতভাবে আংশিক আইসোপ্রিনয়েড, এদের গঠনের কিছু অংশ আসে মেভালোনিক অ্যাসিড থেকে এবং বাকি অংশ (যাতে নাইট্রোজেন থাকে) আসে অন্য কোনো পথ থেকে। নন-আইসোপ্রিনয়েড অংশের প্রকৃতি অনুসারে এসব উপক্ষারের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন- অ্যাজমালিসিন, রেসারপিন এবং ভিনডোলিন-এদের একটি

মনোটারপেনয়েড একক আছে এবং আরগট উপক্ষারে একটি C_5 একক আইসোপ্রিনয়েড আছে, এদেরকে ইন্ডোল উপক্ষারে রাখা হয়েছে।

আইসোপ্রিনয়েড উপক্ষার নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে।

টারপেনয়েড উপক্ষার : এই উপক্ষারকে মনো, সেসকুই-, ডাই এবং ট্রাইটারপেনয়েড উপক্ষারে ভাগ করা হয়। হেমি-, সেস্টার-, টেট্রা- অথবা পলিটারপেনয়েডের, অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

মনোটারপেনয়েড উপক্ষার : অ্যাকটিনিডিয়েসি, অ্যাপোসাইনেসি বিগনোনিয়েসি, ডিপসাসেসি, জেনসিয়ানেসি, লোগ্যানিয়েসি এবং ভ্যালেরিয়ানেসি গোত্রের উদ্ভিদে মনোটারপেনয়েড উপক্ষার পাওয়া যায়। জেনটিয়ানিন হলো উদ্ভিদ থেকে পৃথক করা প্রথম মনোটারপেনয়েড যা কতকগুলো প্রজাতিতে পাওয়া যায়। একে এবং এর নিকট সম্পর্কিত উপক্ষার, যেমন- জেনসিয়ানিডিন এবং জেনসিওফ্ল্যাভিনকে কখনো কখনো ইরিডয়িড উপক্ষার বলে। কেননা মনোটারপেনয়েড ইরিডয়িড গ্লাইকোসাইডস, যেমন- সোয়েরে-সিয়ামারিন, জেনথিরপিকরোসাইড ইত্যাদির সাথে এসব উপক্ষারের গঠনগত সাদৃশ্য আছে এবং সম্ভবত এদের থেকে উৎপত্তি হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মনোটারপেনয়েড উপক্ষার হলো *Actinidia polygama* থেকে অ্যাকটিনিডিন এবং *Tecoma stans* থেকে প্রাপ্ত টেকোসটিডিন, টেকোস্টানিন এবং টেকোম্যানিন উপক্ষার।

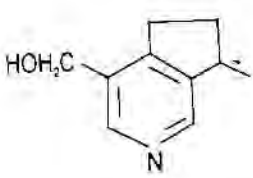

টেকোসটিডিন

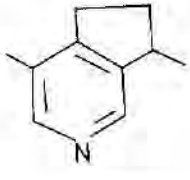

অ্যাকটিনিডিন

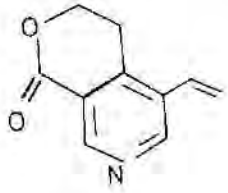

জেনটিয়ানিন

স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং জীবাণুর জন্য মনোটারপেনয়েড উপক্ষার অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত। তবে এদের উচ্চ মাত্রায় শ্বসনের হার বৃদ্ধি পায়।

সেসকুইটারপেনয়েড উপক্ষার : এর চারটি প্রধান গ্রুপ আছে এবং যে গণ (genus) থেকে এটি প্রথম পৃথক করা হয়েছে। এদের নামকরণ করা হয়েছে তার নামানুসারে। এ গ্রুপগুলো হলো *Nuphar* (নিমফেসি), *Dendrobium* (অর্কিডেসি) *Pogostemon* (লেবিয়েটি) এবং *Fabiana* (সোলানেসি)। *Nuphar luteum*-এর রাইজোম থেকে কতকগুলো সেসকুইটারপেনয়েড উপক্ষার পৃথক করা হয়েছে, যেমন- নুফারিডিন, ডিঅক্সিনুফারিডিন, নুফারামিন।

ডাইটারপেনয়েড উপক্ষার : যদিও এর চারটি রাসায়নিক শ্রেণি আছে, যেমন- লাইকোকটোনিন, হেটারাটিসিন, ভেচিন এবং অ্যাটিসিন, তবে সাধারণত অধিকতর সুবিধার জন্য গঠন এবং ফার্মাকোলজিক্যাল কার্যের ভিত্তিতে এদের দুটি বড় গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

(১) খুবই বিষাক্ত এবং অধিকতর প্রতিস্থাপিত ইস্টার ক্ষারক হিসেবে পরিচিত লাইকোকটোনিন এবং অ্যাকোনাইটিন-এই গ্রুপের যৌগের হাইড্রোলাইসিসে অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত হেটারোসাইক্লিক C_{19} অ্যালকামিন তৈরি হয়

(২) অপেক্ষাকৃত সবল এবং কম বিষাক্ত C_{20} অ্যালকামিনস, যা সামান্য প্রতিস্থাপন দেখায় এবং একে হাল্কাভাবে অ্যাটিসিনস নামে চিহ্নিত করা হয়।

কতকগুলো উদ্ভিদে (যেমন- *Inula royleana*, কম্পোজিটি) C_{19} উপক্ষার আছে, কিন্তু *Delphinium* এবং *Aconitum* (রেনানকুলেসি) এর সব প্রধান অঙ্গগুলোতেই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। *Delphinium* এবং *Aconitum* এর C_{19} উপক্ষার খুবই বিষাক্ত পদার্থ। কতকগুলো রোগের চিকিৎসায় (যেমন- বাত) অ্যাকোনাইট ব্যবহৃত হয়।

C_{19} উপক্ষারের তুলনায় C_{20} আরসিসিনস-এর সামান্য অক্সিজেন প্রতিস্থাপন আছে এবং এতে প্রায়ই একটির বেশি মিথোক্সাইল গ্রুপ থাকে না। সাধারণত এগুলো মুক্ত অবস্থায় থাকে, যদিও অ্যাসিটিক অথবা বেনজয়িক অ্যাসিডের মনোইস্টার হিসেবে কিছু যৌগ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ট্রাইটারপেনয়েড উপক্ষার : একটি ট্রাইটারপেনয়েড নিউক্লিয়াস থেকে উদ্ভূত সব উপক্ষারের মধ্যে স্টেরয়েডীয় উপক্ষার ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্টেরয়েডীয় উপক্ষার

উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক গ্রুপ এবং রাসায়নিক গঠন হিসেবে এই উপক্ষারকে ভাগ করা হয়েছে। চারটি প্রধান গ্রুপ হলো সোলানাম, ভেরাট্রাম, অ্যাপোসাইনেসি এবং বুক্সাসি উপক্ষার। তবে এই শ্রেণিবিন্যাস তেমন জোরালো নয়, এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে; যেমন- সোলানাম এবং ভেরাট্রাম উপক্ষার যথাক্রমে দুটি গণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সোলানাম উপক্ষার : এটি গ্লাইকোসাইড হিসেবে প্রধানত সোলানেসি এবং কম পরিমাণে লিলিয়েসি এবং অ্যামরিলিডিয়েসি গোত্রে পাওয়া যায়। সবগুলো অ্যালকামিনস-এর ভিত্তি হলো C_{27} কোলেসটেন কাঠামো এবং গঠন অনুসারে পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে স্পাইরোসোলেন এবং সোলানিডেন প্রকার যৌগের উপর। চারটি পর্যন্ত মনোস্যাকারাইড দিয়ে শর্করা অংশ গঠিত হতে পারে এবং স্টেরয়েড নিউক্লিয়াসে সাধারণত, কিন্তু সবসময় নয়, C_3 সংযুক্ত হয়ে একটি শাখান্বিত কাঠামো তৈরি করে।

স্টেরয়েডীয় উপক্ষার বিষাক্ত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *Solanum dulcamara* থেকে প্রাপ্ত বিটা-সোলাসেরিন-এর টিউমার প্রতিরোধী ধর্মাবলী। এই উপক্ষারের বিষাক্ততার কৌশল এখনও ভালভাবে জানা যায়নি; তবে ধারণা করা হয় যে, এই যৌগ ঝিল্লির স্টেরলের সাথে যুক্ত হয়।

স্টেরয়েডীয় স্যাপোজেনিন ডায়োসজেনিন-এর সরবরাহ ভবিষ্যতে অনিশ্চিত হতে পারে, এজন্যে কতিপয় স্পাইরোসোলেন উপক্ষার, যেমন- সোলাসোডিন এবং টোমাটিডেনল-এর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হরমোনীয় স্টেরয়েড তৈরির প্রারম্ভিক পদার্থ হিসেবে এদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

ভেরাট্রাম উপক্ষার : *Veratrum* প্রজাতির (লিলিয়েসি) প্রধান অ্যালকামিন C-nor-D-homo-steroid সিরিজের অন্তর্গত। এগুলো কার্যকর কীটনাশক এবং কতিপয় ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে।

অ্যাপোসাইনেসি উপক্ষার : এই গোত্রের অন্তর্গত কয়েকটি গণ, যেমন– *Holarrhena Funtumia, Malouetia* তে এই উপক্ষার আছে। গঠনের দিক থেকে এটিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা যায়– যাদের ভিত্তি হলো একটি সরল প্রেগনেন কাঠামো এবং অপর গ্রুপের ভিত্তি হলো একটি কোনানিন কাঠামো। এই গোত্রের অন্তর্গত উপক্ষার মুক্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু কয়েকটি ইস্টার অথবা গ্লিসারাইড হিসেবে থাকে। বাকল এবং বীজসহ উদ্ভিদের সব অঙ্গেই উপক্ষার আছে, যদিও বিভিন্ন অঙ্গে উপক্ষারের মাত্রার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। স্টেরল অথবা ট্রাইটারপেনয়েড অগ্রবর্তী পদার্থ থেকে এই উপক্ষার সংশ্লেষণ হয় বলে ধারণা করা হয়।

এই গ্রুপের উপক্ষারের কতকগুলো, যেমন– হোলাফাইলিন এবং হোলাফাইলামিন, তেমন বিষাক্ত নয়, কিন্তু অন্যগুলো খুবই বিষাক্ত। *Malouetia bequaertiana* থেকে প্রাপ্ত মালোউটিন এবং *Runtumia* প্রজাতি থেকে প্রাপ্ত ইরিডায়ামিন DNA সংশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করে। *Holarrhena antidysenterica*–এর উপক্ষার অনেকদিন থেকেই আমাশয় এবং কৃমিনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কতিপয় *Holarrhena* প্রজাতি থেকে এক নতুন শ্রেণির স্টেরয়েডীয় উপক্ষার সম্প্রতি পৃথক করা হয়েছে, এর নাম অ্যামাইনো-গ্লাইকোস্টেরয়েড।

বুক্সাসি উপক্ষার : এই উপক্ষারের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি আছে। এদের অতিরিক্ত সাইক্লোপ্রেপেন বলয় অথবা একটি প্রসারিত বলয় বি–এর উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে একে দুটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। *Buxus sempervirens* খুবই বিষাক্ত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের প্রধান উপক্ষার হলো সাইক্লোবুক্সিন ডি।

ফেনলিক যৌগ

বেশকিছু সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ ফেনলিক যৌগের অন্তর্গত ; এতে একটি অ্যারোমেটিক বলয় এবং একটি হাইড্রোঅক্সাইল গ্রুপ থাকে। উদ্ভিদের পলিফেনলের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রুপ হলো ফ্ল্যাভোনয়েড (flavonoid)। তবে ফেনোলিক কুইনোন, লিগনিন, জ্যান্থোন ও কুমারিনের গুরুত্বও কম নয়। এছাড়াও আছে অনেক মনোসাইক্লিক ফেনল। মনোমেরিক এবং ডাইমেরিক গঠন ছাড়াও, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফেনোলিক পলিমারের গ্রুপ আছে– লিগনিন, মেলানিন এবং ট্যানিন। নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ (যেমন– অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন হলো ফেনলিক) এবং টারপেনয়েডেও ফেনলিক একক আছে।

রাসায়নিকভাবে ফেনল বিক্রিয়াশীল পদার্থ। এগুলো সাধারণত অম্লীয় এবং জলীয় সোডিয়াম কার্বোনেটে এদের দ্রবণীয়তার জন্য উদ্ভিদের অন্যান্য উপাদান থেকে এদেরকে পৃথক করা যায়। কারণে ফেনল খুবই সংবেদনশীল, উদ্ভিদে বিশেষ এনজাইম আছে (ফেনো লেজেস) যা মনোফেনলকে ডাইফেনল, ডাইফেনলকে কুইনোনে এবং পলিমেরিক যৌগে পরিণত হতে অনুঘটকের কাজ করে।

পলিফেনলের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা নির্ধারণে একটি বড় সমস্যা হলো যে উদ্ভিদে প্রচুর সংখ্যক পলিফেনল আছে। তবে স্বল্প সংখ্যক পলিফেনল যৌগ (যেমন– সায়ানিডিন, কুয়েরসিটিন, ক্যাফিক অ্যাসিড ইত্যাদি) প্রায় সব শ্রেণির উদ্ভিদেই পাওয়া যায় ; অন্যান্যগুলোর অধিকাংশই খুব সামান্য সংখ্যক উদ্ভিদে পাওয়া যায়। ফেনলিক যৌগ সাধারণত বৃদ্ধিরোধক হিসেবে কাজ করে। তাই ফেনলিক সাবস্টিটিউশনযুক্ত একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হরমোন হলো লুনুলারিক (lunularic acid) অ্যাসিড (বৃদ্ধিরোধক) যা অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের (ABA) পরিবর্তে লিভারওর্টে (ব্রায়োফাইটা) থাকে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পলিফেনলের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো—

১. ফেনোলিক অ্যাগ্লাইকোন (Aglycone)

ক. সরল ফেনল এবং ফেনলিক অ্যাসিড : যদিও অধিকাংশই জটিল পলিফেনলে ক্যাটেচল (Catechol) অথবা ফ্লোরোগ্লুসিনল (pholroglucinol) একক থাকে, তবে এই দুটি সরল ফেনল উদ্ভিদে অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাকৃতিক সরল ফেনলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাইড্রোকুইনোন যা কয়েকটি উদ্ভিদ গোত্রে পাওয়া যায়, তবে রোসেসি গোত্রের *Pyrus* এবং *Doevnia* এর সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। রেসরসিনল উদ্ভিদে পাওয়া যায় না কিন্তু এর ৫-মিথাইল ডেরিভেটিভ অরসিনল (orcinol) *Erica arborea* এবং আরো কয়েকটি এরিকেসি গোত্রের উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

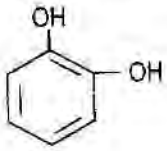

ক্যাটেচল হাইড্রোকুইনোন অরসিনল

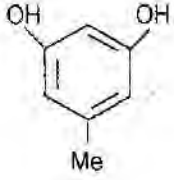

সরল ফেনলের তুলনায় ফেনলিক অ্যাসিড প্রায় সব উদ্ভিদেই পাওয়া যায়। চারটি অ্যাসিড সব গুপ্তবীজী উদ্ভিদে পাওয়া যায় বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলো হলো প্যারা-হাইড্রোক্সি-বেনজয়িক, প্রোটোক্যাটেচুইক, ভ্যানিলিক এবং সিরিনজিক অ্যাসিড। প্রথম তিনটি আবার ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং ফার্নেও পাওয়া যায়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের আরো দুটো অ্যাসিড হলো জেনটিসিক এবং স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। কখনো কখনো উদ্বায়ী তেলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের মিথাইল ইস্টার থাকে।

গ্যালিক অ্যাসিড হলো আরেকটি অ্যাসিড যা *Kalanchoe blossfeldiana* এর পাতায় থাকে এবং পুষ্পায়নকে রোধ করে।

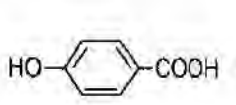

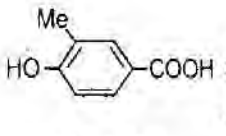

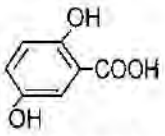

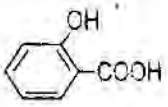

প্যারা-হাইড্রোক্সি-বেনজয়িক অ্যাসিড ভ্যানিলিক অ্যাসিড জেনটিসিক অ্যাসিড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড

ছত্রাক এবং লাইকেনেও বিভিন্ন প্রকার সরল ফেনল এবং ফেনলিক ডেরিভেটিভ পাওয়া যায়। ছত্রাকের দুটি অনন্য ফেনল হলো ৩,৪– ডাইহাইড্রোক্সিফিনাইলগ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড (*poly porus* এর) এবং ৩,৪,৫ – ট্রাইহাইড্রোক্সিবেনজালডিহাইড (*Boletus*–এর)।

খ. ফিনাইলপ্রোপানয়েড : এদের মধ্যে প্যারা–হাইড্রোক্সিসিনামিক অ্যাসিড (অথবা প্যারা–কোমারিক (p-coumaric এসিড) সব উদ্ভিদেই পাওয়া যায় এবং এজাতীয় অনেক পদার্থের অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও ক্যাফিক, ফেরুলিক এবং সিনাপিক অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ। বীজের অঙ্কুরোদগমরোধক হিসেবে ফেরুলিক অ্যাসিড কাজ করে।

গ. ফ্ল্যাভোনয়েড : ফ্ল্যাভোনয়েড হলো পলিফেনোলিক যৌগ এবং এতে ১৫টি কার্বন পরমাণু আছে ; একটি সরলরৈখিক ৩- কার্বন শৃঙ্খল দ্বারা দুটি বেঞ্জিন বলয় যুক্ত থাকে। এর সাধারণ গঠন নিচে দেখানো হয়েছে।

ফুলের কোষে সাধারণত ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে। ফুলের বিভিন্ন রঙের জন্য প্রধানত ফ্ল্যাভোনয়েড, বিশেষ করে অ্যান্থোসায়ানিন দায়ী। এটি ক্লোরোফিল এবং ক্যারোটিনয়েডের পরেই উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জক পদার্থ। ফ্ল্যাভোনস সম্পূর্ণ বর্ণহীন, উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার (১২ প্রকার) ফ্ল্যাভোনয়েড পাওয়া গেলেও প্রধানত তিনটি শ্রেণি – অ্যান্থোসায়ানিন, ফ্ল্যাভোন এবং ফ্ল্যাভোনল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

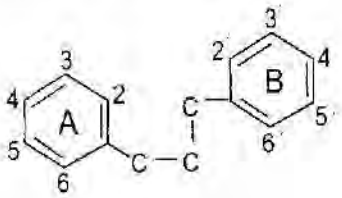

সাধারণ গঠন

অ্যান্থোসায়ানিন হলো গ্লাইকোসাইডিক যৌগ এবং ফুলের বিভিন্ন রঙের (নীল, বেগুনি এবং লাল) জন্য অ্যান্থোসায়ানিন দায়ী। অ্যান্থোসায়ানিন মনোগ্লাইকোসাইড হলে চিনির অবশেষ (গ্লুকোজ, র‍্যামনোজ, জাইলোজ, জেনটিওবায়োজ) কেবল ৩ নম্বর অবস্থানে থাকে এবং ডাইগ্লাকোসাইড হলে ৩ এবং ৫ নম্বর অবস্থানে থাকে। প্রকৃতিতে রঙের যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা নির্ভর করে A এবং B বলয়ে সাবস্টিটিউয়েন্ট-এর সংখ্যা, প্রকার এবং অবস্থান এবং pH, ধাতব আয়নের উপস্থিতির উপর। অ্যান্থোসায়ানিনের বলয় B তে মুক্ত হাইড্রোঅক্সাইল গ্রুপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অধিকতর নীল এবং মেথোঅক্সাইল গ্রুপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অধিকতর লাল হয়। এই রঞ্জকের চারপাশের মাধ্যম দ্বারাও রঙ প্রভাবিত হয় : অম্ল মাধ্যমে লাল, pH বাড়লে নীল এবং পরিশেষে দৃঢ় ক্ষারীয় দ্রবণে অ্যান্থোসায়ানিন নষ্ট হয়ে যায়। অ্যান্থোসায়ানিনের সাথে ধাতব আয়ন, বিশেষ করে লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম এবং ট্যানিনের সংযোগে রঙের পরিবর্তন হয়।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাভোনল হলো কেম্পফেরল (kaempferol), কোয়েরসিটিন (quercetin) এবং মাইরিসিটিন (myricetin)। এদের গঠন নিচে দেখানো হয়েছে।

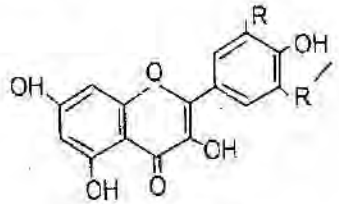

ক্যাম্পফেরল, R=R′=H
কোয়েরসিটিন, R=OH,R′=H
মাইরিসিটিন, R=R′=OH

সাধারণ গঠন (ফ্ল্যাভোনল)

এগুলো অ্যান্থোসায়ানিনের সাথে ফুলে থাকলেও প্রায় সব উদ্ভিদের পাতায়ও থাকে।

ফ্ল্যাভোনল এবং অ্যান্থোসায়ানিডিন-এ ৩-হাইড্রক্সিগ্রুপ থাকে, কিন্তু ফ্ল্যাভোন-এ এটি অনুপস্থিত। দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাভোন হলো এপিজেনিন (apigenin) এবং লিউটিওলিন (luteolin)।

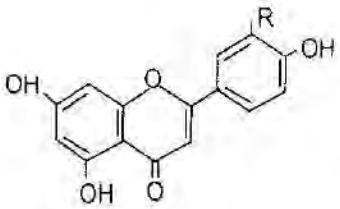

এপিজেনিন, R=H
লিউটিওলিন, R=OH

সাধারণ গঠন (ফ্ল্যাভোন)

কতকগুলো উদ্ভিদের, বিশেষ করে কম্পোজিটি গোত্রের ফুলের হলুদ রঙের জন্য চালকোন (chalcone) এবং অরোন (aurone) দায়ী। ফুল ছাড়াও উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গের, যেমন- হার্ট (heart) কাষ্ঠ এবং কতিপয় লেগুমের বীজ, রঙের জন্য এরা দায়ী।

ঘ. জ্যান্থোন এবং স্টিলবেন : গঠনের দিক দিয়ে ফ্ল্যাভোনয়েডের সাথে জ্যান্থোনের (xanthones) মিল থাকলেও, এটি খুব কম সংখ্যক উদ্ভিদে থাকে, বিশেষ করে গার্সিনিয়েরি এবং জেনসিয়ানেসি গোত্রের উদ্ভিদে। এসব উদ্ভিদের কাষ্ঠ, মূল অথবা পাতায় থাকে। আম গাছের পাতায় যে অ্যান্থোন পাওয়া যায় তা হলো ম্যাঙ্গিফেরিন (mangiferin)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক স্টিলবেন (stilbene) হলো লুনুলারিক (lunularic) অ্যাসিড, এটি প্রকৃতপক্ষে ডাই-হাইড্রোঅক্সিস্টিলবেন, যা ABA এর পরিবর্তে বৃদ্ধিরোধক হিসেবে সব লিভারওর্টে পাওয়া যায়। অপর একটি ডাই-হাইড্রোঅক্সিস্টিলবেন হলো 'ব্যাটাটাসিন ৩' যা *Dioscorea batatis* এর বুলবিলের সুপ্তাবস্থাকে প্ররোচিত করে।

অন্যান্য অধিকাংশ স্টিলবেনের বেনজিন বলয়ের মধ্যে অসম্পৃক্ত দ্বি-বন্ধনী আছে। এর উদাহরণ হলো *Pinus*-এর পিনোসিলভিন এবং *Eucalyptus*-এর রেসভেরাট্রল। ছত্রাক-প্রতিরোধী ধর্মের জন্য স্টিলবেনের গুরুত্ব আছে এবং এটি ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বৃক্ষের হার্ট কাষ্ঠকে রক্ষা করে।

ঙ. কুইনোন : অধিকাংশ প্রাকৃতিক কুইনোনে (quinone) ফেনলিক অথবা মিথোঅক্সাইল সাবসটিটিউয়েন্ট থাকায় এদেরকে পলিফেনলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরল বেনজোকুইনোন বেশ বিষাক্ত হওয়ায় জীবিত উদ্ভিদ কোষে এটি প্রায় থাকে না বললেই চলে। তাই এটি বিজারিত অবস্থা হাইড্রোকুইনোন হিসেবে থাকে। সরল বেনজোকুইনোনের বিষাক্ততার সুন্দর উদাহরণ হলো *Primula obconica*-এর পাতার গ্ল্যান্ডিউলার রোমে যে প্রাইমিন (এক প্রকার বেনজোকুইনোন) থাকে তার জন্য অ্যালার্জি হয়। ছত্রাকের ফ্রুটিং বডির রঙের জন্য দায়ী বেনজোকুইনোনও উদ্ভিদে পাওয়া যায়; এগুলো অবশ্য ইলেক্ট্রন পরিবহণ তন্ত্রে বাহক হিসেবে কাজ করে। এ রকম দুটি যৌগ হলো প্লাস্টোকুইনোন, যা ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে, এবং ইউবিকুইনোন, যা মাইটোকনড্রিয়াতে থাকে। অপর একপ্রকার কুইনোন হলো ন্যাপথোকুইনোন। জাগল্যানডেসি গোত্রের উদ্ভিদের পাতা ও মূলে জাগলোন (৫-হাইড্রোঅক্সাইল-ন্যাপথোকুইনোন) থাকে।

চ. **বিবিধ ফেনল :** উদ্ভিদের কতকগুলো পদার্থ যা সাধারণত অন্য শ্রেণির অন্তর্গত, যেমন উপক্ষার এবং টারপেনয়েড, এদের ফেনোলিক সাবসটিটিউশন থাকে। নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের মধ্যে একটি পরিচিত উদাহরণ হলো অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন। এর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো অ-প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডও ফেনলিক। এর একটি উদাহরণ হলো ৩, ৪- ডাই-হাইড্রোঅক্সিফিনাইল অ্যালানিন যা *Vicia faba* এবং অন্যান্য লেগুমে উপস্থিত। ফেনলিক উপক্ষারও উদ্ভিদে পাওয়া যায়। মরফিনে একটি এবং বিটানিডিন-এ (সুগার বীটের মূলের বেগুনি রঙ) দুটি ফেনোলিক হাইড্রোক্সাইল গ্রুপ আছে।

উদ্ভিদের অনেক টারপেনয়েডে ফেনলিকডেরিভেটিভ আছে। যেমন– মনোটারপিন সিরিজের থাইমল এবং ডাইটারপিন সিরিজের *Inula yvleana* (কম্পোজিটি গোত্র)-এর মূলে উপস্থিত ইনুরোআইলিয়ানল (inuroyleanol) এবং তুলাগাছের গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জক পদার্থ গসিপোল (gossypol)।

২. ফেনলিক কনজুগেট

জীবন্ত উদ্ভিদ কোষে ফেনলিক যৌগগুলো কদাচিৎ মুক্ত অবস্থায় থাকে ; অধিকাংশই ক্ষেত্রেই এগুলো সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন– চিনির সাথে যুক্ত হয়ে বিটা-ডি-গ্লুকোপাইরানোসাইড তৈরি হয়। মুক্ত অবস্থায় বিষক্রিয়া ঘটায় বলেই ডাইফেনল, যেমন– হাইড্রোকুইনোন, ক্যাটেচল অথবা প্রোটোক্যাটেচয়িক অ্যাসিড চিনির সাথে যুক্ত থাকে। পলিফেনলের ক্ষেত্রে, যেমন– ফ্ল্যাভোনয়েড, অনেকগুলো কনজুগেটেড অবস্থা আছে। বিশেষ করে গ্লাইকোসাইড সবচেয়ে বেশি আছে।

উদ্ভিদে ফেনলিক যৌগের কার্য

এখনো পর্যন্ত এটি সুনিশ্চিত নয় যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপাকে ফেনলিক যৌগের কি ভূমিকা আছে। বহিঃস্থভাবে প্রয়োগকৃত শারীরতাত্ত্বিক ঘনমাত্রায় অনেক ফেনলের বৃদ্ধির উপর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু এটি নির্দেশ করে না যে, অন্তঃস্থ ফেনলিক যৌগেরও একই ভূমিকা আছে।

উদ্ভিদে ফেনলিক কি অন্তঃস্থ হরমোনের ভূমিকা পালন করে? সাধারণ ফেনোলিক, বিশেষ করে ফ্ল্যাভোনয়েডের ক্ষেত্রে এর উত্তর নাবাচক, কেননা হরমোনের ধর্মের মতো এসব যৌগের ধর্ম নেই। এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো ফেনল হরমোনের মতো কাজ করে। লিভারওর্টে ABA এর পরিবর্তে ডরমিনের মতো হরমোন লুনুলারিক অ্যাসিড থাকে। *Lunularia cruciata* নিয়ে পরীক্ষা করে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

অধিকাংশ ফেনলিক হরমোনের মতো কাজ না করলেও, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের সাথে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এরা উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে। AA অক্সিডেজের, এক প্রকার পারঅক্সিডেজ এনজাইম-এর উপর ফেনলিক যৌগের প্রভাবের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ; এই এনজাইম অক্সিনের (IHH) ক্রিয়াকে নষ্ট করতে সক্ষম। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, ক্যাটেচল বি বলয়যুক্ত ফ্ল্যাভোনয়েড অক্সিডেজের কার্যকে নষ্ট করে অক্সিনের কার্যকারিতা বজায় রাখে। তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপর এসব ফ্ল্যাভোনয়েডের উদ্দীপক প্রভাব আছে।

অপর একটি উদ্ভিদ হরমোন ইথিলিনের জৈব-সংশ্লেষণের উপর ফেনলিক-এর প্রভাব আছে। মিথিওনিন থেকে ইথিলিনের জৈব-সংশ্লেষণে প্যারা-কোমারিক অ্যাসিড এস্টার একটি প্রয়োজনীয় কো-ফ্যাক্টর।

উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপর ফেনলিক-এর পরোক্ষ প্রভাবও আছে। যেমন- ফেনলিক মাইটোকন্ড্রিয়াতে ATP সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত করতে সক্ষম এবং মূলে আয়ন পরিশোষণকে হ্রাস করে। অক্সিনের মেরুদেশীয় (polar) পরিবহণকে এবং মূলরোমের প্রোটোপ্লাজমীয় আবর্তনকে ফ্ল্যাভোনয়েড প্রভাবিত করে। কতগুলো যৌগের, যেমন- কুয়েরসিটিন, উপস্থিতিতে কতকগুলো এনজাইমঘটিত বিক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সম্প্রতি জানা গেছে যে, কতিপয় ফেনলিক, বিশেষ করে ক্যাফিক অ্যাসিড ইস্টার এবং ফ্ল্যাভোনয়েড, স্বল্পমাত্রায় ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে, তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে সালোকসংশ্লেষণের সাথে ফেনলিক-এর সম্পর্ক আছে কি নেই। ফেনলিক যৌগ প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে, তাই অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ক্লোরোপ্লাস্টের গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে রক্ষা করে। তবে এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে।

উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপর ফেনলিক-এর ভূমিকা ভালভাবে জানা না গেলেও উদ্ভিদের পরিবেশতাত্ত্বিক ভূমিকার উপর এদের প্রভাব জানা গেছে। ফুল ও ফলের রঙের জন্য ফ্ল্যাভোনয়েড-এর (ক্যারোটিনয়েডসহ) গুরুত্ব আছে। এই রঙের জন্য প্রাণীরা আকৃষ্ট হয় এবং পরাগায়ন (pollination) এবং ফলবীজের বিসরণ (dispersal) ঘটায়। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, কতকগুলো ফেনলিক ডেরিভেটিভ অ্যালিলোপেথিক (allelopathic) এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এগুলো হলো উদ্ভিদ থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ যা নিজেদের অথবা চারপাশের অন্যান্য উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদে ফ্ল্যাভোনয়েড, বিশেষ করে ট্যানিনের জন্য গরু-ছাগল এসব উদ্ভিদ থেকে দূরে থাকে। কতকগুলো ফেনলিক যৌগ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের বিরুদ্ধে উদ্ভিদকে প্রতিরোধী করে।

Library
Dhaka

দ্বিতীয় অধ্যায়

লিপিড বিপাক

মিশ্র আণবিক গঠনবিশিষ্ট কয়েকটি জৈব-রাসায়নিক দ্রব্যকে একত্রে লিপিড বলা হয়। এ দ্রব্যগুলোর রাসায়নিক গঠনের বিভিন্নতা আছে। এ দ্রব্যের একটি সাধারণ ধর্ম হলো যে, এগুলো সবই জৈব-দ্রবণ, যেমন- অ্যাসিটোন, অ্যালকোহল, ইথার, বেনজিন প্রভৃতিতে দ্রবণীয়, কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয়। এ দ্রব্যগুলোর কিছু (এদেরকে স্নেহপদার্থ বলে) সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বীজ ও ফলে জমা থাকে। সমআয়তনের শর্করা ও প্রোটিনের তুলনায় স্নেহপদার্থ (fats and oils) অনেক বেশি শক্তি ধারণ করে। অপর দ্রব্যগুলো কোষঝিল্লি, নিউক্লিয় ঝিল্লি, মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের ঝিল্লির গঠনে ব্যবহৃত হয়, এদেরকে ফসফোলিপিড (phospholipid) বলে। অপর এক প্রকার লিপিড যা পাতার উপর পুরু স্তর সৃষ্টি করে, (কিউটিকল) তাদেরকে মোম (wax) বলা হয়। স্নেহপদার্থ এবং ফসফোলিপিড থেকে ভিন্নতর গঠন সম্বলিত কতকগুলো পদার্থ, যেমন- স্টেরয়ড (steroid), ক্যারোটিনয়ড (carotenoid) এবং রাবার (rubber) লিপিডের অন্তর্ভুক্ত।

লিপিডের শ্রেণিবিভাগ

লিপিডকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

১. স্নেহ পদার্থ (Fats and oil), এটি অ্যাসাইল গ্লিসারল নামেও পরিচিত,
২. ফসফোলিপিড (Phospholipid),
৩. মোম (Wax),
৪. গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid) এবং
৫. টারপেনয়েড লিপিড (Terpenoid lipid)। স্টেরয়েড, ক্যারোটিনয়ড, টারপেনটিন এবং রাবার এর অন্তর্ভুক্ত।

১. স্নেহপদার্থ : তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এক অণু গ্লিসারলের সহযোগে এক অণু স্নেহপদার্থ উৎপন্ন হয়। গ্লিসারলে তিনটি হাইড্রোক্সাইল গ্রুপ (-OH) থাকায় এটি ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল। স্নেহপদার্থে গ্লিসারলের তিনটি হাইড্রোক্সাইল গ্রুপের সাথে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড ইস্টারকৃত হয় বলে এদেরকে ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride) বলে। যদিও মনো- এবং ডাইগ্লিসারাইড আছে, তবুও উদ্ভিদের অধিকাংশ স্নেহপদার্থই হলো ট্রাইগ্লিসারাইড।

গ্লিসারলের সাথে সাধারণত তিনটি ভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং খুব কম ক্ষেত্রেই তিনটি একই ফ্যাটি অ্যাসিড হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় তরল স্নেহপদার্থকে তেল এবং কঠিন স্নেহপদার্থকে চর্বি (fat) বলা হয়। চর্বি সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা এবং তেল অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা গঠিত। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে এক থেকে তিনটি পর্যন্ত দ্বি-বন্ধনী (double bond) থাকে।

উদ্ভিদে যে ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় তাতে জোড়সংখ্যক (even number, যেমন– ১০,১২,১৪ ইত্যাদি) কার্বন থাকে এবং সাধারণত ১২ হতে ১৮ কার্বনবিশিষ্ট হয়।

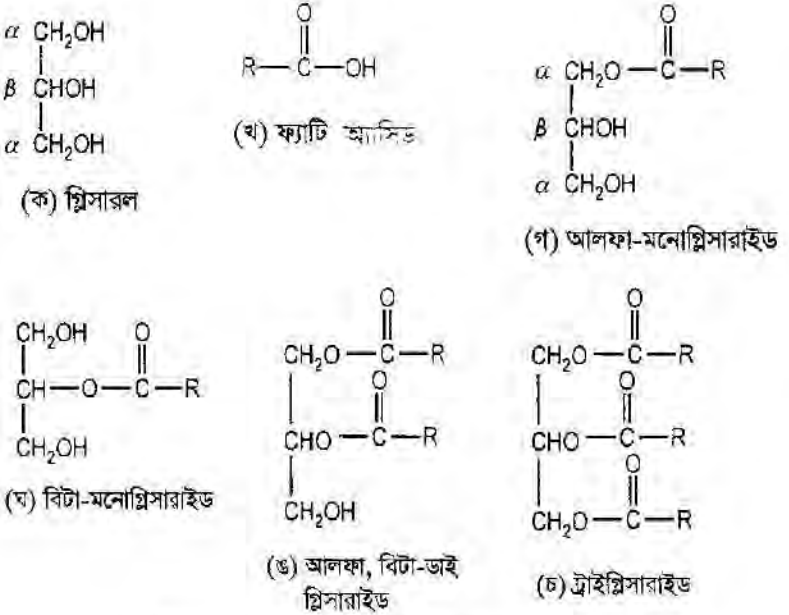

চিত্র ২.১ : গ্লিসারল, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাইডের গঠন

স্নেহপদার্থকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ (এটি সাবান নামে পরিচিত) উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়াকে সাবানায়ন (saponification) বলে।

উদ্ভিদে স্নেহপদার্থের বিস্তার ও গুরুত্ব : উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা এবং মূলে খুব অল্প পরিমাণ স্নেহপদার্থ থাকে; এটি এ সমস্ত অঙ্গের শুষ্ক ওজনের প্রায় ০.৫ থেকে ২ শতাংশ। স্নেহপদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় বলে কোষের সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে (অবদ্রব) থাকে। বীজে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্নেহপদার্থ থাকে। বীজের শস্যে কিংবা বীজপত্রের সঞ্চয়ী কোষে এটি জমা থাকে। শর্করার তুলনায় এদের প্রতি অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ অক্সিজেন থাকে। তাই এদের ভাঙনের সময় প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। ফলে অনেক ATP তৈরি হয়, তাই শর্করা অপেক্ষা স্নেহপদার্থে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে। এজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজে স্নেহপদার্থ সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।

উদ্ভিজ্জ তেলের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। হাইড্রোজেন সংযোজনে (hydrogenation) অসম্পৃক্ত তেলকে সম্পৃক্ত করে মার্জারিন, অলিওমার্জারিন, বনস্পতি প্রভৃতি কঠিন পদার্থে পরিণত করা হয়। হাইড্রোজেন সংযোজনের সময় অলিক, লাইনোলেয়িক এবং লাইনোলেনিক অ্যাসিডের দ্বি-বন্ধনীগুলো সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তিসির তেলে তিনটি দ্বি-বন্ধনীবিশিষ্ট

লাইনোলেনিক অ্যাসিড বাতাস থেকে অক্সিজেন শোষণ করে কঠিন হয়ে যায়। তাই এ তেল তৈলচিত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়।

সারণি ২.১ : উদ্ভিদে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাটি অ্যাসিড

নাম	কার্বনের সংখ্যা	দ্বিবন্ধনীর সংখ্যা	গঠন
ক) সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড			
লরিক (Lauric)	১২	০	$CH_3(CH_2)_{10}COOH$
মাইরিসটি (myristic)	১৪	০	$CH_3(CH_2)_{12}COOH$
পামিটিক (palmitic)	১৬	০	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$
স্টিয়ারিক (stearic)	১৮	০	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$
অ্যারাকাইডিক (arachidic)	২০	০	$CH_3(CH_2)_{18}COOH$
খ) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড			
অলিক (oleic)	১৮	১ (৯—১০ কার্বনের মধ্যে)	$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOH$
লিনোলেইক (linoleic)	১৮	২ (৯-১০ এবং ১২-১৩ কার্বনের মধ্যে)	$CH_3(CH_2)_4CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_7COOH$
লিনোলেনিক (linolenic)	১৮	৩ (৯-১০,১২-১৩ এবং ১৫-১৬ কার্বনের মধ্যে)	$CH_3CH_2CH=CHCH_2CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_7COOH$

স্নেহপদার্থের সংশ্লেষণ : আলোচনার সুবিধার্থে স্নেহপদার্থের সংশ্লেষণকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষণ

খ. গ্লিসারলের সংশ্লেষণ, এবং

গ. ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের ইস্টারকরণ।

ক. ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষণ : প্রায় সব দীর্ঘ-শৃংখল ফ্যাটি অ্যাসিডের জোড় সংখ্যক কার্বন থাকে। তাই এটি নির্দেশ করে যে, কোনো দুই-কার্বন যৌগের পুনঃ পুনঃ সংযোজনের ফসল ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ^{14}C ব্যবহার করে প্রমাণিত হয়েছে যে, অ্যাসিটেট হলো দুই-কার্বন যৌগ, যা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। তবে এসিটেটের সক্রিয়

অবস্থা অর্থাৎ অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণে প্রয়োজনীয় কার্বন সরবরাহ করে। শ্বসনের সময় শর্করা থেকে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ তৈরি হয়।

প্রথমে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ এর সাথে CO_2 মিলিত হয়ে সক্রিয় তিন-কার্বন যৌগ মেলোনাইল কোএনজাইম-এ (melonyl CO A) তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে CO_2 বায়োটিন (biotin) এর সাথে যুক্ত হয়ে সক্রিয় CO_2 তৈরি করে; ATP এ বিক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে। দ্বিতীয় ধাপে বায়োটিন কমপ্লেক্স থেকে CO_2 এক অণু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ এর সাথে মিলিত হয়ে মেলোনাইল কোএনজাইম-এ তৈরি হয়।

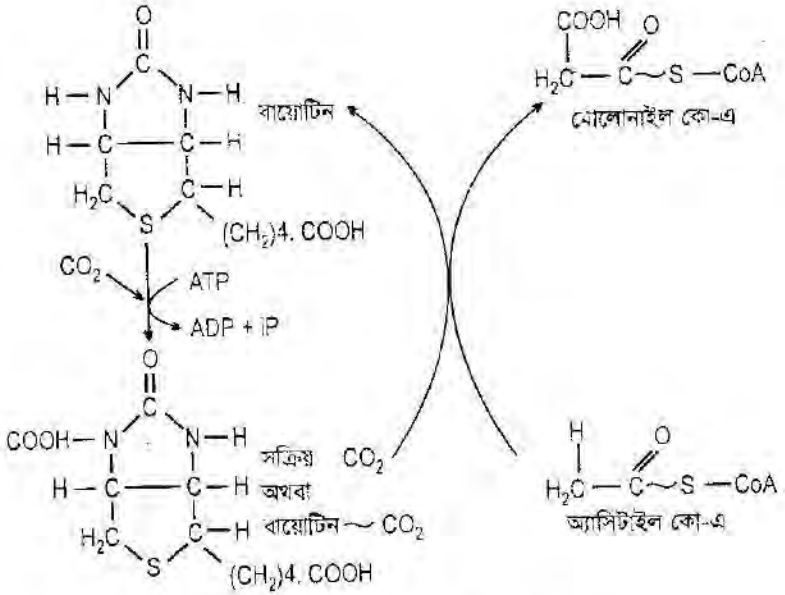

চিত্র ২.২ : মেলোনাইল কোএনজাইম-এ সংশ্লেষণ

মেলোনাইল কোএনজাইম-এ অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ এর সাথে যুক্ত না হয়ে অ্যাসাইল কেরিয়ার প্রোটিন (acyl carrier protein) বা ACP এর সাথে যুক্ত হয়। সালফহাইড্রিল গ্রুপ (SH) এ প্রোটিনের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে থাকে। ট্রান্সঅ্যাসাইলেজ (transacylase) এনজাইমের উপস্থিতিতে এ বিক্রিয়া হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণের প্রথম আবর্তে (turn) অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ ACP এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যাসিটাইল –S-ACP গঠন করে যা মেলোনাইল –S-ACP এর সাথে যুক্ত হয়ে বিটা–কিটো–অ্যাসাইল –S–ACP গঠন করে। এ সময় এক অণু করে CO_2 এবং ACP-SH মুক্ত হয়।

দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় $NADPH+H^+$ এর উপস্থিতিতে বিটা–কিটো–অ্যাসাইল –S–ACP বিজারিত হয়ে ডি–বিটা–হাইড্রোঅক্সি অ্যাসাইল –S-ACP গঠিত হয়।

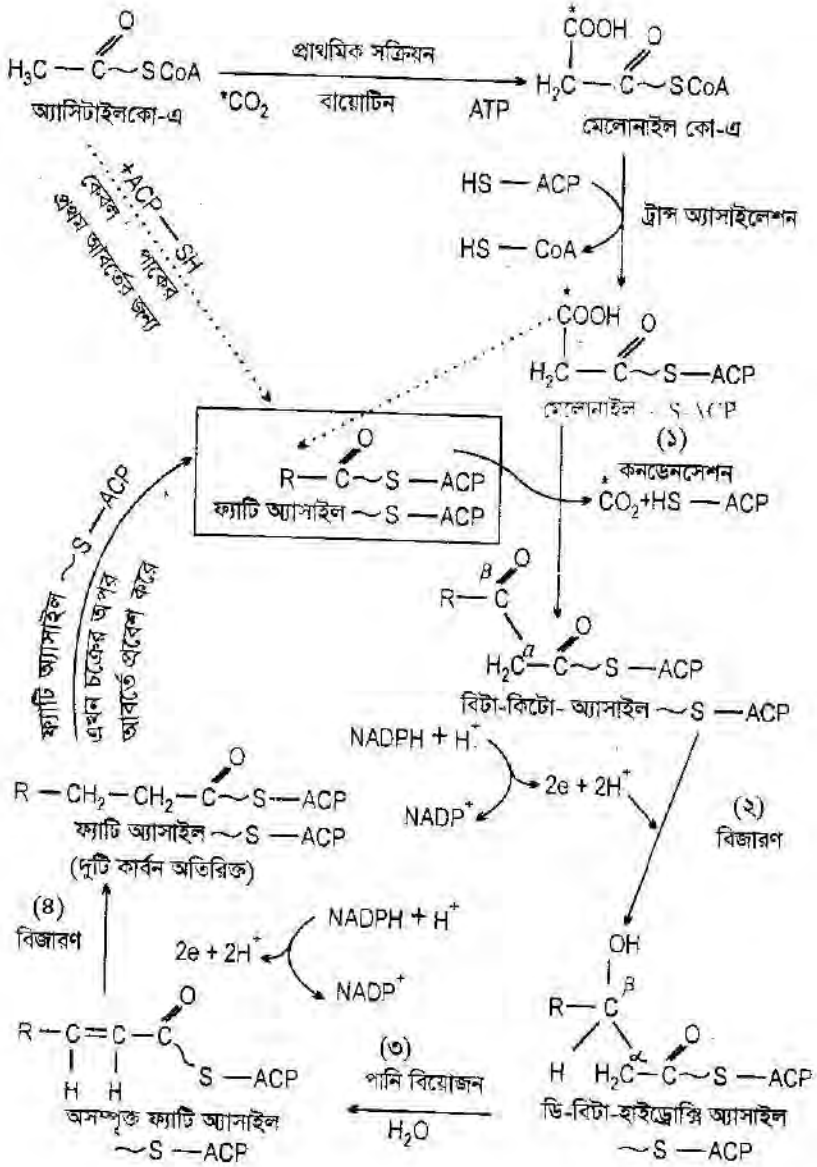

চিত্র ২.৩ : ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষণ চক্র

তৃতীয় বিক্রিয়ায় ডি-বিটা-হাইড্রোঅক্সিঅ্যাসাইল -S-ACP থেকে এক অণু পানি বিয়োজিত হয়ে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল -S-ACP গঠিত হয়

চক্রের (spiral) প্রথম আবর্তের চতুর্থ বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত ফ্যাটিঅ্যাসাইল -S-ACP বিজারিত হয়ে একটি ফ্যাটি অ্যাসাইল -S-ACP গঠন করে যাতে দুটি অতিরিক্ত কার্বন থাকে (চিত্র ২.৩) এক্ষেত্রেও $NADPH+H^+$ প্রোটন ও ইলেক্ট্রন প্রদান করে।

অ্যাসিটাইল -S-ACP থেকে শুরু করে চক্রের প্রতি আবর্তে দুটি করে কার্বন যুক্ত হয়, ফলে সাত আবর্তের পর পামিটাইল -S-ACP [$H_3C(CH_2)_{14}\overset{O}{\overset{\|}{C}}$-S-ACP] তৈরি হয়। থায়োইস্টার বন্ধনীর অর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে মুক্ত পামিটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ থেকে পামিটিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের সম্পূর্ণ বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :

$$8\ H_3CCCO\text{-S-COA} + 7CO_2 + 14NADPH + 14H^+ 7ATP \longrightarrow H_3C(CH_2)_{14}COOH + 8COASH + 7CO_2 + 14NADP^+ + 7ADP + 7iP + 6H_2O$$

খ. গ্লিসারলের সংশ্লেষণ : গ্লিসারলের সংশ্লেষণ সম্ভবত একাধিক পথে হয়। একটি সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞাত পথ হলো ডাই-হাইড্রোঅক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট থেকে গ্লিসারলের সংশ্লেষণ। শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় মধ্যবর্তী পদার্থ হিসেবে ডাই-হাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট তৈরি হয়। পরে এটি বিজারিত হয়ে আলফা-গ্লিসারল ফসফেটে পরিণত হয় এবং এ অবস্থায় এটি ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে ইস্টার তৈরি করে।

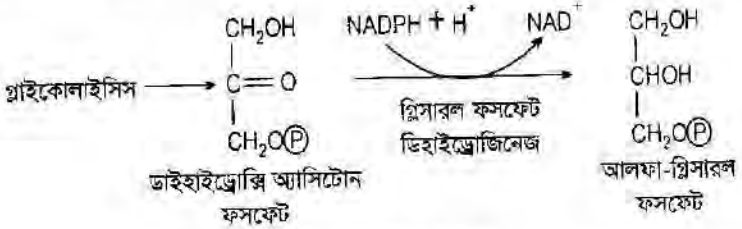

চিত্র ২.৪ : গ্লিসারলের সংশ্লেষণ

গ. ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের ইস্টারকরণ : মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ইস্টারকরণে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই প্রথমে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ এর সাথে মিলিত হয়ে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ গঠন করে। পর্যায়ক্রমে দুটি ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ, আলফা-গ্লিসারল ফসফেটের সাথে মিলিত হয়ে ফসফোটিডিক অ্যাসিড গঠিত হয়। পরের বিক্রিয়ায় ফসফেটেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ফসফেট গ্রুপ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে আলফা, বিটা-ডাইগ্লিসারাইড এবং অর্থোফসফেট তৈরি হয়। পরিশেষে ডাইগ্লিসারাইডের সাথে অপর একটি ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ সংযুক্ত হয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড গঠিত হয় (চিত্র ২.৫)।

স্নেহপদার্থের ভাঙন : লাইপেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে স্নেহপদার্থ ভেঙে এক অণু গ্লিসারল এবং তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এ ভাঙন ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। আলফা

অবস্থানের দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড পর পর অপসারিত হয়ে একটি বিটা-গ্লিসারাইড গঠিত হয় এবং সবশেষে বিটা-অবস্থানের ফ্যাটি অ্যাসিডটিও অপসারিত হয়।

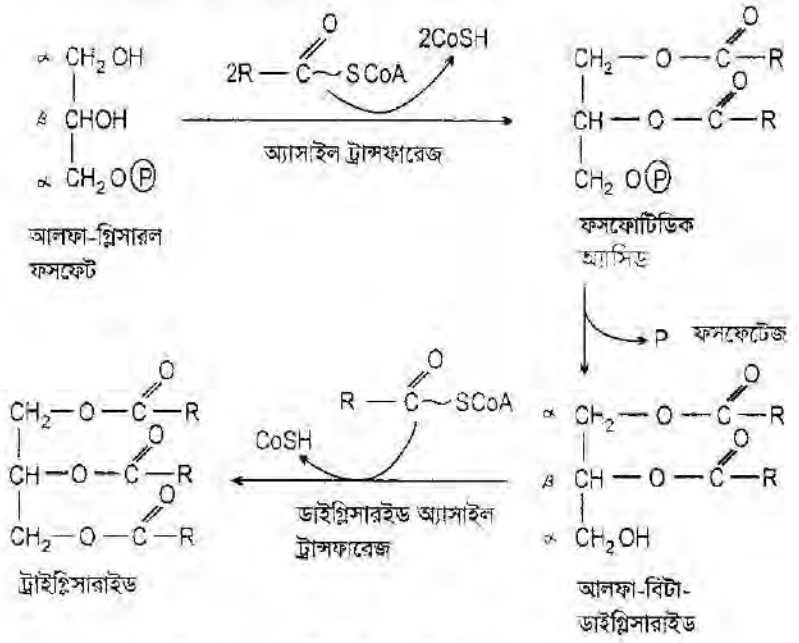

চিত্র ২.৫ : ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের ইস্টারকরণ

ক. গ্লিসারলের ভাঙন : গ্লিসারল প্রথমে ATP এর সাথে যুক্ত হয়ে আলফা-গ্লিসারল ফসফেট এবং আলফা-গ্লিসারল ফসফেট দ্বারা জারিত হয়ে ডাইহাইড্রোঅক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে পরিণত হয়। ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট হয় গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে, না হয় কতিপয় ক্ষেত্রে এটি সুক্রোজে পরিণত হয়।

খ. ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণচক্র : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্নেহপদার্থ শ্বসনিক বস্তু (respiratory substrate) হলে, এটি প্রথমে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণের ফলে পানি, CO_2 এবং প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। যেমন–

$$H_3C(CH_2)_{16}COOH + 26O_2 \longrightarrow 18CO_2 + 18H_2O + \text{শক্তি}$$

স্টেরিক অ্যাসিড

কয়েকটি আবর্তে এ জারণ সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক আবর্তে দুই-কার্বন যৌগ পৃথক হয়। বিটা-অবস্থানের কার্বনে প্রথম জারণ প্রক্রিয়া হয় বলে একে বিটা জারণ বা বিটা-অক্সিডেশন (β-Oxidation) বলে। বিটা-অক্সিডেশনের ফলে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ, $FADH_2$ এবং $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। কোএনজাইম-এ ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে $FADH_2$ এবং $NADH+H^+$ এবং $NADPH+H^+$ তৈরি করে। এ বিজারিত কোএনজাইমগুলো ইলেক্ট্রন প্রবাহতন্ত্রের মাধ্যমে ATP উৎপন্ন করে।

বিটা-অক্সিডেশনের প্রারম্ভে ATP এবং কোএনজাইম-এ এর সাথে বিক্রিয়া করে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এতে পরিণত হয়। এটি দুই ধাপে সংঘটিত হয়। এই দুটি ধাপের মধ্যে প্রথম ধাপে মুক্ত ফ্যাটি এসিড ATP এর সাথে বিক্রিয়া করে ফ্যাটি অ্যাসাইল AMP যৌগ গঠন করে।

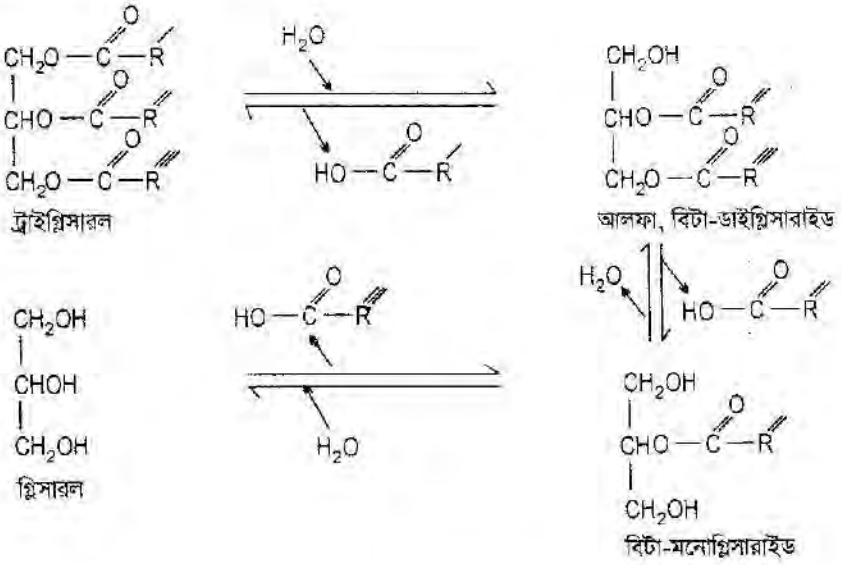

চিত্র ২.৬ : লাইপেজ কর্তৃক ট্রাইগ্লিসারাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণ

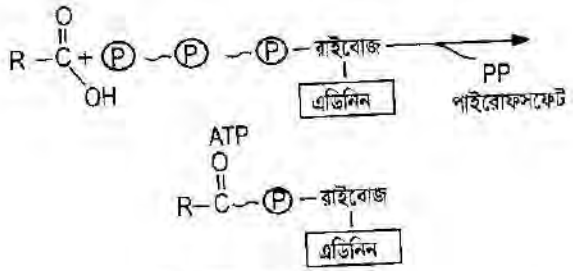

ফ্যাটি অ্যাসাইল –AMP

দ্বিতীয় ধাপে ফ্যাটি অ্যাসাইল AMP এবং কোএনজাইম-এ বিক্রিয়া করে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ এবং AMP তৈরি হয়।

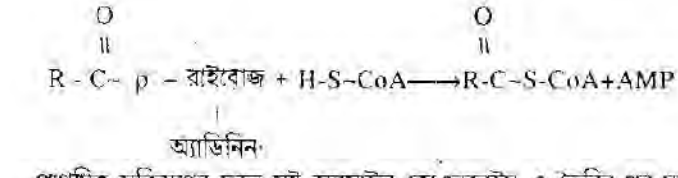

প্রাথমিক সক্রিয়ণের ফলে সৃষ্ট অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ তৈরির পর মাত্র চারটি বিক্রিয়ায় বিটা-অক্সিডেশন সম্পন্ন হয় (চিত্র ২.৭)।

প্রথম বিক্রিয়া ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ঘটে। এ বিক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ এর আলফা এবং বিটা কার্বন থেকে একটি করে প্রোটন ও ইলেক্ট্রন অপসারিত হয় এবং FAD তা গ্রহণ করে $FADH_2$-তে পরিণত হয়। এর ফলে আলফা, বিটা-অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কেএনজাইম-এ তৈরি হয়।

দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ হাইড্রেটেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ এক অণু পানি গ্রহণ করে এল-বিটা-হাইড্রোক্সি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এতে পরিণত হয়।

তৃতীয় বিক্রিয়ায় এল-বিটা-হাইড্রোক্সি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এবং NAD^+ এর উপস্থিতিতে এল-বিটা-হাইড্রোক্সিঅ্যাসাইল কোএনজাইম-এ, বিটা-কিটো-অ্যাসাইল কোএনজাইম-এতে পরিণত হয়।

চতুর্থ এবং শেষ বিক্রিয়ায় বিটা-কিটো অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ থায়োলেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে বিটা-কিটো-অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ এবং অপর একটি কোএনজাইম-এ এর বিক্রিয়ায় অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ এবং ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ (এতে দুটি কার্বন পরমাণু কম থাকে) তৈরি হয়। এ ফ্যাটি অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ বিটা-অক্সিডেশনের দ্বিতীয় আবর্তে প্রবেশ করে এবং অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে জারিত হয়ে ১২ অণু ATP তৈরি করে।

দীর্ঘ-শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণে প্রচুর ATP তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, পামিটিক অ্যাসিডের [$H_3C(CH_2)_{14}COOH$] কথাই ধরা যাক। পামিটিক অ্যাসিড বিটা-অক্সিডেশন চক্রে ৭ বার আবর্তিত হয়ে ৮ অণু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ তৈরি করে। সাত বার আবর্তনের ফলে ৭ অণু $FADH_2$ এবং ৭ অণু $NADH+H^+$ তৈরি হয়। এক অণু পামিটিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণে ATP এর পরিমাণ দাঁড়ায়-

১ অণু অ্যাসিটাইল কোনএনজাইম-এ ক্রেবস্ চক্রের মাধ্যমে জারিত হয়ে ১২ অণু ATP তৈরি করে, সুতরাং ৮ অণু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-এ ৮ ×১২ = ৯৬ অণু ATP তৈরি করে।

৭ অণু $FADH_2$ = ৭ ×২ = ১৪ অণু ATP

৭ অণু $NADH+H^+$ = ৭×৩= ২১ অণু ATP

মোট ATP = ১৩১

কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিডের সক্রিয়ণের সময় ১ অণু ATP ব্যবহৃত হয়। তাই ১ অণু পামিটিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণে ১৩০ অণু ATP তৈরি হয়। এক অণু ATP তে প্রায় ১২ কিলোক্যালরি শক্তি থাকে। অতএব ১৩০ অণু ATP থেকে ১৩০ ×১২ = ১৫৬০ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

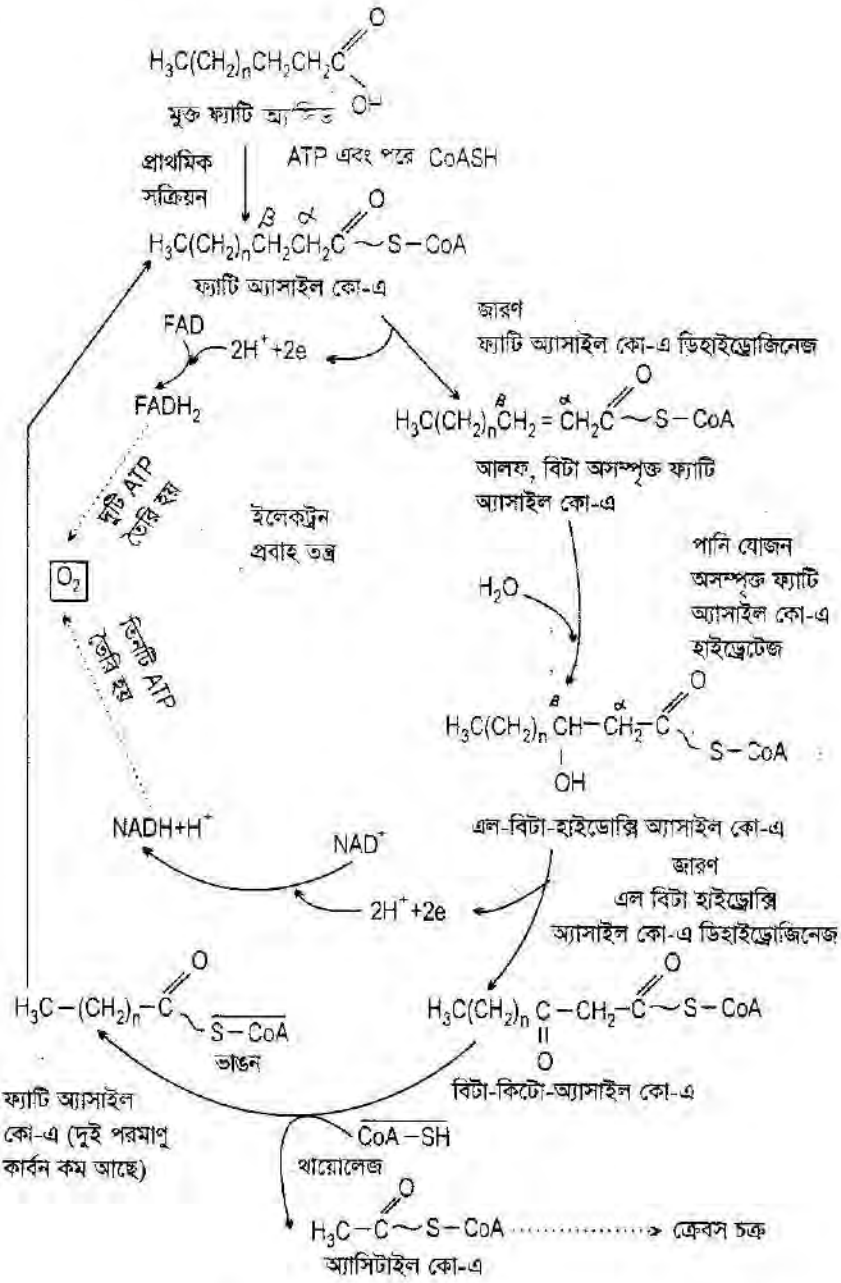

চিত্র ২.৭ : ফ্যাটি অ্যাসিডের বিটা-অক্সিডেশন চক্র

এক অণু পামিটিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণে ২৩৪০ কিলোক্যালরি শক্তি মুক্ত হয়। তাই ATP এর শক্তি ধারণ ক্ষমতার যোগ্যতা (efficiency)--

$$= \frac{১৫৬০}{২৩৪০} \times ১০০ = ৬৬.৬৭\%।$$

২. **ফসফোলিপিড** : গ্লিসারলের সাথে দুই অণু ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এক অণু ফসফোরিক অ্যাসিডের ইস্টারকে ফসফোলিপিড বলে। ফসফোটিডিক অ্যাসিড একটি সরলতম ফসফোলিপিডের উদাহরণ। তবে ফসফাটিডিক অ্যাসিড উদ্ভিদে জমা থাকে না, এটি অন্যান্য ফসফোলিপিড সংশ্লেষণের মধ্যবর্তী বস্তু হিসেবে কাজ করে।

ফসফাটিডিক অ্যাসিডের ফসফেটের সাথে কোলাইন [choline, $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}N^+(CH_3)_3$] যুক্ত হলে লেসিথিন (lecithin), ইথানলঅ্যামাইন (ethanolamine, $HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2$) যুক্ত হলে সেফালিন (cephaline). আরেকটি গ্লিসারল যুক্ত হলে ফসফাটিডাইল গ্লিসারল (phosphatidyl glycerol) এবং ইনোসিটল (inositol) যুক্ত হলে ফসফাটিডাইল ইনোসিটল উৎপন্ন হয়।

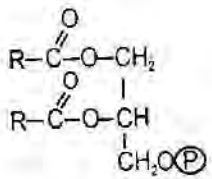

ফসফাটিডিক অ্যাসিড

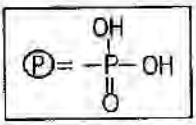

লেসিথিনের সংশ্লেষণ

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, লেসিথিনের দুটি অংশ–কোলাইন ফসফেট এবং আলফা, বিটা–ডাইগ্লিসারাইড। প্রথম বিক্রিয়ায় কোলাইন ATP এর সাথে মিলিত হয়ে কোলাইন-ফসফেট তৈরি করে। পরের বিক্রিয়ায় কোলাইন-ফসফেট CTP (সাইটিডিন ট্রাইফসফেট) এর সাথে যুক্ত হয়ে CDP কোলাইন এবং পাইরোফসফেট তৈরি হয়। পরিশেষে CDP-কোলাইন আলফা, বিটা-ডাইগ্লিসারাইডের সাথে মিলিত হয়ে লেসিথিন তৈরি হয় এবং CMP (সাইটিডিন মনোফসফেট) পৃথক হয়ে যায় (চিত্র ১২.৮)।

৩. **মোম** : মোমের অণুর গঠনও স্নেহপদার্থের প্রায় অনুরূপ। তবে এর অণুতে গ্লিসারলের পরিবর্তে ২৪ থেকে ৩৬ কার্বন শৃঙ্খলযুক্ত এবং একটি হাইড্রোক্সাইল গ্রুপযুক্ত অ্যালকোহল থাকে এবং এর সাথে এক অণু ফ্যাটি অ্যাসিড ইস্টার বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে। মোম পানিতে অদ্রবণীয় এবং এতে দ্বিবন্ধনী না থাকায় রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরে প্রাপ্ত কিউটিন এবং সুবেরিন নামীয় জটিল দ্রব্য গঠনে মোমের অণু অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

একটি মোমের অণু

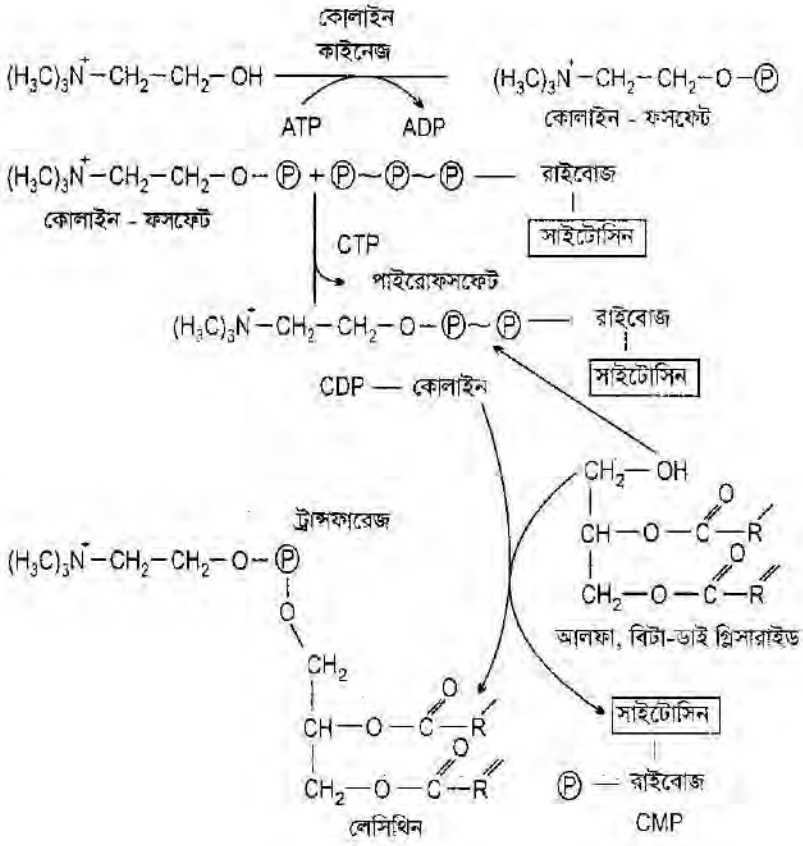

চিত্র ২.৮ : লেসিথিনের সংশ্লেষণ

মোমের বিপাক সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা সম্ভব হয়েছে। পাতা এবং কাণ্ডের ত্বকে মোম একটি আবরণ সৃষ্টি করে (একে কিউটিকল বলে), এর জন্য প্রস্বেদনের হার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. গ্লাইকোলিপিড

যে লিপিডে গ্লিসারলের আলফা-অবস্থানের হাইড্রোক্সাইল গ্রুপের সাথে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দ্বারা একটি শর্করা (বিশেষ করে গ্যালাকটোজ অথবা গ্লুকোজ) যুক্ত থাকে তাকে গ্লাইকোলিপিড বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের ঝিল্লিতে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোলিপিড থাকে (চিত্র ২.১০)।

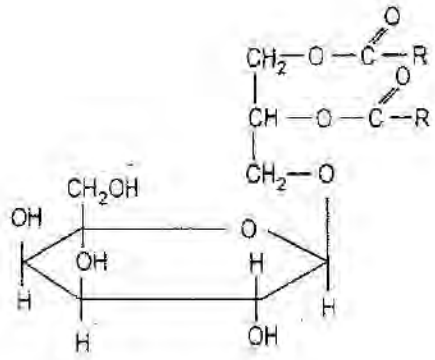

চিত্র ২.৯ : একটি গ্লাইকোলিপিডের অণু

৫. টারপেনয়েড লিপিড (টারপেনয়েড)

স্টেরয়েড, ক্যারোটিনয়েড, উদ্বায়ী তেল এবং রাবারসহ কতকগুলো যৌগিক পদার্থের সাধারণ ধর্ম লিপিডের মতোই। এজাতীয় অধিকাংশ পদার্থের কার্যাবলি এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত এবং কিছু কিছু আবার বিপাকীয় উপজাত দ্রব্য হিসেবে উদ্ভূত হয়। আইসোপ্রেন এককের (C_5H_8) পলিমার দ্বারা অধিকাংশ পদার্থ গঠিত বলে এটি আইসোপ্রেনয়েড যৌগ নামেও পরিচিত।

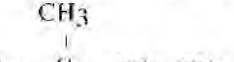

আইসোপ্রেন একক

স্টেরয়েডের জৈব-সংশ্লেষণে মেভালোনিক (mevalonic) অ্যাসিড একটি অত্যাবশ্যক মধ্যবর্তী পদার্থ, এটি অবিষ্কারের পর থেকে, টারপেনয়েড –এর জৈব সংশ্লেষণে এর ভূমিকা এবং সেই সাথে উদ্ভূত আইসোপেনটেনাইল (isopentenyl) পাইরোফসফেট এবং ৩,৩- ডাইমিথাইল-অ্যালাইল (dimethylallyl) পাইরোফসফেটের ভূমিকা দ্রুত উদঘাটন করা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, আইসোপেনটেনাইল পাইরোফসফেট এবং ৩,৩-ডাইমিথাইল-অ্যালাইল পাইরোফসফেট যুক্ত হয়ে জেরানাইল পাইরোফসফেট তৈরি করে এবং এরপর পর্যায়ক্রমে ফারনেসাইল পাইরোফসফেট এবং জেরানাইল জেরানাইল পাইরোফসফেট তৈরি হয় এবং পরিশেষে এ থেকে বিভিন্ন প্রকার টারপেনয়েড তৈরি হয়।

কার্বনের সংখ্যা অনুসারে টারপেনয়েড যৌগকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- হেমিটারপিন ($C_5 = 1 \times C_5$), মনোটারপিন ($C_{10} = 2 \times C_5$), সেসকুইটারপিন ($C_{15} = 3 \times C_5$), ডাইটারপিন ($C_{20} = 4 \times C_5$), সেসটারপিন ($C_{25} = 5 \times C_5$) এবং ট্রাইটারপিন ($C_{30} = 6 \times C_5$)। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতিতেই টারপেনয়েড পাওয়া যায়। সব সবুজ উদ্ভিদের মেভালোনেট পথের মাধ্যমে সরলরৈখিক আইসোপ্রিনয়েড তৈরি করার ক্ষমতা আছে। তবে, যেসব

আইসোপ্রিনয়েডে পাঁচের অধিক আইসোপ্রিন একক থাকে (যেমন–স্টেরয়েড), তা সাধারণত সব উদ্ভিদ প্রজাতিতেই পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম জটিল আইসোপ্রিনয়েড (C_5 এবং C_{25} মধ্যে) প্রধানত ট্রাকিওফাইটার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও ব্রায়োফাইট এবং ছত্রাকে ব্যাপকভাবে সেসকুইটারপেন এবং কতকগুলো ছত্রাকে কতিপয় মনোটারপিন থাকে।

টারপেনয়েড লিপিডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো—

স্টেরয়েড (Steroid) : প্রাণরাসায়নিকভাবে টারপেনয়েড লিপিডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি হলো স্টেরয়েড এবং এটি ট্রাইটারপিন বা ট্রাইটারপেনয়েড। ট্রাইটারপিন প্রাকৃতিক দ্রব্যের ৩০টি কার্বন পরমাণু আছে এবং এটি ৬টি আইসোপ্রেন একক থেকে উদ্ভূত। তবে এই সংজ্ঞা সবসময় কঠোরভাবে মেনে চলে না ; ৬টি আইসোপ্রেন থেকে উদ্ভূত ৩০টি কম পরমাণুর যৌগকেও স্টেরয়েডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্টেরয়েড নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে :

ক. স্টেরল (sterols) : স্টেরল হলো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল এবং কক্ষ তাপমাত্রায় স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। উদ্ভিদে যে স্টেরল পাওয়া যায় তাতে পারহাইড্রো-১,২-সাইক্লোপেনটানোফেনথ্রিন বলয়ের সাথে তিনটি ৬-সদস্য বলয় এবং একটি ৫-সদস্য বলয় থাকে। হাইড্রোকার্বন কাঠামোর ৩-কার্বন অবস্থানে একটি সেকেন্ডারি হাইড্রক্সি গ্রুপ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০-কার্বন এবং ১৩-কার্বন অবস্থানে অ্যাংগুলার মিথাইল গ্রুপ এবং সাধারণত ১৭-কার্বন অবস্থানে একটি ৮ থেকে ১০ কার্বনের শৃঙ্খল থাকে।

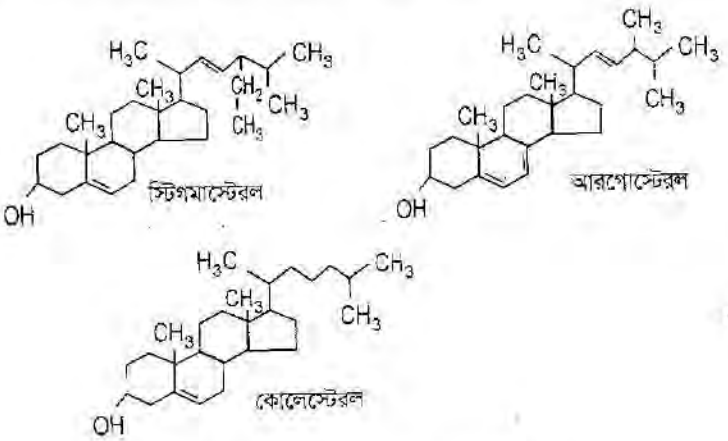

চিত্র ২.১০ : কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্টেরলের গঠন

উদ্ভিদে যে বিভিন্ন প্রকার স্টেরল আছে, তাদের ১৭-কার্বনের পার্শ্ব-শৃঙ্খলে কার্বনের সংখ্যা, বলয় সিস্টেম ও পার্শ্ব-শৃঙ্খলে অসম্পৃক্ততার মাত্রা ও অবস্থান, ৩-কার্বন ও ৪-কার্বন অবস্থানে প্রতিস্থাপন এবং অপ্রতিসম কেন্দ্রে স্টেরিও-রসায়নের ভিন্নতা আছে।

অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে স্টেরল পৃথক করা হয়েছে এবং সম্ভবত সব গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদেই এটি পাওয়া যায়। ছত্রাকে যে স্টেরল পাওয়া যায় তা হলো আরগোস্টেরল (ergosterol)। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ থেকে যেসব স্টেরল পৃথক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলো সিটোস্টেরল (sitosterol), স্টিগমাস্টেরল (stigmasterol) এবং ক্যামপেস্টেরল (campesterol)। অনেকদিন ধরে মনে করা হতো যে, কোলেস্টেরল (cholesterol) কেবল প্রাণীতেই পাওয়া যায়। কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে হলেও অনেক উদ্ভিদ কলায় এটি পাওয়া যায়; *Solanum* এবং *Nicotiana* তে এটি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সব রকমের কলা, যেমন- পাতা, মূল, কাণ্ড, বীজপত্র, ফুল, পরাগরেণু, ফল এবং বীজে স্টেরল পাওয়া যায়।

স্টেরল কমপক্ষে দুটি শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদন করে অন্যান্য স্টেরয়েড তৈরির অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে এবং ঝিল্লির উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটি অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হয় যে, স্টেরল নিজেই হরমোনের মতো কাজ করে, তবে এটি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রোজেসটাজেন (progestagen), ইস্ট্রোজেন (estrogen) এবং অ্যান্ড্রোজেন (androgens), এদের হরমোনীয় গুণাবলি আছে, তৈরির অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে স্টেরল কাজ করে। উদ্ভিদে অধিকাংশ স্টেরল পাওয়া যায় কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গ ও কোষ-ঝিল্লিতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, স্টেরলের সাথে ফসফোলিপিডের ক্রিয়ার ফলে ঝিল্লির সুস্থিরতা আসে এবং তাই ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ. স্টেরাইল ইস্টার (Steryl ester) : সম্ভবত সব উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদেই এটি পাওয়া যায়। পাতা, মূল, স্ফীতকন্দ এবং বীজে এবং কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গ, যেমন- নিউক্লিয়াস, ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকনড্রিয়া এবং মাইক্রোজোমে স্টেরাইল ইস্টার থাকে।

গ. একডিস্টেরয়েড (Ecdysteroid) : এটি একপ্রকার টারপেনয়েড যা উদ্ভিদে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। অধিকাংশ স্টেরয়েড অমেরুদেশীয় (apolar), কিন্তু এটি মেরুদেশীয়। এই প্রকার স্টেরয়েডকে একডিসোন বা মোলটিং হরমোন বলা হয়, কারণ আলফা-একডিসোন এবং একডিস্টোরোন প্রথম পতঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং এটি পতঙ্গের খোলস বদলানোকে প্ররোচিত করে। তবে উদ্ভিদ থেকে এই স্টেরয়েডটি পৃথক করার পরও পূর্বের নামই রাখা হয়েছে, যদিও উদ্ভিদে এটি এ জাতীয় কোনো কার্য সম্পাদন করে না। তাই এজাতীয় যৌগের উপযুক্ত নাম হলো একডিস্টেরয়েড। এটি পলিহাইড্রোক্সিলেটেড যৌগ এবং এতে ২৭ থেকে ২৯টি কার্বন পরমাণু আছে।

যদিও উদ্ভিদে এর কার্যাবলী সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছে, তবে কোনটিই সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদে এটি থাকায় পতঙ্গ উদ্ভিদ থেকে দূরে থাকে এবং পতঙ্গ উদ্ভিদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ; কিন্তু আলফা-একডিসোন এবং একডিস্টেরন পতঙ্গ খেলে পতঙ্গের উপর খুব সামান্য কিংবা কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে।

সম্ভবত এটি জিন পর্যায়ে কাজ করে, একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে কাজ করে পতঙ্গের রূপান্তরকে (Metamorphosis) নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, এটি উদ্ভিদের রূপান্তরণেও অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে এটি উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি অথবা পুষ্পায়নে গুণগত অথবা পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটায় এমন কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ঘ. প্রোজেসটাজেন (Progestagen) : এটি হলে এক প্রকার স্টেরয়েড যাতে ২১টি কার্বন পরমাণু আছে এবং অনেক উদ্ভিদ থেকে এটি পৃথক করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রেগনিনোলোন (pregnenolone) এবং প্রোজেসটেরোন (progesterone) সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ; এর আংশিক কারণ হলো এগুলো প্রাণী হরমোন, এছাড়াও উদ্ভিদে পাওয়া যায় কারডেনোলাইডস এবং এর সম্পর্কিত যৌগের সংশ্লেষণের অগ্রবর্তী পদার্থ।

ঙ. **করটিকোস্টেরয়েড** (Corticosteroid) : এটি হলো ২১-কার্বনবিশিষ্ট স্টেরয়েড এবং প্রাণীর খুবই গুরুত্বপূর্ন স্টেরয়েড অ্যাডরেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স প্রোজেসটেরন থেকে এটি সংশ্লেষিত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এটি দুভাবে কাজ করে :(১) গ্লুকোকরটিকয়ডস হিসেবে শর্করার বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং (২) মিনেরালোকরটিকয়ডস হিসেবে সোডিয়াম-পটাশিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদে করটিকোস্টোরয়েড পাওয়া যায়নি, তবে উদ্ভিদ থেকে এটি পৃথক করার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। বাহাদুর এবং শ্রীবাস্তব (Bahadur and Srivastava. 1971) ধানের তুষের তেল থেকে এক প্রকার যৌগ পৃথক করেন যা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফির মাধ্যমে ১১-ডেসঅক্সিকরটিকোসটেরোন বলে বিবেচিত হয়। করটিকো স্টেরয়েডস, করটিসোন এবং করটিসল, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও মূলের বিকাশকে উদ্দীপিত করে, তবে ডেসঅক্সিকরটিকোসটেরোন, একমাত্র উদ্ভিদ করটিকোস্টেরয়েড, নিষ্ক্রিয়।

চ. **ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন** (Estrogens and Androgen) : এগুলো হলো ১৮-কার্বন এবং ১৯-কার্বন স্টেরয়েডস যা স্তন্যপায়ী প্রাণীতে হরমোনের কাজ করে। এগুলো উদ্ভিদে আছে কি নেই এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকদিন ধরে বিতর্ক চলেছে। এমন কি এখনও সর্বসম্মতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বুটেনানড এবং জেকোবি (Butenandt and Jacobi) দাবি করেন যে, উদ্ভিদ থেকে স্ফটিকাকার এক প্রকার যৌগ পৃথক করতে তাঁরা সক্ষম হন যাদের ইস্ট্রোজেনিক ক্রিয়া আছে। উইলোর স্ত্রীপুষ্প থেকে ইস্ট্রোজেনের মতো পদার্থ পৃথক করা হয়েছে। উদ্ভিদ থেকে অ্যান্ড্রোজেন পৃথক করার কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায় নি, কিন্তু পাইন গাছে টেস্টোটেরোন এবং অ্যান্ড্রোস্টেনিডায়োন পাওয়া গেছে।

উদ্ভিদ হরমোন হিসেবে এর সম্ভাব্য অংশগ্রহণের জন্য ইস্ট্রোজেন সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপিত হয়। উদ্ভিদে বহিঃস্থভাবে ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন প্রয়োগে অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং যৌনতার প্রকাশসহ পুষ্পায়ন প্রভাবিত হয়।

ছ. **কারডেনোলাইড** (Cardenolide) : এটি হলো ২৩- কার্বন স্টেরয়েড এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো একটি ১৪, বিটা-হাইড্রোক্সাইল এবং একটি আলফা, বিটা-অসম্পৃক্ত ল্যাকটোন বলয় এতে আছে। গ্লাইকোসাইড হিসেবে প্রায় ১২টি উদ্ভিদ গোত্রে কারডেনোলাইড উপস্থিত। *Digitalis* থেকে প্রাপ্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারডেনোলাইড হলো ডিজিটক্সিজেনিন, ডিজোক্সিজেনিন এবং জিটক্সিজেনিন। উদ্ভিদের সব কলাতেই এটি থাকে। অধিকাংশ কারডেনোলাইডস বিষাক্ত এবং প্রাচীনকালে তীরের বিষ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতো। উদ্ভিদের রক্ষাকারী পদার্থ হিসেবে এটি কাজ করে। বর্তমানে এটি হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

জ. **স্যাপোজেনিন** (Sapogenin) : এটি ২৭- কার্বন স্টেরয়েড এবং কতকগুলো একবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন- Liliaceae, Amarilidaceae এবং Diomcoraceae এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ Scrufilariaceae এবং Solanaceaeতে এটি বিস্তৃত। উদ্ভিদে স্যাপোজেনিন চিনির সাথে মিলিত হয়ে স্যাপোনিন তৈরি করে। সাধারণত চিনি হলো শাখান্বিত শৃঙ্খল এবং স্টেরয়েডের ৩-কার্বন অংশে লেগে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্টেরয়েডীয় হরমোন প্রস্তুতে স্যাপোজেনিন ব্যবহৃত হয়। কোলেস্টেরল এবং সিটোস্টেরল স্যাপোনিন সংশ্লেষণের অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে কাজ করে।

উদ্বায়ী তেল (Volatile Oil)

রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে প্রকৃত ফ্যাট এবং তেল থেকে উদ্বায়ী তেল পৃথক তবে ভৌত ধর্মাবলিতে এদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রায় ৬০টি গোত্রের ২,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ উদ্বায়ী তেল উৎপন্ন করে। উল্লেখযোগ্য গোত্রগুলো হলো Pinaceae, Lauraceae, Rutaceae, Myrtaceae, Umbelliferae, Lariatae, Compositae. সাধারণত পাতা ও কাণ্ডের গ্ল্যান্ডিউলার কোষ বা রোমে এই তেল উৎপন্ন হয়। *Prunus*-এর বিভিন্ন প্রজাতির রেজিন নালিকার পার্শ্ববর্তী কোষগুলোতে অলিওরেজিন, এক প্রকার উদ্বায়ী তেল যা থেকে টার্পেনটিন উদ্ভূত ও সংশ্লেষিত হয়।

উদ্বায়ী তেলে ৫০০ এরও অধিক সংখ্যক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক যৌগ পৃথক করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে মনোটারপিন (C_{10}), সেসকুইটার্পিন (C_{15}), ডাইটারপিন (C_{20}), সেসটারটার্পিন (C_{25})ও ট্রাইটারপিন (C_{30})এবং উচ্চ টারপিন থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার যৌগ এবং কিছু নন-টারপিন্স যৌগ। এই নন-টারপিনের মধ্যে আছে- Cruciferae গোত্রের অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট (C_3H_5CNS), বিভিন্ন প্রকার জৈব সালফাইড, মারক্যাপটান, ইন্ডোল, অ্যানথ্রানিলিক অ্যাসিড ইস্টার এবং এছাড়াও স্বাভাবিক হাইড্রোকার্বন, যেমন- এন হেপটেন। পরিমাণগতভাবে উদ্বায়ী তেলে নিম্ন টারপিন বেশি থাকে।

বিভিন্ন প্রকার আইসোপ্রেন একক, যাদের আণবিক সংকেত ($C_{10}H_{16}$ মনোটারপিন), $C_{15}H_{24}$ (সেসকুইটারপিন), $C_{20}H_{32}$ (ডাইটারপিন) অথবা $C_{30}H_{48}$(ট্রাইটারপিন) থেকে টারপিন অণু তৈরি হয়। টারপিনে আইসোপ্রেন এককগুলো সরল শৃঙ্খল কিংবা এক বা একাধিক বলয় আকারে সংযুক্ত থাকতে পারে। কতিপয় গ্রুপের জারণ কিংবা বিজারণের ফলে এর গঠনের আরো রূপান্তর হতে পারে।

খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ, ওষুধ ও প্রসাধনী শিল্পে উদ্বায়ী তেলে যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু উদ্ভিদে এটি কি কাজে লাগে তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। এটিকে বিপাকীয় পথের সর্বশেষ উৎপাদিত বস্তু হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অনেক উদ্ভিদজাত দ্রব্যের স্বাভাবিক সুগন্ধিকরণের জন্য এটি দায়ী। উদ্ভিদ থেকে বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বায়ী তেল বের হয়ে যায়, যেমন মিন্টের গন্ধ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনো কোনো ফলের উদ্বায়ী তেল পোকা-মাকড়কে দূরে রাখে। ফুলে যে উদ্বায়ী তেল থাকে, তা পরাগায়নের জন্য পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

ক্যারোটিনয়েড : এই গ্রন্থটির ১ম খন্ডের একাদশ অধ্যায়ে (সালোকসংশ্লেষণ) ক্যারোটিনয়ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রাবার

রাবার সব উদ্ভিদে থাকে না। রাবার-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ যেসব গোত্রে পাওয়া যায়, তা হলো Moraceae, Aposinaceae, Euporbiaceae, Asclepiadaceae, এবং Compositae. দুই হাজারেরও অধিক উদ্ভিদ প্রজাতিতে রাবার পাওয়া যায়, কিন্তু ৬০০ এরও কম সংখ্যক প্রজাতিকে রাবার-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক প্রজাতি প্রকৃত রাবারের উৎস হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক রাবারের (প্যারারাবার) প্রধান উৎস হলো *Hevea brasiliensis*। অল্প পরিমাণে রাবার পাওয়া যায় অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে। যেমন- *Castilla elastic* থেকে পানামা রাবার, *Manihot glaziovii* থেকে সিরা (ceara) রাবার, *Funtumia elastica* থেকে আসাম বা ভারতীয় রাবার, *Landolphia heudelotii* থেকে ল্যান্ডেলফিয়া রাবার এবং *Parthenium argentatum* থেকে গোয়াইউল (guayule) রাবার পাওয়া যায়।

রাসায়নিকভাবে প্রকৃত রাবার হলো একটি হাইড্রোকার্বন পলিমার এবং উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট সিস–১,৪–পলিআইসোপ্রেন [$(C_5H_8)n$] একক দ্বারা গঠিত। ৫০০ থেকে ৫,০০০টি আইসোপ্রেন একক এতে থাকতে পারে। গাটা পার্চা, যা প্রধানত *Palaquim gutta* গাছ থেকে পাওয়া যায়, হলো রাবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন আণবিক ওজনবিশিষ্ট ট্রান্স – ১,৪– পলিআইসোপ্রেন। অপরদিকে, একই রকম কিন্তু অধিকতর রেজিনযুক্ত ব্যালাটা (balata) পাওয়া যায় *Mimusopa balata* গাছ থেকে। চিকেল *Chicle* হলো নিম্ন আণবিক ওজনবিশিষ্ট সিস– এবং ট্রান্স–পলিআইসোপ্রেনের একটি মিশ্রণ, এই দুপ্রকার পলিআইসোপ্রেনের অনুপাত প্রায় ১ ঃ ২ এবং এছাড়াও অ্যাসিটোনে দ্রবণীয় রেজিন এতে থাকে এবং *Achras sapota* গাছ থেকে এটি পাওয়া যায়।

রাবার

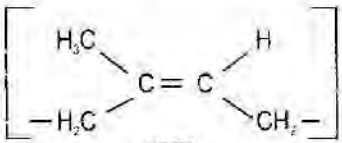

গাটা পার্চা

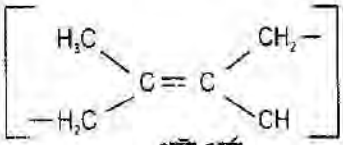

যদিও গাটা এবং প্রকৃত রাবারের রাসায়নিক সংকেত একই রকমের, তবে এদের ভৌত ধর্মের পার্থক্য আছে। প্রকৃত রাবারে ৫০০ থেকে ৫,০০০টি পলিআইসোপ্রেন একক আছে, কিন্তু গাটা পার্চায় আছে মাত্র ১০০টি। সাধারণ তাপমাত্রায় গাটা পার্চা প্লাস্টিকের মতো শক্ত কিন্তু প্রকৃত রাবার স্থিতিস্থাপক পদার্থ। গাটা পার্চা অতিক্ষুদ্র স্ফটিকাকার গঠনসম্পন্ন, কিন্তু প্রকৃত রাবার অদানাদার (Amorphous) এবং প্রসারিত করলে স্ফটিকাকার হয়। তবে রাবারকে ১৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখলে স্ফটিকাকার এবং শক্ত হয়। অপরদিকে, ৭০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গাটা পার্চা অদানাদার এবং রাবারের মতো স্থিতিস্থাপক হয়।

একটি তরল সিরাম অথবা জলবৎ দশায় আণুবীক্ষণিক কণা হিসেবে রাবার থাকে। এই তরল পদার্থ দুধের মতো এবং একে তরুক্ষীর (latex) বলে। এটি জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম এবং একটি বিশেষ ধরণের কলায় (ল্যাটিসেফেরাস নালিকা) থাকে। যে সমস্ত উদ্ভিদে তরুক্ষীর আছে, কিন্তু কোনো পলিআইসোপ্রেন থাকে না, সে ক্ষেত্রে বিস্তার মাধ্যমে (dispersion phase) সাধারণত অন্যান্য আইসোপ্রেনয়েড পদার্থ, যেমন– উদ্বায়ী তেল অথবা রেজিন থাকে। স্বাভাবিক প্রোটোপ্লাজমীয় উপাদান (মাইটোকনড্রিয়া, আন্তপ্লাজমীয় জালি, রাইবোজোম, নিউক্লিয়াস) এবং কলয়েডীয় কণা ছাড়াও *Hevea* তরুক্ষীরে আরো দুপ্রকারের কণা থাকে – লিউটোইডস (lutoids) এবং ফ্রে–উইসলিং (Frey-Wyssling) কণা। তরুক্ষীরের আয়তনের ১০ থেকে ২০% লিউটোইডস এবং ৩০ থেকে ৪৫% রাবার কণা দখল করে। কোনো উদ্ভিদে তরুক্ষীরের উপস্থিতি রাবারের উপস্থিতিকে সুনিশ্চিত করে না, কেননা Euphorbiaceae এবং Compositae গোত্রের অনেক নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদে রাবারের পরিবর্তে ট্রাইটারপেনল ইস্টার থাকে। তরুক্ষীরের দুগ্ধবৎ বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে সিরামে অবদ্রবের উপস্থিতির জন্য, রাবারের জন্য নয়। রাবার এবং পানি ছাড়াও, তরুক্ষীরে অন্যান্য যৌগ, যেমন– অ্যামাইনো অ্যাসিড, এনজাইম, লিপিড, খনিজ লবণ, প্রোটিন, রেজিন, চিনি এবং টারপিন উদ্ভূত যৌগ থাকে। উদ্ভিদের বয়স এবং বৃদ্ধির পরিবেশের উপরে তরুক্ষীরের গঠন নির্ভর করে।

H. brasiliensis এ প্রধানত বাকলে তৈরি হয় এবং জমা থাকে। গাছের গুঁড়ি, শাখা-প্রশাখা এবং মূলের গৌণ ফ্লোয়েমের সিভ নলের সাথে তরুক্ষীর ভেসেল সংযুক্ত থাকে। ল্যাটিসিফেরাস

BANSDOC Dhaka

কলা পাতা, ফুল ও ফলেও থাকতে পারে। তরুক্ষীর ভেসেল ছিদ্র করলে ভেসেল বরাবর একটি হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপের গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয় এবং বাকলের কাটা অংশ দিয়ে তরুক্ষীর গাছ থেকে বের হয়ে আসে। এভাবে পরস্পর সংযুক্ত তরুক্ষীর তন্ত্রের মাধ্যমে রাবার গাছের দূরবর্তী অংশ থেকে তরুক্ষীর সংগ্রহ করা যায়। পরিশেষে তরুক্ষীরের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ভেসেলে রসস্ফীতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই তরুক্ষীরে রাবার প্রারম্ভিক মাত্রায় ফিরে আসে। জমাটবাধা প্রক্রিয়ায় (coagulation) তরুক্ষীর থেকে রাবার পৃথক করা যায়। প্রতিটি রাবার কণার চারপাশে প্রোটিনের যে পাতলা আবরণ থাকে (এটি অবদ্রব অবস্থায় রাবার কণাকে সুস্থিরতা প্রদান করে) তা জমাট বাধার সময় নষ্ট হয়ে যায়। প্রোটিনের এই আবরণকে যদি অ্যাসিড, ক্ষার অথবা এমন কি তাপ দ্বারা নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলেও রাবার কণাগুলো খণ্ড খণ্ড কঠিন বস্তুতে পরিণত হয় এবং তরুক্ষীর থেকে পৃথক করা যেতে পারে।

রাবার সংশ্লেষণের প্রাথমিক বস্তু অ্যাসিটেট বলেই প্রতীয়মান হয় এবং এটি মেভালোনিক অ্যাসিডে এবং পরে আইসোপেনটেনাইল পাইরো ফসফেটে পরিণত হয়। এরপর বিভিন্ন প্রকার রূপান্তরের মাধ্যমে আইসোপেন্টেনাইল থেকে রাবারের সংশ্লেষণ হয়।

উদ্ভিদের শারীরতত্ত্বে রাবার কি কাজ করে তা এখনও অজ্ঞাত। ধারণা করা হয়েছে যে, রাবার সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এটি সন্দেহাতীত নয়। কেননা একবার রাবার জমা হলে পীড়নের সময়েও তা ব্যবহৃত হয় না। উপরন্তু, উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে রাবার ভাঙনের কোনো এনজাইম পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় যে, কোষীয় বিপাকের অ-কার্যকর উপজাত দ্রব্য হলো রাবার।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্রবের স্থানান্তর

উদ্ভিদের এক অংশ থেকে অন্য অংশে অজৈব ও জৈব দ্রবের চলাচলকে দ্রবের স্থানান্তর বলে এবং এই স্থানান্তর না হলে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ভালোভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না। উদ্ভিদের মূল কর্তৃক পরিশোষিত পানি ও খনিজ মৌল কাণ্ড এবং পাতায় স্থানান্তরিত হয়। কতগুলো হরমোন উদ্ভিদের একটি নির্দিষ্ট অংশে সংশ্লেষিত হয় এবং অন্যান্য অংশে এগুলোর স্থানান্তরের প্রয়োজন। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতায় শর্করা তৈরি হয়। কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে এর স্থানান্তর হয়। বীজ ও ফলের বৃদ্ধির জন্যও এই শর্করার প্রয়োজন। এসব অঙ্গ ও অন্যান্য সঞ্চয়ী কোষে (যেমন–স্ফীতকন্দ) সঞ্চয়ের জন্য এই শর্করার স্থানান্তর দরকার। আবার উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময় সঞ্চিত খাদ্য বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। বীজপত্রে কিংবা সস্যে সংরক্ষিত খাদ্য বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূলের অগ্রভাগে যথাক্রমে ঊর্ধ্বে ও নিচে ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদের দেহের মধ্য দিয়ে শর্করার স্থানান্তর অবিরামভাবে ঊর্ধ্বে, নিচে ও আড়াআড়িভাবে সংঘটিত হয়, আর সিভ নলের (sieve tube) মধ্য দিয়ে শর্করার স্থানান্তরই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

উদ্ভিদে দ্রবের স্থানান্তরের বিষয়টি অনেকদিন আগেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিষয়ে একটি প্রাথমিক পরীক্ষা পরিচালিত করেন ইতালীয় চিকিৎসক মার্সেলাস ম্যালফিজি (Marcellus Malphigi) ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি বহুরব্যাপী কতগুলো উদ্ভিদের কাণ্ডের বাকল আংটির মতো করে তুলে ফেলেন (ringing) এবং মন্তব্য করেন যে, জাইলেমের মধ্য দিয়ে পানি ঊর্ধ্বমুখে এবং পাতায় উৎপাদিত খাদ্য কর্টেক্স দিয়ে নিম্নমুখে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু আংটির উপরের অংশ স্ফীত হওয়ার কারণ নির্ণয়ে তিনি ব্যর্থ হন, তবে উল্লেখ করেন যে, উদ্ভিদের সক্রিয় বৃদ্ধির সময় এটি ঘটে।

১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে স্টিফেন হেলিস (Stephen Hales) লক্ষ্য করেন যে, যখন উদ্ভিদের পাতা থাকে তখন বলয়ের উপরের অংশ স্ফীত হয়, পত্রবিহীন উদ্ভিদের এই স্ফীতি দেখা যায় না। পার্শ্ববর্তী কলা থেকে পাতার কলা অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পাওয়ার জন্য এই স্ফীতি হয় বলে তিনি ধারণা করেন।

রিংগিং কৌশল এবং রঞ্জকদ্রব্য ব্যবহার করে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে নাইট (Knight) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে, উদ্ভিদের পাতা কম হলে পাতা ও মূলের মধ্যে বৃদ্ধি হ্রাস পায়। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ভেসেলের মধ্য দিয়ে কোষ-রস পাতায় পৌঁছায় এবং সেখানে বাতাস ও আলোর উপস্থিতিতে জৈব পদার্থ তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে উদ্ভিদের সব অংশে স্থানান্তরিত হয়।

ডুট্রোচেট (Dutrochet) ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে কোষ-রসের স্থানান্তরের শক্তি হিসেবে অন্তঃঅভিস্রবণের প্রস্তাব করেন। ডি ক্যান্ডোল (De Candolle, 1832) বলেন যে, মূলের অগ্রভাগে একটি বিশেষ অঙ্গ মৃত্তিকা থেকে পানি পরিশোষণ করে। হার্টিগ (Hartig, 1958) অনুমান

করেন যে, জৈব দ্রব সিভ নল দিয়ে চলাচল করে, কারণ এই কোষগুলোতে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে সুক্রোজ থাকে। ডি ভ্রিসের (De Vries, 1885) মতানুসারে প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের মাধ্যমে সঞ্চয়ী কলায় কার্বোহাইড্রেটের দ্রুত স্থানান্তর হয়। স্কিমপার (Schimper, 1890) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, পরিবহণ কলাগুচ্ছের প্যারেনকাইমা কোষ হলো দ্রব স্থানান্তরের প্রধান পথ। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে স্ট্রাসবার্গার (Strasburger) লক্ষ্য করেন যে, নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের সংশ্লেষণের স্থান থেকে সিভ নল দিয়ে ব্যবহারের স্থানে পৌঁছায় এবং মজ্জা দিয়ে ব্যাপনের মাধ্যমে পার্শ্বীয় বিস্তার সংঘটিত হয়।

ইয়ার্ট (Ewart, 1903) এর মতানুসারে সিভ নলের রন্ধ্র দিয়ে প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের মাধ্যমে জলীয় পদার্থ সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। আঙুরের পত্রবৃন্তের পরিবহণ কলাগুচ্ছকে কেটে, উষ্ণ তরল পদার্থ দ্বারা পুড়িয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে অথবা ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ডিলিনো (Deleano) পাতা থেকে স্টার্চ স্থানান্তরে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ম্যাংহাম (Mangham, 1917) মত প্রকাশ করেন যে, সিভ নল দিয়েই শর্করার স্থানান্তর হয় এবং ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাসন ও লেউইন (Mason and Lewin) সিভ নল দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত হারে কার্বোহাইড্রেটের স্থানান্তর পর্যবেক্ষণ করেন।

স্যুমেকার (Schumacher, 1930) পাতার সমপার্শ্বীয় পরিবহণ কলাগুচ্ছের একটি বৃহৎ কলাগুচ্ছ রেখে বাকিগুলো সরিয়ে ফেলার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। তিনি দাবি করেন যে, একটি কলাগুচ্ছ রাখলেও পাতা থেকে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ মূল হারের শতকরা ৭৫ ভাগ হারে স্থানান্তরিত হয়। কেন্দ্রীয় কলাগুচ্ছ থেকে জাইলেম বাদ দিলে স্থানান্তরের হার হয় শতকরা ৬৮ ভাগ। ফ্লোয়েম বাদ দিলে (যতটা সম্ভব) এই স্থানান্তরের হার কমে শতকরা ৫ ভাগে দাঁড়ায়।

লিওনার্ড (Leonard, 1938) লেখেন যে, কর্তিত সুগার বিটের পত্রফলক থেকে পত্রবৃন্তে চিনির মেরুদেশে (polar) স্থানান্তর হয়। এঙ্গাগার্ড (Engard, 1939) বলেন যে, সুক্রোজ হলো প্রধান চিনি যা ফ্লোয়েম দিয়ে পরিবাহিত হয়। ওয়েন্ট (Went, 1944) বলেন যে, টমেটো গাছের দ্রবের পরিবহণের হার ১৮° সেলসিয়াসের বেশি এবং ২৬.৫° সেলসিয়াসের কম। উইলিয়াম (William, 1945) বলেন যে সুগার বিটের পাতার মেসোফিল কলায় তৈরি হওয়া রিডিউসিং চিনি পাতার শিরার ফ্লোয়েমে স্থানান্তরিত হয়। ওয়েন্ট এবং এঙ্গেলসবার্গ (Went and Engelsburg, 1946) এ মত পোষণ করেন যে, উচ্চ তাপমাত্রায় পরিবহণের হার কম, কিন্তু হেউইট এবং কার্টিস (Hewitt and Curtis, 1948) এর মতানুসারে উচ্চ তাপমাত্রায় পরিবহণের হার বেড়ে যায়। হাল (Hull, 1952) দাবি করেন যে, টমেটোর কাণ্ডে এবং সুগার বিটের সম্পূর্ণ চারাগাছে শৈত্য প্রদান করলে, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা কন্ট্রোল গাছে প্রায় সমান অথবা বেশি পরিবহণ হয়। উইলেনব্রিঙ্ক (Willenbrink, 1957) বলেন যে, ফ্লোয়েমে দ্রবের পরিবহণ শ্বসনের উপর নির্ভরশীল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফ্লোয়েম দিয়ে জৈব পদার্থ উদ্ভিদের নিচের অংশে স্থানান্তরিত হয়। তুলা গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে ম্যাসন এবং মাস্কেল (Mason and Maskell, 1928) দাবি করেন যে, বাকলে চিনির গ্রেডিয়েন্ট এবং পরিবহণের হারের মধ্যে সম্পর্ক আছে। ইঁরা লক্ষ্য করেন যে, উচ্চ ঘনমাত্রা থেকে নিম্ন ঘনমাত্রার দিকে এই পরিবহণ হয়।

ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে জিগলার (Ziegler) ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিভ নলে চিনির পরিমাণ নির্ণয় করেন এবং বলেন যে, সব প্রজাতিতে সুক্রোজ হলো একমাত্র চিনি। যদিও ফ্লোয়েম কলায় ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজ আছে, তবে ফ্লোয়েম রসের ক্রোমাটোগ্রাফীয় বিশ্লেষণে এদের উপস্থিতি ধরা পড়ে না। যদি ফ্লোয়েম-নিঃসৃত পদার্থকেই ফ্লোয়েম দিয়ে প্রবাহিত প্রকৃত

পদার্থের নমুনা হিসেবে ধরা হয়, তবে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সুক্রোজ পরিবাহিত হয়। কিন্তু হেক্সোজ চিনি পরিবাহিত হয় না। সুক্রোজ এবং অন্যান্য চিনির আর্দ্রবিশ্লেষণে সৃষ্ট ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজ ফ্লোয়েমের অপরিবাহী কোষে জমা থাকে। রাস্পবেরি এবং সয়াবিন নিয়ে গবেষণা করে বারলে (Burley, 1961) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, সিভ নলে যে হেক্সোজ শর্করা দেখা যায় তা সুক্রোজের আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে সৃষ্টি হয়। তবে আখের ফ্লোয়েমে পরিবহণ দিয়ে পরীক্ষার সময় হর্ট (Hartt, 1965) লক্ষ্য করেন যে, ফ্লোয়েম দিয়ে প্রবাহের সময় সুক্রোজ অবিকৃত থাকে।

বিপাকীয় রোধক, যেমন ২,৪-ডাইনাইট্রোফেনল (DNP), আর্সেনাইট, অ্যাজাইড, আয়োডোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, ফ্লুওরাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড কার্বোহাইড্রেটের পরিবহণকে রোধ করে (Ullrich, 1961, Harel and Reinhold, 1966, Kriedemann and Beevers, 1967)। এটি ধারণা করা হয় যে, পাতার মেসোফিল কলায় রোধক স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে কোষ থেকে ফ্লোয়েমে ফটোসিনথেট পরিবহণে বাধা দেয়। এটিও সম্ভব যে গ্রহীতা কোষে পরিবাহিত মেটাবোলাইটের জমাকরণে বিপাকীয় রোধক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। উভয় ক্ষেত্রেই, পরিবহণের হার বিঘ্নিত হয়। সয়াবিন এবং ক্যাস্টর বিন নিয়ে সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, সিভ নলে ও সিভ নল হতে ফটোসিনথেট চলাচলের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় DNP-প্ররোচিত পরিবহণ রোধকের প্রভাব আছে।

স্থানান্তরের পথ

উদ্ভিদের পরিবহণ কলাগুচ্ছ প্রধানত জাইলেম ও ফ্লোয়েম দ্বারা গঠিত। অঙ্গসংস্থানিক এবং শারীরতাত্ত্বিকভাবে এ দুপ্রকার কলা ভিন্নতর। মূল থেকে উদ্ভিদের অগ্রভাগে পানি পরিবহণের পথ হিসেবে জাইলেম ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করছে। কিন্তু কোনো ধরনের কলার মধ্য দিয়ে দ্রবের স্থানান্তর হয়। দ্রব স্থানান্তরের সাথে কি শুধু জাইলেম কিংবা শুধু ফ্লোয়েম জড়িত, নাকি জাইলেম ও ফ্লোয়েমের উভয়েই জড়িত। বর্তমানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে দ্রব স্থানান্তরিত হয়। নিম্নলিখিত প্রমাণ এর স্বপক্ষে উপস্থাপিত করা যেতে পারে —

১. ছেদনকৃত বাকল থেকে নির্গত পদার্থ : অনেক পর্ণমোচী উদ্ভিদের বাকল ছেদন করলে (বিশেষ করে গ্রীষ্মের শেষে অথবা শরতের প্রারম্ভে) একপ্রকার তরল পদার্থ বের হয় যাতে উচ্চ ঘনমাত্রার শর্করা থাকে। ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সিভ নল থেকে ঐ তরল পদার্থ নির্গত হয়।

(ক) (খ)

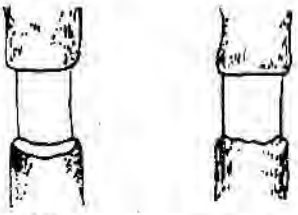

চিত্র ৩.১ : ক. সবেমাত্র আংটির মতো করে বাকল কেটে ফেলা হয়েছে ; খ. কয়েকদিন পর

২. রিংগিং (Ringing) অথবা গার্ডলিং (Girdling) এর প্রভাব : কোনো উদ্ভিদের কাণ্ড কিংবা শাখার চারদিকে জাইলেম (কাষ্ঠল অংশ) পর্যন্ত গভীর করে আংটির মতো গোলাকার অর্ধ ইঞ্চি

পরিমাণ বাকল তুলে ফেলে দিলে কাণ্ড বা শাখার এ অংশে ফ্লোয়েমের অবিচ্ছিন্নতা আর থাকে না। অর্থাৎ ঊর্ধ্বস্তম্ভ ও নিম্নস্তম্ভ এ দুই অংশে ফ্লোয়েম পৃথক হয়ে যায়। তবে জাইলেম পথ অপরিবর্তিত অবস্থায়ই থেকে যায়। কিছুদিন পর দেখা যাবে যে, আংটির উপরের অংশ স্ফীত হয়ে গেছে। এর কারণ হলো পাতায় তৈরি শর্করা ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরের সময় আংটির উপরের অংশে জমা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, জাইলেম নয়, বাকল অর্থাৎ ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়েই দ্রবের স্থানান্তর হয়।

৩. **জাবপোকার স্টাইলেট** (Aphid stylet) **থেকে প্রাপ্ত কোষরসের বিশ্লেষণ :** জাবপোকা তার মুখের স্টাইলেট অংশ সিভ নলে প্রবেশ করিয়ে কোষরস শোষণ করে। শোষণের পরপরই কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রবাহ প্রয়োগ করে জাবপোকাকে অজ্ঞান করা হয় এবং এর স্টাইলেট থেকে কোষরস বের করে আনা হয়। এ কোষরস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এতে প্রচুর পরিমাণ শর্করা থাকে। এটি প্রমাণ করে যে ফ্লোয়েমের সিভ নল দিয়ে দ্রবের স্থানান্তর হয়।

৪. **ট্রেসার কৌশল** (Tracer technique) : সালোকসংশ্লেষণের সময় তেজস্ক্রিয় কার্বনযুক্ত (^{14}C) কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদে সরবরাহ করে দেখা গেছে যে, লেবেলকৃত শর্করা ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়। এ কৌশল আরো প্রমাণ করে যে, কেবল সিভ নল দিয়েই শর্করা স্থানান্তরিত হয়, ফ্লোয়েমের অন্য কোনো কোষের মধ্য দিয়ে নয়।

৫. **জাইলেম ও ফ্লোয়েমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ :** জাইলেম ও ফ্লোয়েমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, জাইলেমের তুলনায় ফ্লোয়েমে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ শর্করা এবং নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ থাকে। এটিও প্রমাণ করে যে, ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়েই দ্রবের স্থানান্তর হয়।

তবে পারকিনস ও সহকর্মীরা (Perkins *et al*., 1959) সয়াবিন গাছের ^{14}C লেবেলযুক্ত ফটোসিনথেট এবং ^{14}C লেবেলযুক্ত সুক্রোজ, গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজের বিস্তার পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন যে, সর্বপ্রকার পরিবহণের জন্য ফ্লোয়েমের প্রয়োজন নেই, কিছু কিছু পরিবহণ মজ্জা (pith) জাইলেম দিয়েও হয়।

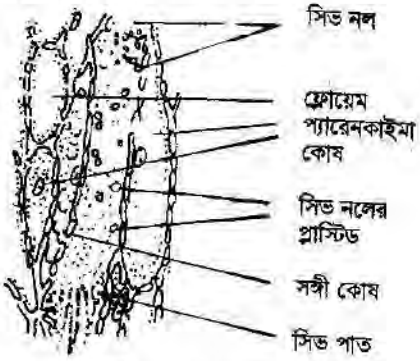

চিত্র ৩.২ : ফ্লোয়েম কলার গঠন

ফ্লোয়েমের গঠন

সিভ নল, সঙ্গীকোষ (Companion cell), কতিপয় প্যারেনকাইমা কোষ, ফাইবার এবং স্ক্লেরয়েড দ্বারা গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলা গঠিত। এদের মধ্যে কেবল সিভ নল শর্করা স্থানান্তরে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সিভ নল হলো দীর্ঘ কোষ এবং এটি এক প্রান্ত থেকে অন্য

প্রান্তে লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত থাকে। প্যারেনকাইমা কোষ সিভ নলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে এবং প্লাজমোডেসমাটা নামক সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় সূত্রের সাহায্যে সংযোগ স্থাপন করে। সঙ্গীকোষও এক প্রকার প্যারেনকাইমা কোষ, মাতৃক ভাজক কলা (parental meristematic cell) লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হয়ে একটি সঙ্গীকোষ ও একটি সিভ নল উৎপন্ন করে। সঙ্গীকোষ সিভ নলে শক্তি সরবরাহ করে।

একটি সিভ নলের পরিপক্বতার সময়ে কোষপ্রাচীরে কতিপয় সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। এর প্রস্থপ্রাচীরে (Transverse wall) ছিদ্র দেখা যায় এবং এ ছিদ্র পথে সাইটোপ্লাজমের একটি সূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্ববর্তী সিভনলের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। কতিপয় ক্ষেত্রে এ ছিদ্রগুলো পার্শ্বপ্রাচীরেও থাকতে পারে। তবে সাধারণভাবে এ ছিদ্রগুলো প্রস্থপ্রাচীরেই থাকে এদেরকে সিভপাত (sieve plate) বলা হয়।

সিভ নলের কোষপ্রাচীরের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর প্রোটোপ্লাজমের নানারকম পরিবর্তন হয়। নিউক্লিয়াস, টনোপ্লাস্ট এবং কোষগহ্বর আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়। রাইবোজোম ও ডিকটিওজোম বিলুপ্ত হয় এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা হ্রাস পায়। নবীন সিভনলের সাইটোপ্লাজমে প্রোটিনজাতীয় এক প্রকার পদার্থ দেখা যায়, একে 'স্লাইম বস্তু' (slime bodies) বলে। স্লাইম বস্তুগুলো সূত্রাকার এবং পরিপক্বতার সময় এটি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। পরিশেষে এটি সম্পূর্ণ সিভনলের মধ্যে বিস্তৃত হয়।

ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত বস্তু

ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে যে বস্তু স্থানান্তরিত হয় তার শতকরা নব্বই ভাগ কিংবা তার চেয়েও বেশি হলো শর্করা। আবার শর্করার মধ্যে সুক্রোজ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্থানান্তরিত হয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে সুক্রোজ ছাড়াও অলিগোসাকারাইড, যেমন- র‍্যাফিনোজ (raffinose), স্ট্যাকাইয়োজ (stachyose) এবং ভারবাসকোস (Verbascose) স্থানান্তরিত হয়। এ শর্করাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য আছে এ জন্যে যে, সুক্রোজের সাথে এক বা একাধিক গ্যালাকটোজ একক যুক্ত হয়ে এরা গঠিত হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদ প্রজাতির ফ্লোয়েমে ম্যানিটল ও সরবিটলও পাওয়া যায়। আপেল বৃক্ষের শর্করা স্থানান্তরে সরবিটল মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ ফ্লোয়েম কলায় প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবুও এটি সিভনলের মধ্যদিয়ে স্থানান্তরিত হয় না।

পুরাতন পাতা ও ফুল থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যামাইড উদ্ভিদের নতুন অংশে স্থানান্তরিত হয়। একটি সাধারণ ধারণা হলো এই যে, নাইট্রেট আকারে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ মৃত্তিকা থেকে মূলে প্রবেশ করে এবং এই অবস্থায় প্রধানত জাইলেম দিয়ে প্রথমে পাতায় প্রবেশ করে এবং এখানেই জৈব যৌগের সংশ্লেষণ হয়। বোলার্ড (Bollard, 1957) লক্ষ্য করেন যে, জাইলেমে অধিকাংশ নাইট্রোজেন থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যামাইড আকারে, বিশেষ করে অ্যাসপারটিক, অ্যাসপারাজিন, গ্লুটামিন এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড আকারে। সাধারণত নাইট্রেট নাইট্রোজেন খুব সামান্য মাত্রায় থাকে। বর্তমানে এটি দেখা গেছে যে, জাইলেম দিয়ে জৈব যৌগ হিসেবেই অধিকাংশ নাইট্রোজেনের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ হয়।

নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের পরিবহণে ফ্লোয়েমের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায় ম্যাকডানিয়েলস এবং কার্টিস (Mac Daniels and Curtis, 1930) এর গবেষণার ফলাফল থেকে। আপেল গাছের গুঁড়ির সর্পিলাকারে রিংগিং করলে দেখা যায় যে, সর্পিলের মুক্ত অংশের উপরের শাখা-প্রশাখায় মূল থেকে নাইট্রোজেন প্রধানত স্থানান্তরিত হয়। বিপরীত দিকের শাখা-প্রশাখাগুলো অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নাইট্রোজেন পায়।

উদ্ভিদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় দ্বারা ফ্লোয়েমে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের ঘনমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। *Salix*-এ সর্বোচ্চ ঘনমাত্রা হয় পাতার দ্রুত বৃদ্ধির সময় এবং মৌসুমের শেষে পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তির কালে। তবে বৃদ্ধির অধিকাংশ সময়ে ফ্লোয়েমে খুব কম মাত্রায় নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ থাকে। জিমারম্যান (Zimmerman, 1957) সাদা অ্যাস (ash) গাছের সিভ নলে ০.০০১ মোলারের চেয়েও কম পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিড পেয়েছেন; মিটলার (mutler, 1953, 1958) উইলো কাণ্ডের ফ্লোয়েমে গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, থ্রিওনিন, অ্যালানিন, সেরিন, লিউসিন, ভ্যালিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, অ্যাসপারজিন, গ্লুটামিন এবং গামা-অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড পেয়েছেন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মেইজেল (Maizel) এবং তাঁর সহযোগীরা কয়েক প্রজাতির উদ্ভিদের জাইলেম রসে ফসফরাসের পরিবহণ যোগ্য যৌগ হিসেবে ফসফোরাইলকোলাইন এবং গ্লিসারালফসফোরাইল কোলাইন শনাক্ত করেছেন।

স্থানান্তরের দিক

উভয়মুখী (Bidirectional) স্থানান্তর : ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে দ্রব উভয় দিকেই স্থানান্তরিত হতে পারে অর্থাৎ কাণ্ডে একই সাথে দ্রবের ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী স্থানান্তর হতে পারে। সালোকসংশ্লেষণের সময় উৎপন্ন শর্করা পাতা থেকে মূলের দিকে অথবা বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে পারে, যেখানে পুষ্প অথবা ফলের বর্ধন চলে। চারাগাছের বৃদ্ধির সময় সঞ্চয়ী অঙ্গ, যেমন- কন্দ, বাল্ব প্রভৃতি থেকে দ্রবের স্থানান্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়। পুরাতন পাতা থেকে নতুন পাতায় দ্রবের স্থানান্তরও ঊর্ধ্বমুখী। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, মূলের নিকটবর্তী পাতা থেকে দ্রব প্রধানত মূলে, কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত পাতা থেকে দ্রব প্রধানত কাণ্ডের শীর্ষে এবং মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত পাতা থেকে দ্রব উভয় দিকেই স্থানান্তরিত হয়।

উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যদিয়ে একই সাথে উভয়দিকেই দ্রবের স্থানান্তর প্রমাণিত হলেও, একই ফ্লোয়েম নালিকা কিংবা ভিন্ন ভিন্ন ফ্লোয়েম নালিকার মধ্য দিয়ে ও যে বিভিন্ন দিকে দ্রবের স্থানান্তর হয় তা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে বিডালফ এবং কোরি (Biddulph and Cory, 1965) এর বিন উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, দ্রবের উভয়মুখী চলন ভিন্ন ভিন্ন ফ্লোয়েম নালিকার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়।

পার্শ্বীয় (lateral) স্থানান্তর : ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী স্থানান্তরের তুলনায় দ্রবের পার্শ্বীয় স্থানান্তর খুব সামান্য হয়।

স্থানান্তরের গতি

বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিতে ফ্লোয়েম নালিকার মধ্য দিয়ে দ্রব স্থানান্তরের গতি বিভিন্নরকম। যেমন- সুগার বিট, উইলো, ইক্ষু এবং সয়াবিনের দ্রব্য স্থানান্তরের গতি যথাক্রমে প্রতি ঘণ্টায় ৮৫ থেকে ১০০, ১০০, ২৭০ এবং ১০০ সেন্টিমিটার। সাধারণত অধিকাংশ উদ্ভিদে দ্রব স্থানান্তরের গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার। এ গতি অবশ্য চিনির অণুর পানিতে ব্যাপনের গতির তুলনায় হাজার গুণ বেশি।

প্রতি ঘণ্টায় ফ্লোয়েমের প্রতি বর্গসেন্টিমিটার প্রস্থচ্ছেদীয় আয়তনে (cross-sectional area) কি পরিমাণ চিনি স্থানান্তরিত হয়, তার উপর ভিত্তি করেও কখনো কখনো দ্রব স্থানান্তরের গতি নিরূপণ করা হয়। স্থানান্তরিত চিনির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। যেমন- পরাগায়নের পর তিন মাসের মধ্যে লাউ-এর একটি ফলের শুষ্ক ওজন ৪ কিলোগ্রামেরও বেশি হতে পারে। সিভ নলের মাধ্যমে সবুজ পাতা থেকে চিনির স্থানান্তরের উপরেই প্রধানত এ ওজনের বৃদ্ধি নির্ভর

করে। গড়ে চিনি স্থানান্তরের গতি হলো প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ফ্লোয়েমের প্রস্থচ্ছেদীয় আয়তনে প্রতি ঘন্টায় ৬ গ্রাম চিনি।

উৎস যেমন- (সবুজ পাতা) এবং সিঙ্কের (যেমন- সঞ্চয়ী অঙ্গ) উপর তাপমাত্রার প্রভাবের মাধ্যমে প্রধানত পরিবহণের হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব প্রতিফলিত হয়, সুগার বীটে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে এটি প্রমাণিত হয়েছে। এ গাছের সিঙ্ক অংশের তাপমাত্রা কমিয়ে যদি প্রায় ১° সেলসিয়াসে আনা হয়, তাহলে $_{14}C$ লেবেল ফটোসিনথেটের পরিবহণের হার কমে মূল হারের শতকরা প্রায় ৩৫ থেকে ৪৫ ভাগ হয় (Geiger, 1966)। তাপমাত্রা বাড়ালে দ্রুত মূল হারে ফিরে যায়; যদি পত্রবৃন্তের ২ সেন্টিমিটার অংশ প্রায় ১° সেলসিয়াস এবং উদ্ভিদের বাকি অংশ ৩০° সেলসিয়াসে রাখা হলে $_{14}C$ লেবেল ফটোসিনথেটের পরিবহণ হার দ্রুত কমে যায়। উপযুক্ত সময় তাপীয় অভিযোজনের পর মূল হারে ফিরে যায়। এসময় পরিবহণ হারের উপর পত্রবৃন্তে উচ্চ তাপমাত্রার সামান্যই প্রভাব আছে।

পরিবহণ হারের উপর আলোর গুণগত মানের প্রভাব আছে। আখের বিচ্ছিন্ন পাতায় $_{14}C$ ফটোসিনথেটের পরিবহণ হার নীল অথবা লাল আলোর উপস্থিতিতে বেড়ে যায় (Hartt, 1966)। মটরশুঁটির পাণ্ডুর চারাগাছের ভ্রূণমুকুলে $_{14}C$ সুক্রোজের গ্রহণ লাল আলোতে বৃদ্ধি পায় (Goren and Galston, 1966)।

দ্রব স্থানান্তরের কৌশল

সিভ নলের মধ্য দিয়ে দ্রব, বিশেষ করে শর্করা স্থানান্তরের কৌশল উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানের একটি বিতর্কিত বিষয়। এ কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে কতগুলো মতবাদ প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি মতবাদের আলোচনা করা হলো।

১. প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ (Protoplasmic streaming) মতবাদ,
২. ট্রান্সসেলুলার প্রবাহ (Transcellular flow) মতবাদ,
৩. সংকোচী প্রোটিন (Contractile protein) মতবাদ,
৪. ইলেক্ট্রো-অভিস্রবণ (Electro-osmosis) মতবাদ,
৫. ত্বরান্বিত ব্যাপন (Accelerated diffusion) মতবাদ এবং
৬. চাপ প্রবাহ (Pressure flow) মতবাদ।

১. প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ মতবাদ : ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ডি সিভ এ মতবাদ প্রবর্তন করেন এবং এ মতবাদের সমর্থনকারীদের মধ্যে কার্টিস (Curtis, 1935) অন্যতম। এ মতবাদ অনুসারে ব্যাপন এবং সাইটোপ্লাজমীয় প্রবাহ উভয়ের জন্যেই দ্রবের স্থানান্তর হয়। প্রস্থপ্রাচীরে অবস্থিত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক সিভনল থেকে অন্য সিভ নলে ব্যাপন হয়। সিভ নলের ভিতরে সাইটোপ্লাজমীয় প্রবাহের জন্য দ্রব উর্ধ্বমুখে অথবা নিম্নমুখে স্থানান্তরিত হয়। তাই এই মতবাদে দ্রবের উভয়মুখী স্থানান্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, (ক) বিভিন্ন প্রকার দ্রবের একই সাথে উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী পরিবহণ হয়, (খ) ব্যাপনের তুলনায় এই পরিবহণের হার অনেক বেশি, বিশেষ করে কয়েক মিলিমিটার অথবা সেন্টিমিটার দূরত্বে, (গ) ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্টের বিরুদ্ধেও দ্রবের

স্থানান্তর সম্ভব হয়, (ঘ) যেহেতু জীবন্ত কোষের প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের উপর অক্সিজেনের ঘাটতি, তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং বিপাকীয় রোধকের প্রভাব আছে, তাই এগুলো আবার পরিবহণকে প্রভাবিত করে এবং ফ্লোয়েম কলা মারা গেলে পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি নির্দেশ করে যে, পরিবহণ এবং প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক আছে।

প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উপস্থাপিত হয়েছে, যদিও কয়েকটি আপত্তি বাতিল হয়ে গেছে। সঙ্গীকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা কোষে দ্রুত প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ অনেক গবেষক প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু পরিণত সিভ নলে তখনও এরা কার্যকর থাকে, এটি দেখতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। পরিণত সিভ নলে প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ হ্রাস পেতে পেতে এক সময় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। স্যুমেকার (Schumacher, 1937) বলেন যে, দ্রবের পরিবহণের সাথে প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের কোনোই সম্পর্ক নেই। লাউজাতীয় উদ্ভিদের এবং *Pelargonium* এর পত্রবৃন্তের রোমে ফ্লোরেসিনের (fluorescein) পরিবহণ পরীক্ষার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, কখনো কখনো প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ না থাকলেও ফ্লোরেসিনের পরিবহণ হয় এবং প্রোটোপ্লাজমের যেদিকে চলন হয়, তার বিপরীত দিকে একটি প্রোটোপ্লাজমীয় সূত্র বরাবর ফ্লোরেসিন অগ্রসর হতে পারে। দ্রবের পরিবহণের হারের তুলনায় কখনো কখনো প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের হার অনেক কম হয়। অধিকাংশ গবেষক প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের হার পেয়েছেন ১ থেকে ৫ সেন্টিমিটার/ঘন্টা, যা ফ্লোয়েম পরিবহণের হারের (৫ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার/ঘণ্টা) তুলনায় অনেক কম। কিন্তু বার এবং বয়ার (Barr and Broyer, 1964) ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহের হার পেয়েছেন ১০৭ মাইক্রোমিটার/সেকেণ্ড বা ৬.৫ মিলিমিটার/মিনিট অর্থাৎ সর্বোচ্চ ফ্লোয়েম পরিবহণের হারের (৫ সেন্টিমিটার/মিনিট) প্রায় এক-অষ্টমাংশ। প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবাহ মতবাদকে সামঞ্জস্যযুক্ত করার একটি বড় বাধা হলো যে, অনেক উদ্ভিদের ফ্লোয়েম থেকে কোষরস নির্গত হয়, সাইটোপ্লাজম নয়, যদিও কোষ-রসে অধিক ঘনমাত্রায় জৈব পদার্থ থাকে। এটি নির্দেশ করে যে, পরিবহণ কোষ-গহ্বর দিয়ে হয়, প্রোটোপ্লাজম দিয়ে নয়। অবশ্য ইলেক্ট্রন-আণুবীক্ষণিক চিত্র এই সমালোচনা বাতিল করে দেয়, কেননা যদি পরিণত সিভনলে টনোপ্লাস্ট লুপ্ত হয়েও যায়, তাহলে সাইটোপ্লাজম ও কোষ-গহ্বর একটি সিস্টেম-মিক্টোপ্লাজম (Mycoplasm)- গঠন করবে (Esau, 1966)।

২. ট্রান্সসেলুলার প্রবাহ মতবাদ : ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ক্যানি (Canny) এবং ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে থায়েন (Thaine) এবং তাঁর সহকর্মীরা সাইটোপ্লাজমীয় প্রবাহ মতবাদের কিছু রূপান্তরের প্রস্তাব করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, সিভ নলে কতগুলো ট্রান্সসেলুলার সূত্র আছে যাতে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লেগে থাকে। এ কণাগুলো সিভ নলের উপরে-নিচে বিস্তৃত। সাইটোপ্লাজমের কণাকার এবং ফ্লুইড উপাদানের এ সূত্রগুলোর মধ্য দিয়ে চলাচলকে ট্রান্সসেলুলার প্রবাহ বলে। ট্রান্সসেলুলার সূত্রগুলো প্রোটিনজাতীয় এবং এটি তালে তালে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। আইকম্যান এবং অ্যান্ডারসন (Aikman and Anderson, 1971) এ মতবাদ সমর্থন করেন।

ট্রান্সসেলুলার প্রবাহ একটি আকর্ষণীয় কৌশল করেণ এটি দ্রবের উভয়মুখী স্থানান্তর ব্যাখ্যা করে। একটি সিভ নলের বিভিন্ন সূত্র একই সাথে বিপরীত মুখে দ্রব স্থানান্তরে সক্ষম।

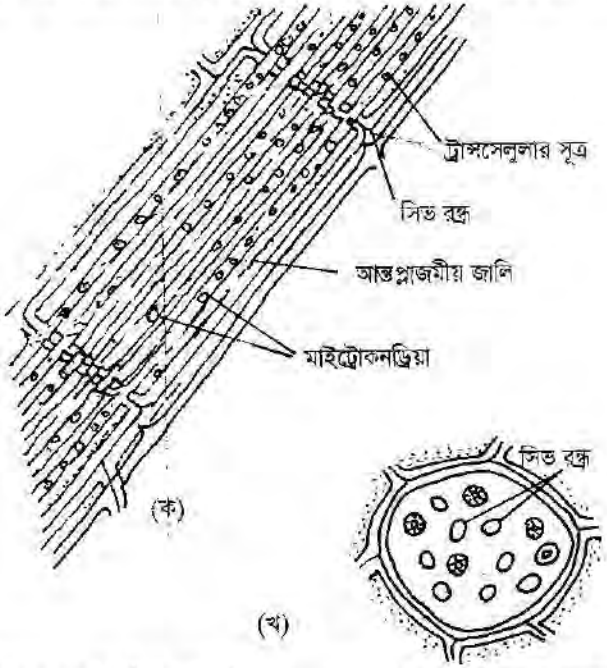

চিত্র ৩.৩ : ক. সিভ নলের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ (সূত্র উপস্থিত) ; খ. সিভ নলের প্রস্থচ্ছেদ

এ মতবাদের কতগুলো আপত্তি আছে যেমন- কিভাবে সিভ নলে জৈব-শক্তি ভৌত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ট্রান্সসেলুলার সূত্রগুলো নিরেট (solid) বা নলাকৃতি (tubular) কিনা তরল দ্রব্য স্থানান্তরিত হওয়ার কৌশল ইত্যাদি। এ মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উপরন্তু, ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে এরকম সূত্র দেখা যায়নি।

৩. **সংকোচী প্রোটিন :** ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কানাডীয় বিজ্ঞানী ফেনসম এবং উইলিয়ামস (Fensom and Williams) সিভ নলে পরস্পরের সাথে যুক্ত জালিকার মতো মাইক্রোফাইব্রিল দেখতে পান যাতে ফ্ল্যাজেলার মতো চলন আছে। প্রতিটি মাইক্রোফাইব্রিলের ব্যাস প্রায় ৬০ থেকে ২৮০ অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত এবং ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক কোষ পাত থেকে অন্য কোষ পাত পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁরা প্রস্তাব দেন যে, মাইক্রোফাইব্রিলে লেগে থাকা কণাগুলো লম্ফ প্রদানের মতো করে স্থানান্তরিত হয়। এটি এ ইঙ্গিত দেয় যে, সংকোচী প্রোটিনের সূত্র দ্বারা মাইক্রোফাইব্রিলগুলো গঠিত।

সম্ভবত নতুন এবং তেমন গ্রহণযোগ্য নয় বলে এ মতবাদের মারাত্মক আপত্তি নেই।

৪. **ইলেক্ট্রো-অভিস্রবণ :** কোষ-ঝিল্লির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাইড্রেটেড আয়নের প্রবাহকে ইলেক্ট্রো-অভিস্রবণ বলে। ইংরেজ বিজ্ঞানী স্প্যানর এবং জোনস (Spanner and Jones, 1958, 1970) প্রস্তাব করেন যে, ইলেক্ট্রো-অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সিভ নলে শর্করার স্থানান্তর হয়। ইলেক্ট্রো-অভিস্রবণের জন্য তিন জিনিসের প্রয়োজন, যথা- একটি আধানযুক্ত ঝিল্লি, একটি

ঝিল্লি-পটেনশিয়াল পার্থক্য এবং ছিদ্রযুক্ত ঝিল্লি ; এর সবগুলো সিভ পাতে (Sive plate) আছে। পটেনশিয়াল রক্ষণের জন্য সিভ পাতের উপরের এবং নিচের সিভ নলের মধ্যে চক্রাকারে পটাসিয়াম আয়ন চলাচল করে। ফেরৎ চলন হয় সঙ্গীকোষ অথবা সম্ভবত প্লোয়েম প্যারেনকাইমা কোষের ভেতর দিয়ে। শুরুতে সিভনলে চিনি যুক্ত হয়, এর পরবর্তী কোষ থেকে পানি এবং এই প্রবাহ বরাবর পটাশিয়াম আয়ন সিভ নলে প্রবেশ করে । এ চলন একবার শুরু হলে সিভ পাতকে বৈদ্যুতিকভাবে মেরু অভিমুখী করে এবং সিভপাত দিয়ে দ্রুত ইলেক্ট্রো-অভিস্রবণ হবে। তাই, প্রতিটি সিভ পাত এর শক্তি প্রবাহকে সরবরাহ করে, উৎস এবং সিঙ্ক-এর পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে বাধা দূর হয়।

এই মতবাদ সুন্দর হলেও এর কিছু কিছু সমালোচনা করা হয়েছে। প্লোয়েম দিয়ে অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়ন উভয়েই পরিবাহিত হয়, কিন্তু এই মতবাদ অনুসারে কেবল ক্যাটায়ন প্লোয়েম দিয়ে চলাচল করে সিভ পাত বরাবর মেরু-অভিমুখী পটেনশিয়ালের অস্তিত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি এবং এর জন্য প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়।

৫. ত্বরান্বিত ব্যাপন মতবাদ : যদিও অনেকদিন আগেই জানা গিয়েছিলো যে, প্লোয়েমের মধ্য দিয়ে দ্রব স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাপন খুবই ধীর প্রক্রিয়া, তবুও দ্রব স্থানান্তরের সাথে ব্যাপনের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রথমত, ব্যাপনের মতো শর্করা উৎস থেকে সিঙ্কে ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট বরাবর চলাচল করে। দ্বিতীয়ত, ব্যাপনের মতো ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্টের সাথে দ্রবের স্থানান্তর সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং উৎস ও সিঙ্কের দূরত্বের উপর এটি নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, বিভিন্ন প্রকার পদার্থ তাদের ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট বরাবর বিপরীত দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে।

অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি পূর্বে দুজন ইংরেজ বিজ্ঞানী ম্যাসন এবং ম্যাসকেল (Mason and Maskell) সর্বপ্রথম ত্বরান্বিত ব্যাপনের কৌশলের প্রস্তাব করেন। তাঁরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, তুলা গাছের কাণ্ডের মধ্য দিয়ে শর্করা স্থানান্তরের সময় উৎস এবং সিঙ্কের মধ্যে ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্টে বিদ্যমান। উপরন্তু, তাঁদের গবেষণার ফলাফল থেকে আরো জানা যায় যে, একটি কাচনলে পানির স্তম্ভের ব্যাপনের তুলনায় কাণ্ডে শর্করার চলাচলের গতি চল্লিশ হাজার গুণ বেশি। এ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তাঁরা শর্করার ত্বরান্বিত ব্যাপনের মতবাদের প্রস্তাব করেন। তাঁরা মনে করতেন যে, সিভ নলের মধ্য দিয়ে শর্করার স্থানান্তর ব্যাপনের মতোই, কিন্তু কোষীয় বিপাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এ ব্যাপন ত্বরান্বিত হয়। তবে কিভাবে এটি সম্পর্কযুক্ত তা ম্যাসন এবং ম্যাসকেলের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

উনিশশত ষাট দশকের প্রথমের দিকে অস্ট্রেলিয়ান উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ ক্যানি (Canny) এবং তাঁর সহকর্মীরা তেজস্ক্রিয়ভাবে লেবেল শর্করা কাণ্ডের গোড়ায় প্রয়োগ করেন এবং দূরত্বের তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করেন। প্লোয়েম কলা বরাবর তেজস্ক্রিয়তার গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে ক্যানি ও তাঁর সহকর্মীরা মন্তব্য করেন যে, তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলের সাথে ম্যাসন এবং ম্যাসকেলের প্রকল্প ভালভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের মতানুসারে সিভ নলে দুটি অবস্থা বিদ্যমান-চিনির দ্রবণের একটি সুস্থির অবস্থা এবং অপরটি গতিশীল সাইটোপ্লাজমীয় অবস্থা যা সিভ নলের মধ্যে দীর্ঘ সূত্র বরাবর উভয় দিকেই প্রবাহিত হয়। এ সূত্রগুলো থায়েনের ট্রান্সসেলুলার প্রবাহ মতবাদে বর্ণিত স্ট্রান্সসেলুলার সূত্রের মতোই। তবে ক্যানির এ সূত্রগুলো থায়েনের সূত্রগুলোর তুলনায় কোষপাতে অবস্থিত ছিদ্রগুলো সূত্র দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ থাকে। পরিশেষে, ক্যানি এবং তাঁর সহকর্মীরা ধারণা করেন যে, সূত্রগুলোর গোত্র চিনিতে আংশিক ভেদ্য হওয়ায় সূত্র এবং চারপাশের কোষ-রসের মধ্যে চিনির অণুর বিনিময় হয়।

পর পর সজ্জিত প্রতিটি সিভ নলের প্রতিটি সূত্রের ঘন দ্রবণ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ঘন দ্রবণের দিকে চিনি ব্যাপন হয়। যেসব সূত্রের মধ্য দিয়ে চিনি নিম্নমুখে বাহিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে নিচের দিকের সিভ নলের কোষ-রসে চিনি মুক্ত না হয়ে সাধারণত নিচের দিকেই ধাবিত হয়। আবার যেসব সূত্র দিয়ে চিনি ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী কোষ রসের তুলনায় সূত্রে চিনির ঘনত্ব কম থাকে এবং এটি আস্তে আস্তে চিনি পরিশোষণ করে। চতুষ্পার্শ্বের কোষ-রস এবং সূত্রের মধ্যে ব্যাপনের ফলে প্রত্যেক সিভ নলে অবস্থিত ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী সূত্রগুলোর মধ্যে চিনির ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এর জন্য একটি সিভ নলের দৈর্ঘ্য বরাবর অধিক ঘন প্রান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত কম ঘন প্রান্তের দিকে চিনি লম্বালম্বিভাবে ব্যাপিত হয়, তবে এ ব্যাপনের হার খুব বেশি।

ক্যানির ত্বরান্বিত ব্যাপনের প্রকল্প সিভ নলের বিশেষ অন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু সিভ নলের সূক্ষ্ম গঠন অনুমানভিত্তিক হয়েই থাকবে। তাই এ প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি।

৬. চাপ প্রবাহ মতবাদ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী মাঞ্চ (Munch) এ প্রকল্প প্রথম প্রস্তাব করেন, তাই এটি মাঞ্চ এর প্রকল্প নামেও পরিচিত। একে প্রাণীর রক্ত সংবহনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পাতার মেসোফিল কোষ হৃৎপিণ্ডের মতো কাজ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অভিস্রবণীয় কৌশল গ্রেডিয়েন্টের মাধ্যমে দ্রবের নিম্নমুখী স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করে। সালোকসংশ্লেষণের সময় মেসোফিল কলার কোষ-রসের ঘনমাত্রা বেশি থাকে। ফলে অভিস্রবণীয় চাপ বেড়ে যায় এবং কোষে পানি পরিশোষিত হয়। এজন্য মেসোফিল কোষের রসস্ফীতি চাপ অনেক বেড়ে যায়।

প্লাজমোডেজমাটার মাধ্যমে মেসোফিল কোষগুলো পরস্পরের মধ্যে এবং পরিশেষে সিভনলের সাথে যোগাযোগ করে। রসস্ফীতি চাপের জন্য প্লাজমোডেজমাটার মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণ দ্রবণ সিভ নলে প্রবেশ করে। সালোকসংশ্লেষণ এবং জাইলেম থেকে পানি পরিশোষণ করে মেসোফিল কোষগুলো দ্রবণের ঘাটতি পূরণ করে। এভাবে মেসোফিল কলা এবং সিভ নলের মধ্যে একটি রসস্ফীতি চাপের গ্রেডিয়েন্ট স্থাপিত হয়।

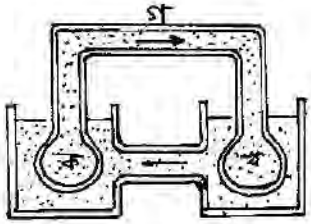

চিত্র ৩.৪ : চাপ প্রবাহ মতবাদের স্বপক্ষে একটি সাধারণ পরীক্ষা

চিত্র ৩.৪ এ উপস্থাপিত পরীক্ষার দ্বারা প্রবাহ মতবাদ ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, ক এবং খ দুটি অসমোমিটার যার মধ্যে কেবল পানি প্রবেশ করতে পারে এবং এ দুটি অসমোমিটারকে গ নল দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। ধরা যাক, খ অসমোমিটারের তুলনায় ক অসমোমিটারে চিনি ঘনত্ব বেশি। এবার দুটি অসমোমিটারকে একটি পাত্রে রক্ষিত পানিতে

ডুবিয়ে রাখা হলো। যেহেতু ক অসমোমিটারে চিনির ঘনত্ব বেশি, সেহেতু প্রচুর পরিমাণ পানি এতে প্রবেশ করবে, ফলে এর রসস্ফীতি চাপও বেড়ে যাবে। ফলে চিনির দ্রবণ গ নলের ভিতর দিয়ে ক থেকে খ অসমোমিটারে প্রবেশ করবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত উভয় অসমোমিটারের দ্রবণের ঘনত্ব সমান না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ প্রবেশ চলতে থাকবে। যদি ক অসমোমিটারে অনবরত চিনির দ্রবণ সরবরাহ করা হয়, তবে এ সময়সীমা বর্ধিত করা যাবে।

ক, অসমোমিটারকে পাতার মেসোফিল কোষের (সরবরাহকারী) সাথে, খ অসমোমিটারকে মূলের (গ্রহণকারী) সাথে, গ নলকে ফ্লোয়েম, বিশেষ করে সিভ নলের সাথে এবং পানিপূর্ণ পাত্রকে জাইলেম ভেসেলের সাথে তুলনা করা যায়।

চাপ প্রবাহ মতবাদের সমালোচনা

১. সিভ নল জীবন্ত হওয়া ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে দ্রব স্থানান্তরের একটি পূর্বশর্ত। উপরন্তু, অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মতো দ্রব স্থানান্তরও তাপমাত্রা এবং বিপাকীয় রোধক (metabolic inhibitors) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ তথ্যাদি প্রমাণ করে যে, দ্রব স্থানান্তর নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া নয়, এতে প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়। কিন্তু কিভাবে শক্তি ব্যয় হয়, সে সম্পর্কে চাপ প্রবাহ মতবাদে কোনোই ধারণা পাওয়া যায় না।

২. সোয়ানসন (Swanson, 1957) দেখান যে, পাতার ক্লোরেনকাইমা কোষ থেকে সিভ নলের দ্রবের স্থানান্তর অভিস্রবণীয় চাপের বিপরীতেও হতে পারে। তাই পাতার কোষ থেকে কোষান্তরে এবং পরিশেষে সিভ নলে দ্রবের জমা হওয়া একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এর জন্য বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে, শর্করা, ফসফেট এবং একটি সক্রিয় বাহক তন্ত্র এতে অংশগ্রহণ করে। কোষ-ঝিল্লির মধ্যদিয়ে প্রবেশের জন্য শর্করা ফসফোরাইলেশন একান্ত প্রয়োজন। ফসফোরাইলেটেড সুক্রোজ কোষ-ঝিল্লির মধ্যদিয়ে অতি সহজে চলাচল করতে পারে অথবা এটি সুক্রোজ অণুকে সক্রিয় করে তোলে যার ফলে সুক্রোজ কোনো বাহকের সাথে যুক্ত হয়ে কমপ্লেক্স গঠন করে, যা অতি সহজেই কোষ-ঝিল্লির মধ্যদিয়ে চলাচল করতে পারে।

৩. চাপ প্রবাহ মতবাদ অনুসারে দ্রব কেবল একদিকে স্থানান্তরিত হয়। তবে এটি সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয়েছে যে, উদ্ভিদে দ্রবের উভয়মুখী স্থানান্তর হয়। চাপ প্রবাহ মতবাদ উভয়মুখী দ্রব স্থানান্তরের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না, যদিও ক্রাফস্ট (Crafts, 1951) প্রস্তাব করেছেন যে, পাতা দুটি সিঙ্ক হিসেবে কাজ করতে পারে- একটি উদ্ভিদের শীর্ষের দিকে এবং অন্যটি মূলের দিকে। তাই পাতা থেকে দ্রব দুটি পৃথক ফ্লোয়েম নালিকায় দুদিকে স্থানান্তরিত হতে পারে, তবে এটি তেমন যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

৪. কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সিভনলের ছিদ্র ঘন প্রোটোপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে, এর ফলে দ্রবণের ব্যাপক প্রবাহে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৫. হুৎপিন্ডের মতো কোনো পাম্পের উপস্থিতি উদ্ভিদে প্রমাণিত হয়নি। অ্যারিসজ (Arisz, 1952) প্রস্তাব করেন যে, মেসোফিল কোষে এ প্রকার কোনো তন্ত্র নেই, কেননা সিভ নল থেকে মেসোফিল কলা পর্যন্ত রসস্ফীতি চাপের গ্রেডিয়েন্ট বিস্তৃত, বিপরীত দিকে নয়।

দ্রব স্থানান্তরে কতিপয় প্রভাবক

কতগুলো প্রভাবক দ্রব স্থানান্তরের হার নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাপমাত্রা, আলো, বিপাকীয় রোধক, ঘনমাত্রা, গ্রেডিয়েন্ট, খনিজ লবণের ঘাটতি এবং হরমোন

তাপমাত্রা : দ্রব স্থানান্তরের হারের সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক নির্ণয় বেশ জটিল, কেননা অন্যান্য বিপাকক্রিয়া, যাদের দ্রব স্থানান্তরের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে, তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতদসত্ত্বেও তাপমাত্রার সাথে দ্রব স্থানান্তরের হারের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। হেউট এবং কার্টিস (Hewitt and Curtis, 1948) এর গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বিন উদ্ভিদের দ্রব স্থানান্তরের সর্বোত্তম তাপমাত্রা হলো ২০° থেকে ৩০° সেলসিয়াসের মধ্যে। হার্ট (Hartt, 1965) এর পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ইক্ষুকে ২০°, ২৪.৫° এবং ৩৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে দ্রব স্থানান্তরের হার হয় যথাক্রমে প্রতি ঘণ্টায় ৮৪, ৯৩.৬ এবং ১২০ সেন্টিমিটার। ঊর্ধ্বমুখে কিংবা নিম্নমুখে দ্রবের স্থানান্তর কাণ্ডের তাপমাত্রার চেয়ে মূলের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। হার্ট-এর পরীক্ষার ফলাফল থেকে আরো জানা যায় যে, যখন কাণ্ডের তুলনায় মূলের তাপমাত্রা বেশি থাকে, তখন মূলের দিকে দ্রবের স্থানান্তরের হার বেড়ে যায় এবং উপরের দিকের হার কমে যায়। বিপরীত অবস্থা হলে অর্থাৎ মূলের তুলনায় বিটপে তাপমাত্রা বেশি হলে ঊর্ধ্বমুখী স্থানান্তরে হার বৃদ্ধি পায়।

আলো : পূর্বে বলা হয়েছে যে, আলোর প্রখরতা বাড়ার সাথে সাথে সালোকসংশ্লেষণের হারও বেড়ে যায়। গমের মূল ও বিটপের শুষ্ক ওজনের অনুপাত আলোর প্রখরতার সাথে বৃদ্ধি পায়। এটি নির্দেশ করে যে, আলোর প্রখরতার বৃদ্ধি পেলে বিটপের তুলনায় মূলে দ্রবের স্থানান্তর বেশি হয়। সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, আলোর প্রকৃতি দ্বারাও দ্রব স্থানান্তরের হার প্রভাবিত হয়। হার্ট (Hartt, 1966) লক্ষ্য করেন যে, লাল অথবা নীল আলোর উপস্থিতিতে ইক্ষুর বিচ্ছিন্ন পত্রফলকে ^{14}C সালোকসংশ্লেষী বস্তুর স্থানান্তর ত্বরান্বিত হয়।

বিপাকীয় রোধক : এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, কতগুলো বিপাকীয় রোধক পদার্থ শর্করার স্থানান্তরে বাধা প্রদান করে। ২, ৪-ডাই-নাইট্রোফেনল (DNP), আরসেনাইট, অ্যাজাইড, আইডোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, ফ্লোরাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড প্রভৃতি কতগুলো বিপাকীয় রোধক পদার্থ। এসব রোধক পদার্থ সিভ নলের বিপাক কার্যে বিঘ্ন ঘটায় কিংবা সরবরাহকারী এবং গ্রহণকারী কোষের বিপাকে বিঘ্ন ঘটায় তা এখনও সুনিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হয় যে, পাতার সালোকসংশ্লেষী মেসোফিল কোষে এ বিপাকীয় রোধক পদার্থ স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে ফ্লোয়েম নালিকায় কোষ থেকে কোষান্তরে দ্রবের স্থানান্তরে বাধা প্রদান করে। আবার এটিও হতে পারে যে, বিপাকীয় রোধক পদার্থ গ্রহণকারী কোষ অর্থাৎ সিঙ্কে বাহিত হয় এবং সেখানে স্থানান্তরিত দ্রব জমতে বিঘ্ন ঘটায়।

সাম্প্রতিক সয়াবিন ও রেড়ির উপর গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ২, ৪-ডাইনাইট্রোফেনলের জন্য দ্রব স্থানান্তর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ হলো সিভ নলে দ্রবের প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপাক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাবের জন্য। যেহেতু সিভ নল জীবন্ত অবস্থায় কার্যকরী, সেহেতু বিপাকীয় রোধক পদার্থ সিভ নলের বিপাকে বিঘ্ন ঘটিয়ে দ্রব স্থানান্তরে বাধা প্রদান করে।

ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট : সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, সিভ নলে শর্করার প্রবাহের দিক হলো শর্করার ঘনমাত্রার হ্রাসের দিকে। ম্যাসন এবং ম্যাসকেল (Mason and Maskell, 1928) লক্ষ্য করেন যে; তুলা গাছে ঘনমাত্রা নিম্ন ঘনমাত্রার দিকে দ্রব স্থানান্তরিত হয়।

খনিজ লবণের অভাব : গচ এবং ডুগার (Gauch and Dugger, 1953) লক্ষ্য করেন যে, ^{14}C সুক্রোজের দ্রবণে নিমজ্জিত বিন অথবা টমেটো গাছের পাতা কর্তৃক সুক্রোজের পরিশোষণ ও স্থানান্তর সহজতর হয় যদি ঐ দ্রবণে বোরণ যোগ করা হয়। এ গবেষকদ্বয়ের মতানুসারে বোরন এবং সুক্রোজের মধ্যে আয়োনাইজ করতে সক্ষম এমন একটি যৌগ সৃষ্টি হয়, বোরনবিহীন সুক্রোজের তুলনায় এ যৌগ অতি দ্রুত কোষ-ঝিল্লির মধ্যদিয়ে প্রবেশ করতে পারে। স্কক (Skok, 1957) এর মতানুসারে সুক্রোজ স্থানান্তরে বোরনের ভূমিকা হলো এই যে, শীর্ষস্থ ভাজক কলায় কোষীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য বোরনের প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, চিনি বোরেট যৌগ সৃষ্টি করে কোষ-ঝিল্লির মধ্যদিয়ে প্রবেশ করার উপর বোরনের কোনোই প্রভাব নেই।

কতিপয় পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, গ্লুকোজ-১-ফসফেটকে স্টার্চে রূপান্তরিত হতে বোরন বাধা প্রদান করে, ফলে স্থানান্তরের জন্য বেশি পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায়।

বোরন ব্যতীত অন্য কোনো খনিজ মৌলের দ্রব স্থানান্তরে কি ভূমিকা আছে সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

হরমোন : বৃদ্ধিকর হরমোন কোষ ও কলার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, তাই গঠনগত উপাদান এবং শক্তির জন্য প্রচুর পরিমাণ বিপাকীয় বস্তুর স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। যেহেতু উদ্ভিদে বর্ধনশীল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধিকর হরমোন থাকে এবং ঐ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ বিপাকীয় বস্তুর স্থানান্তর হয়, সেহেতু ধারণা করা হয় যে, উদ্ভিদ হরমোন দ্রবের স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্রব স্থানান্তরের উপর হরমোনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে তথ্য অপ্রতুল। তবে *Cucumis melo* এবং *Cucurbita ficifolia* নিয়ে ডিস্টিগটার (Destigter, 1961) এর গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, দ্রব স্থানান্তরের উপর হরমোনের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এ ফলাফল আরো নির্দেশ করে যে, দ্রব স্থানান্তরের জন্য পাতায় অবস্থিত হরমোনের প্রয়োজন হয়।

বর্তমানে অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, কতগুলো প্রাকৃতিক হরমোন, কাইনেটিন, ইন্ডোল-৩- অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA), জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রভৃতি আংশিকভাবে হলেও দ্রব স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্রবণীয় নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের স্থানান্তরে কাইনেটিনের প্রভাব আছে

যদি বিন কিংবা মটরশুঁটি গাছের অগ্রভাগ কেটে ফেলে ঐ কর্তিত অংশে ল্যানোলিন পেস্ট লাগিয়ে দেয়া যায়, তবে কাণ্ডের গোড়ায় ^{14}C সুক্রোজ প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে, খুব সামান্য পরিমাণ লেবেল সুক্রোজ কর্তিত অংশের পর্বমধ্যে জমা হবে। অন্যদিকে, ল্যানোলিন পেস্টে IAA যুক্ত করলে প্রচুর পরিমাণ লেবেল সুক্রোজ কর্তিত অংশের পর্বমধ্যে জমা হয়। এরকম ক্ষেত্রে জিব্বারেলিক অ্যাসিড এবং কাইনেটিনের প্রভাব খুব সামান্য। সয়াবিনেও প্রায় একইরকম ফলাফল পাওয়া গেছে। সয়াবিনের শীর্ষস্থ ভাজক কলা কেটে ফেলে এ অংশে IAA অথবা GA_3 এর জলীয় দ্রবণ প্রয়োগ করা হয় এবং একটি পাতাকে ৩০ মিনিট $^{14}CO_2$ এ রাখা হয়। এ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে ^{14}C এর বিস্তার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, IAA এবং GA_3 উভয়েই ^{14}C যৌগের স্থানান্তর বৃদ্ধি করে।

চতুর্থ অধ্যায়
বৃদ্ধি

অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজে খাদ্য ভেঙে শক্তি নির্গত হয় এবং এর বিনিময়ে নতুন কোষের উৎপত্তি হয়। সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষের সাথে সাথে পরভোজী (heterotrophic) বিপাক শেষ হয়ে যায় এবং স্বভোজী অবস্থা (autotrophic) প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী বৃদ্ধি চলতে থাকে। স্বভোজী অবস্থায় সালোকসংশ্লেষণ ও অন্যান্য উপচিতীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি, অজৈব আয়ন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নতুন কোষীয় বস্তুতে পরিণত হয়। পরভোজী থেকে স্বভোজী অবস্থা প্রাপ্তির সময় উদ্ভিদের মূল ও সবুজ বিটপ গঠিত হয় এবং এটি বৃদ্ধির একটি দশা নির্দেশ করে। এ নতুন বৃদ্ধি-দশার স্থায়িত্বকাল পরিবর্তনশীল, তবে বর্ষজীবী উদ্ভিদে পুষ্পায়নের সাথে সাথে এ দশা শেষ হয়ে যায়। বীজের অঙ্কুরোদ্গম থেকে উদ্ভিদের পুষ্পায়ন পর্যন্ত এ সময়সীমাকে অঙ্গজ (vegetative) বৃদ্ধি বলে।

উদ্ভিদ দেহের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় আয়তন এবং ওজন বাড়াকে বৃদ্ধি বলে। বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের আকার এবং আকৃতির পরিবর্তন হয়। এক খণ্ড শুষ্ক কাঠের (যা মৃত কোষ দ্বারা গঠিত) ভেজা অবস্থায় আয়তন বেড়ে যায় এবং শুষ্ক অবস্থায় আবার আয়তন কমে যায়। এ অবস্থা অপরিবর্তনশীল নয় বলে একে বৃদ্ধি বলা যাবে না। সুতরাং কেবল জীবিত বস্তুতে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং এটি সম্ভব হয় বিপাকীয় শক্তি ব্যয়িত হয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, লিপিড, পলিস্যাকারাইড প্রভৃতি অতিকায় অণু তৈরির মাধ্যমে। কোষীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি বলতে অতিকায় অণুগুলো ঝিল্লি, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রাঙ্গে পরিণত হওয়া বোঝায়। কোষের আকার অনিয়তভাবে বৃদ্ধি পায় না, তবে একটি নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্তির পর এটি বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ তৈরি করে। কোষ-বিভাজনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো নিউক্লিয়াসে অবস্থিত DNA-এর সংশ্লেষণ ও অনুলেপন (replication)।

বিপাকীয় প্রক্রিয়ার উপচিতির ফলে জৈব-রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং অপচিতির ফলে এসব পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যখন অপচিতি প্রক্রিয়ার তুলনায় উপচিতীয় প্রক্রিয়ার পরিমাণ বেশি হয়, অর্থাৎ ক্ষয়পূরণ করেও যদি কিছুটা উপাদান উদ্বৃত্ত থাকে, তবে উদ্ভিদ দেহ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির সময় উদ্ভিদ দেহে যেসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে, তাকে বিকাশ (development) বলে। বিকাশের ফলেই সুনির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট এবং রাসায়নিক গঠনগত উদ্ভিদ দেহ সৃষ্টি হয়। একটি উদ্ভিদের সমগ্র জীবনচক্রে নানা প্রকার বিকাশ ঘটে। একটি কাল্পনিক বর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনচক্রে যেসব ঘটনা ঘটে তা চিত্র ৪.১-এ দেখানো হয়েছে। বীজের অঙ্কুরোদ্গম থেকে শুরু করে বীজের পরিপক্বতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে : অঙ্কুরোদ্গম, চারাগাছের অভ্যুদয়, পত্রের বৃদ্ধি, পুষ্পারম্ভ, পুষ্পের অভ্যুদয়, পরাগ রেণুর উৎপত্তি (anthesis), পরাগায়ন, নিষেক এবং বীজের বিকাশ। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে উপরোক্ত দশাগুলো সম্পূর্ণ করতে যদি ১২০ দিন সময় লাগে, তবে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ২দিন, চারাগাছ অভ্যুদয়ের জন্য ৫দিন ইত্যাদি সময়ের প্রয়োজন হয়।

চিত্র ৪.১ : ১২০ দিন সম্পূর্ণ করে এমন একটি কাল্পনিক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বিকাশ দেখানো হয়েছে

একটি ভিন্ন পরিবেশে উপযুক্ত জীবনচক্রের সময়সীমা বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পেতে পারে, তবে যদি পূর্ণাঙ্গ বীজ তৈরি হয়, তাহলে বিপরিণতির কোনো দশাই বাদ যাবে না। অধিকাংশ দশাই খালি চোখে দেখা যাবে। তবে কতিপয় দশা, যেমন- পুষ্পারম্ভ, পরাগায়ন এবং নিষেক কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে কিংবা পরবর্তী দশা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বোঝা যাবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন হতে পারে যে, একটি বিকাশ দশাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে পারে ; এমন হলে জীবনচক্র অসম্পূর্ণ হয়। যেমন- পানির অভাব বা প্রয়োজনীয় আলোকসীমার অভাবে পুষ্পায়ন হয় না ; অথবা প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে কিংবা উপযুক্ত পতঙ্গের অভাবে পরাগায়ন ব্যাহত হতে পারে।

বৃদ্ধি পরিমাপের পদ্ধতি

উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উচ্চতাই যথেষ্ট হতে পারে, তবে সাধারণত আরো বেশি কিছু তথ্য জানার প্রয়োজন হয়। প্রতিটি পাতার আকার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ক্ষেত্রফল), উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের যেমন- মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফলের সজীব ওজন ও শুষ্ক ওজন, কলা ও অঙ্গে কোষের সংখ্যা প্রভৃতিও বৃদ্ধির পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা যায়।

বর্ষজীবী উদ্ভিদের বৃদ্ধির কতিপয় পরিমাণগত দিক (Some quantitative aspects of growth of annual Plant)

উচ্চতা ও শুষ্ক ওজনের উপর ভিত্তি করে যবের (*Hordeum vulgare*) বৃদ্ধি চিত্র ৪.২-এ দেখানো হয়েছে। এ পরীক্ষায় যবের বীজ মাঠে বপন করা হয়েছিল এবং ১৫ দিন পরে যখন প্রথম পাতার অভ্যুদয় হয় তখন থেকে বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। তিনটি অথবা চারটি পাতার অভ্যুদয়ের পর থেকে বৃদ্ধি (উচ্চতা) দ্রুত হয় এবং ৯০ দিন পর্যন্ত তা চলে। তারপর উচ্চতা হ্রাস পায়। চিত্র ৪.২-এ বিপরিণতির কতিপয় দশাও দেখানো হয়েছে। পাতা উৎপাদনের সময়

বৃদ্ধি অতি দ্রুত হয়। উচ্চতা হ্রাসের সাথে সাথে পুষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। পুষ্পের অভ্যুদয়ের প্রায় ৩০ দিন পূর্বে পুষ্পারম্ভ ঘটে কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধি চলতেই থাকে। কারণ পুষ্পারম্ভের পূর্বে যেসব পাতার উৎপত্তি হয়, তাদের বৃদ্ধি চলতেই থাকে। পুষ্পারম্ভের পর কোনো নতুন পাতার উৎপত্তি হয় না।

শুষ্ক ওজনের বৃদ্ধি, উচ্চতা বৃদ্ধির মতোই, তবে বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা কিছুদিন পরে পরিলক্ষিত হয়। একশত দিন পর শুষ্ক ওজন কমে যায়। তবে, যদি বর্ধনশীল দানার উপর যুক্ত করা হয়, তাহলে শুষ্ক ওজনের বৃদ্ধি বীজের বর্ধন ও পরিপক্বতা পর্যন্ত চলতে থাকে।

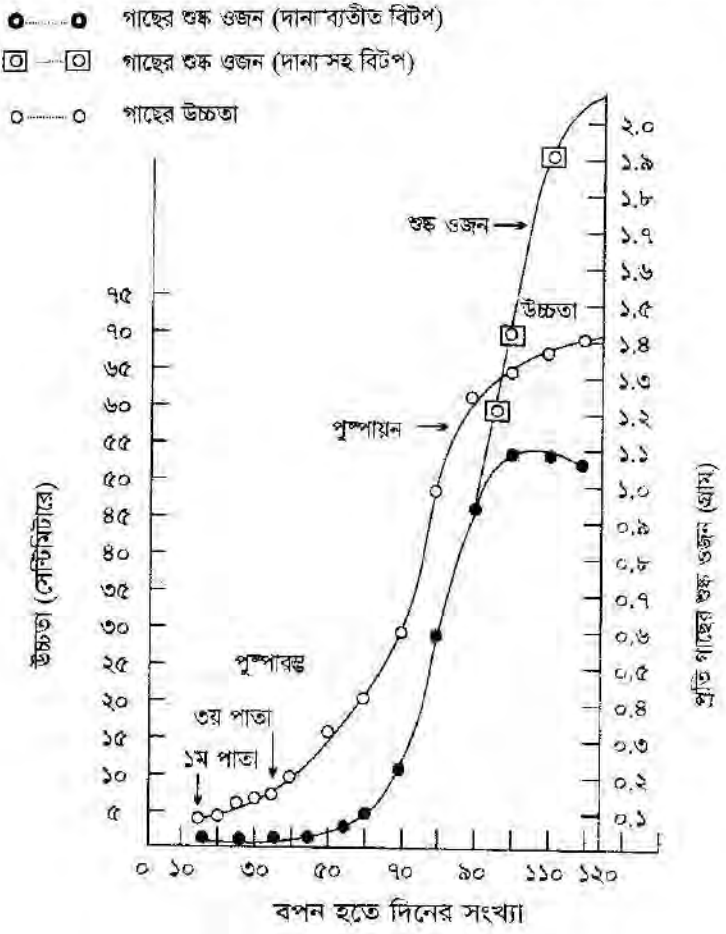

চিত্র ৪.২ : যবের বৃদ্ধির রেখাচিত্র

চিত্র ৪.২-এ অবশ্য অঙ্গজ বৃদ্ধিতে মূল, কাণ্ড ও পাতার পারস্পরিক ভূমিকা সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেয় না গমের (*Triticum aestivum*) প্রথম ২৪ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির সময়ে মূল, কাণ্ড ও পাতার ভূমিকা চিত্র ৪.৩-এ দেখানো হয়েছে। বৃদ্ধি কক্ষে (growth room) ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, অবিচ্ছিন্ন আলোকে (৯৫০ ফুট-ক্যান্ডেল) এবং সম্পূর্ণ পুষ্টিদ্রবণে

গম গাছ জন্মানো হয়েছে। ১ থেকে ৩ দিন পর পর গম গাছকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত করে তাদের শুষ্ক ওজন পৃথকভাবে নেয়া হয়েছে। বীজের প্রাথমিক শুষ্ক ওজন ৫০ মিলিগ্রাম ছিল। বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও চারাগাছের অভ্যুদয়ের সময়ে বীজে সঞ্চিত খাদ্য ভ্রূণ উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে এটি মূল উৎপাদনে ব্যয় হয় (৩ থেকে ৬দিন)। এরপর মূলের বৃদ্ধি কমে যায় এবং বীজের সঞ্চিত খাদ্য পাতা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় (৬ থেকে ১২ দিন)। এর পর (৬ থেকে ১২ দিন) বর্ধনশীল পাতায় সালোকসংশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন খাদ্য বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগে। ১২ থেকে ১৪ দিন পরে পাতার ক্ষেত্রফল (leaf area) বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলে সালোকসংশ্লেষণের হারও বৃদ্ধি পায় এবং তখন মূল, কাণ্ড ও পাতার বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে।

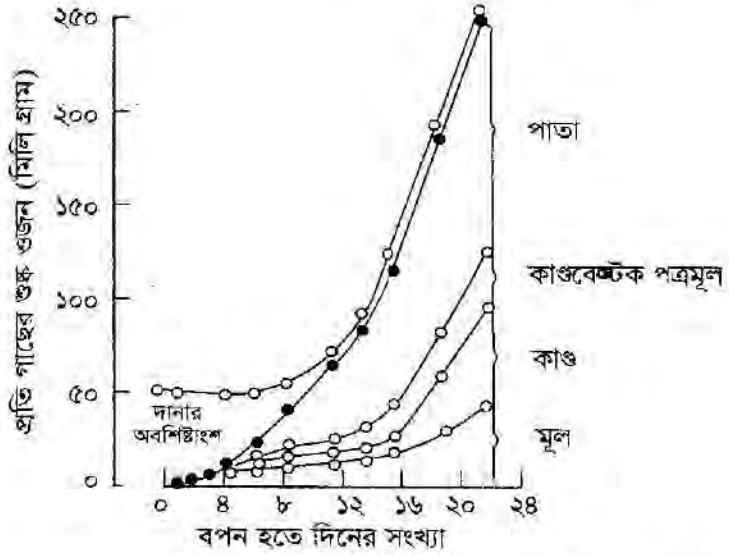

চিত্র ৪.৩ : বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে গম গাছের প্রধান প্রধান অঙ্গের শুষ্ক ওজন

বৃদ্ধি রেখাচিত্র

চিত্র ৪.২-এ যবের বৃদ্ধি রেখাচিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো যে, প্রাথমিক পর্যায়ে আকার বৃদ্ধি খুবই মন্থর। তারপর কিছুকাল আকার (উচ্চতা ও শুষ্ক ওজন) খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে বৃদ্ধির গতি কমে যায়। উদ্ভিদ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লিখিত তিনটি সময়কে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধি বীজে সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ দ্বারা সীমায়িত থাকে। যখন চারাগাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূল ও পাতা তৈরি হয়ে সালোকসংশ্লেষণ ও অন্যান্য উপচিতীয় প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়, তখন বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হয়। উচ্চ হারে বিপাকক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য চলেনা, একসময় এর গতি শ্লথ হয় এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। কি কারণে বৃদ্ধির গতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সে সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট নয়, তবে কতগুলো কারণে এরকম হয় বলে অনুমান করা হয়। যেমন- প্রয়োজনীয় বিপাকীয় বস্তুর জন্য প্রতিযোগিতা, বৃদ্ধিকর পদার্থ, পানি, আলো অথবা বৃদ্ধিরোধক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ অথবা বর্জ্য পদার্থ সঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি।

চিত্র ৪.২-এ ন্যায় আকারবিশিষ্ট বৃদ্ধি রেখাচিত্র অনেক উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ অঙ্গে পাওয়া গেছে। যবের বৃদ্ধির রেখাচিত্র উদ্ভিদের পৃথক পৃথক কলা ও অঙ্গের সমষ্টি মাত্র। চিত্র ৪.২-এ যদিও গম গাছের পাতা, কাণ্ড ও মূলের প্রাথমিক বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে, তবে এসব অঙ্গের বৃদ্ধি রেখাচিত্র সম্পূর্ণ গাছের রেখাচিত্রের মতোই হবে।

বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাকে বিলম্বকাল (lag period) বলে। বৃদ্ধির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাকে বৃদ্ধির সমগ্রকাল (grand period of growth) বলে। বৃদ্ধির সমগ্রকালের রেখাচিত্র অনেকটা ইংরেজি S অক্ষরের মতো। একে বৃদ্ধির সিগময়েড রেখাচিত্র বলে।

বৃদ্ধি বিশ্লেষণ (Growth analysis)

উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে কতগুলো উপাদানে (component) বিভক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিকে বৃদ্ধি বিশ্লেষণ বলে। বৃদ্ধি বিশ্লেষণে কেবল উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের ও সমগ্র উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন ও সবুজ পাতার ক্ষেত্রফলের প্রয়োজন হয়। কয়েকদিন অন্তর অন্তর শুষ্ক ওজন ও পাতার ক্ষেত্রফল সংগ্রহ করা হয়। বৃদ্ধি উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (Relative growth rate অথবা RGR) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো উদ্ভিদের প্রতি একক সময়ে প্রতি একক শুষ্ক ওজনের উপস্থিতিতে যে পরিমাণ শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি পায় তাকে আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার বলে।

$$RGR=\frac{\log_e W_2 - \log_e W_1}{t_2-t_1}$$

নিট আত্তীকরণ হার (Net assimilation rate অথবা NAR) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো উদ্ভিদের প্রতি একক সময়ে প্রতি একক সবুজ পাতার ক্ষেত্রফলের জন্য যে পরিমাণ শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি পায় তাকে নিট আত্তীকরণ হার বলে।

$$NAR=\frac{(W_2-W_1)(\log_e LA_2-\log_e LA_1)}{(LA_2-LA_1)(t_2-t_1)}$$

পত্র ক্ষেত্রফল অনুপাত (Leaf area ratio অথবা LAR) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো উদ্ভিদের পত্র ক্ষেত্রফল অনুপাত হলো সবুজ পাতার ক্ষেত্রফল ও উদ্ভিদের সমগ্র শুষ্ক ওজনের অনুপাত।

$$LAR=\frac{(\log_e W_2-\log_e W_1)(LA_2-LA_1)}{(W_2-W_1)(\log_e LA_2-\log_e LA_1)}$$

RGR, NAR এবং LAR নিম্নলিখিতভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত :

$$RGR=NAR \times LAR$$

পাতার ওজন অনুপাত (Leaf weight ratio অথবা LWR): কোনো উদ্ভিদের পাতার শুষ্ক ওজন ও সমগ্র উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের অনুপাতকে পাতার ওজন অনুপাত বলে।

$$LWR=\frac{\text{পাতার শুষ্ক ওজন}}{\text{সমগ্র উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন}}$$

সুনির্দিষ্ট পাতার ক্ষেত্রফল (Specificleaf area অথবা SLA) : কোনো উদ্ভিদের পাতার প্রতি একক শুষ্ক ওজনে কি পরিমাণ পাতার ক্ষেত্রফল আছে, তাকে সুনির্দিষ্ট পাতার ক্ষেত্রফল বলে।

$$SLA=\frac{\text{পাতার ক্ষেত্রফল}}{\text{পাতার শুষ্ক ওজন}}$$

LAR, LWR এবং SLA নিম্নলিখিতভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত :

$$LAR = SLA \times LWR$$

পাতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (Relative leaf growth rate অথবা RLGR) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো উদ্ভিদের প্রতি একক সময়ে প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফলের জন্য যে পরিমাণ পাতার ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়, তাকে পাতার আপেক্ষিক হার বলে।

$$RLGR = \frac{\log_e LA_2 - \log_e LA_1}{t_2 - t_1}$$

উল্লিখিত সমীকরণগুলোতে

W_1 = প্রথম বারে (t_1) উদ্ভিদের সমগ্র শুষ্ক ওজন,

W_2 = দ্বিতীয় বারে (t_2) উদ্ভিদের সমগ্র শুষ্ক ওজন,

LA_1 = প্রথম বারে (t_1) উদ্ভিদের সমগ্র পাতার ক্ষেত্রফল,

LA_2 = দ্বিতীয় বারে (t_2) উদ্ভিদের সমগ্র পাতার ক্ষেত্রফল,

$t_2 - t_1$ = দুই বারের মধ্যবর্তী সময়।

অঙ্গজ বৃদ্ধির প্রভাবক

উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি কতিপয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃদ্ধির উপর এসব প্রভাবকের পারস্পরিক ক্রিয়া খুবই জটিল।

ক. অভ্যন্তরীণ প্রভাবক

১. **বংশগতীয় নিয়ন্ত্রণ** (Genetic control) : উদ্ভিদের বৃদ্ধি বহুলাংশে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণ কথায় ক্রোমজমে অবস্থিত DNA অণুর একটি ক্ষুদ্রতম এককাকে জিন বলে। জিন প্রোটিন তথা এনজাইম সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এ এনজাইম সব প্রকার বিপাকীয় কার্যাবলির গতিকে ত্বরান্বিত করে পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে জাইগোট তৈরির সময়ই বংশগতীয় পূরক (complement) সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে কোষ বিভাজনের সময় বংশগতীয় বার্তা অপত্য কোষে স্থানান্তরিত হয়, তাই প্রতিটি কোষেই আদি বংশগতীয় পূরক থাকে। কখনো কখনো এ স্থানান্তরের সময় সামান্য ভুল হতে পারে (একে মিউটেশন বলে), এতে অবশ্য উদ্ভিদের গঠন খুব বেশি পরিবর্তিত হয় না।

বৃদ্ধির সময় পর্যায়ক্রমে কলা ও বিভিন্ন অঙ্গের যেমন- মূল, কাণ্ড, পাতা, পুষ্প) উৎপত্তি হয়, ফলে প্রতিটি উদ্ভিদ একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। একটি খেজুর গাছ থেকে আম গাছ সম্পূর্ণ পৃথক। জাইগোট তৈরির সময় পুং ও স্ত্রী জননকোষের মাধ্যমে যে বংশগতীয় পূরক একত্রিত হয়েছিল, তার জন্য আম গাছ থেকে আম গাছই হয়েছে। তবে পরিবেশের ভিন্নতার জন্য আম গাছের মধ্যে আবার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেয়।

২. **খাদ্য** : খাদ্যবস্তু থেকেই উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গঠনমূলক পদার্থ ও শক্তি সংগ্রহ করে। তাই বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের কোষগুলোতে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **হরমোন** : উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চম অধ্যায়ে হরমোনের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

খ. বাহ্যিক প্রভাবক

১. আলো : আলোর প্রখরতা, স্থিতিকাল এবং প্রকৃতির উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। যদিও উপরিলিখিত তিনটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, তবুও আলোচনার সুবিধার্থে পৃথকভাবে এদের বর্ণনা করা হলো।

আলোর প্রখরতা (Intensity) : সঞ্চিত খাদ্যের বিনিময়ে আলোর অনুপস্থিতিতেও উদ্ভিদের বৃদ্ধি চলতে পারে। অঙ্কুরোদ্গমিত বীজে এটি ভালভাবে দেখা যায়। আলোর অনুপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ ব্যাহত হয় বলে উদ্ভিদের পাতা হলুদ হয়ে যায়, পর্বমধ্য দীর্ঘ হয় এবং পাতার আকার ছোট হয়ে যায়। অপরপক্ষে, আলোর উপস্থিতিতে পর্বমধ্য খর্বকায় হয়, পাতা বৃহদাকার এবং সবুজ হয়। আলো প্রাথমিক অবস্থায় কোষ বিভাজনকে ত্বরান্বিত করে, তবে এটি কোষ বিভাজন এবং কোষ দীর্ঘীকরণকে কমিয়েও দেয়। আলোর প্রখরতা বৃদ্ধি পেলে পাতার পুরুত্ব (thickness) এবং প্রস্থ বেড়ে যায়, কিন্তু দৈর্ঘ্য কমে যায় বলে পাতার ক্ষেত্রফল কমে যায়। আলোর প্রখরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সালোকসংশ্লেষণের হারও বেড়ে যায়, ফলে অল্প পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণীয় বস্তু মূল, কাণ্ড ও পাতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।

আলোর স্থিতিকাল : প্রায় একশত বছর পূর্বেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে আলোর স্থিতিকালের সম্পর্ক আছে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গার্নার এবং অ্যালার্ড নামক দুজন মার্কিন উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, আলোর স্থিতিকালের উপর অধিকাংশ উদ্ভিদের পুষ্পায়ন নির্ভরশীল, একে ফটোপিরিয়ডিজম বলে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও অঙ্গজ থেকে জনন বৃদ্ধির স্থানান্তরের সাথে আলোর স্থিতিকাল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, তবুও অঙ্গজ বৃদ্ধিতেও এর প্রভাব আছে। যেমন– একটি গাছকে এমন আলোকপর্যায়ে জন্মানো হলো যাতে পুষ্পায়ন হয় না, সে অবস্থায় অঙ্গজ বৃদ্ধির স্থিতিকাল দীর্ঘায়িত হয়।

আলোর প্রকৃতি : উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে আলোর প্রকৃতি সম্পর্কযুক্ত। উদ্ভিদে কয়েক প্রকারের রঞ্জক পদার্থ আছে যা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে এবং এর ফলে বিভিন্ন আলোক প্রক্রিয়া, যেমন– সালোকসংশ্লেষণ, ফটোট্রপিজম, ফটোমরফোজেনেসিস ইত্যাদি আরম্ভ হয়। আলোক বর্ণালীর সাতটি রশ্মির মধ্যে নীল রশ্মি (৪০০ থেকে ৫১০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য) উদ্ভিদের কোষ বিভাজনের হার বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোষের আয়তন বৃদ্ধি করে না। আবার লাল রশ্মি কেবল কোষের আয়তন বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে।

২. তাপমাত্রা : উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপর তাপমাত্রার বেশ সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি বেশ মন্থর হয়, তারপর একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভিদ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। যে তাপমাত্রায় বৃদ্ধি খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে তাকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, যে তাপমাত্রায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয় তাকে সর্বোত্তম এবং যে তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয় তাকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্য উপরোক্ত তিনটি তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ কম তাপমাত্রাতেও ভালভাবে বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। সাধারণত ২৫° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

পৃথিবীর ও সূর্যের মধ্যে শক্তির বিনিময়ের ফলে দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকার তাপমাত্রার খুব বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মেঘমুক্ত দিনে বাতাস ও মৃত্তিকার উভয় তাপমাত্রাই দিনে বৃদ্ধি পায় ও দুপুরে সর্বোচ্চ হয় এবং বিকালের দিকে কমে যায়। দিনরাত্রি ২৪

ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ভূ-পৃষ্ঠে, সেখানে সকাল ছটায় ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে দুপুরে ৫০° সেলসিয়াস হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের ১০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার ঊর্ধ্বে দৈনিক তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫ থেকে ২০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। মৃত্তিকার তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি কম হয়, তবে মৃত্তিকার ১০ সেন্টিমিটার নিচেও দৈনিক তাপমাত্রা ৫° থেকে ১০° সেলসিয়াস হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকা রাত্রে বায়ুমণ্ডলে তাপ বিকিরণ করে।

মেঘাচ্ছন্ন দিনেও মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডলের দৈনিক তাপমাত্রার অনুরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তবে এ হ্রাস-বৃদ্ধির মাত্রা কম। মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা রাত্রে খুব কমে যায় না, কারণ মৃত্তিকা থেকে তাপ বিকিরণ করতে মেঘ বাধা প্রদান করে।

৩. **মৃত্তিকাস্থ পানি :** উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পানি একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান। পানির ঘাটতি হলে প্রোটোপ্লাজম অকেজো হয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার জীবজ ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। পানি কোষের রসস্ফীতিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। বৃদ্ধির জন্য কোষের স্ফীতি অবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। আবার মৃত্তিকায় পানির পরিমাণ বেশি হয়ে জলাবদ্ধতার (water logging) সৃষ্টি হলেও উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

উদ্ভিদ দেহ থেকে যাতে অতিরিক্ত পানি বের না হয়ে যায়, তার জন্য নানারকম বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন- ত্বকীয় কোষে কিউটিন বা সুবেরিনের স্তর, ত্বকীয় রোম, পুরু প্রাচীরযুক্ত ত্বকীয় কোষ, হ্রাসপ্রাপ্ত পত্র ক্ষেত্রফল ইত্যাদি। প্রধানত মূল কর্তৃক উদ্ভিদে পানি পরিশোষিত হয় এবং মূলতন্ত্রের আকার, মৃত্তিকায় এর বিস্তার এবং মূলরোমের সংখ্যা ইত্যাদি উদ্ভিদে কি পরিমাণ পানি পরিশোষিত হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার মৃত্তিকার কণার আকার, জৈবপদার্থ ও দ্রবণীয় লবণের পরিমাণ এবং পানির পরিমাণের উপরও উদ্ভিদে কি পরিমাণ পানি পরিশোষিত হবে তা নির্ভর করে। যেমন- ক্লে (clay) মৃত্তিকা কিংবা জৈব পদার্থসমৃদ্ধ মৃত্তিকার তুলনায় বেলে মাটি থেকে উদ্ভিদ কম পরিমাণ পানি পরিশোষণ করতে পারে। স্থায়ী উইলটিং পরাসেনটেজ এবং ফিল্ড ক্যাপাসিটির মধ্যবর্তী পরিমাণ পানিই কেবল উদ্ভিদ পরিশোষণ করতে পারে। কৈশিক পানি চলাচল শূন্য অবস্থায় কোনো ভেজা মৃত্তিকা সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পানি ধারণ করতে পারে, তাকে ফিল্ড ক্যাপাসিটি বলে। বেলে মাটির ফিল্ড ক্যাপাসিটি ৫% (মৃত্তিকার শুষ্ক ওজনের ৫%) হতে পারে এবং ক্লে মৃত্তিকার ফিল্ড ক্যাপাসিটি ৪৫% পর্যন্ত হয়। মৃত্তিকায় যে পরিমাণ পানি থাকলে উদ্ভিদ স্থায়ীভাবে মিইয়ে পড়ে, তাকে স্থায়ী উইলটিং পয়েন্ট বলে।

৪. **অক্সিজেন :** উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন তাই অক্সিজেন শ্বসনের মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৫. **কার্বন ডাই-অক্সাইড :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৬. **খনিজ লবণ :** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ১৭টি মৌল উপাদানের প্রয়োজন। এ অধ্যায়ের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অঙ্গজ বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য হলো উদ্ভিদের নতুন উপাদানের সংশ্লেষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে মূল, কাণ্ড ও পাতার বর্ধন। বর্ধনশীল উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কার্বন কাঠামো তৈরি হয় যা অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, ফসফোলিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, শর্করা, অন্যান্য সাইটোপ্লাজমীয় ও গঠনগত উপাদানে সংযোজিত হয়। এসব বিপাকীয় প্রক্রিয়াসমূহের জন্য প্রচুর পরিমাণ অজৈব মৌল উপাদানের প্রয়োজন হয়।

জনন বৃদ্ধি (Reproductive growth)

অঙ্গজ বৃদ্ধি থেকে জনন বৃদ্ধির প্রারম্ভ অনেক উদ্ভিদের জীবনচক্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। বর্ষজীবী উদ্ভিদে এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পুষ্পারম্ভ হলেই পাতা উৎপাদনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং কতিপয় পরিবর্তনের সূচনা করে, বীজ উৎপাদন ও উদ্ভিদটির মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদে (perennial) পুষ্পারম্ভ হলেও একই সাথে অঙ্গজ বৃদ্ধি ও জনন বৃদ্ধি চলতে থাকে।

সাধারণভাবে জনন বৃদ্ধি চিন্তা করলে পুষ্প ও ফল উৎপাদন মনে আসে। কারণ এ ঘটনাগুলো খালি চোখেই দৃষ্টিগোচর হয়। এসব ঘটনা অবশ্য কতকগুলো আণুবীক্ষণিক ঘটনার ফল। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ :

(১) প্ররম্ভিক পুষ্পের সূচনা, (২) মুকুলের বিকাশ, (৩) পুষ্পীয় অংশের (বৃত্যংশ, দল, পুংকেশর, গর্ভকেশর ইত্যাদি) বিকাশ ও পরিপক্বতা, (৪) নিউক্লিয়াসসহ (সঙ্গীকোষ, ডিম্বাণু, অ্যান্টিপোডাল কোষ) ভ্রূণস্থলীর বিকাশ, (৫) পরাগাধানীর মধ্যে পরাগরেণুর উৎপাদন, (৬) পুষ্প বিকশিত হওয়া, (৭) পরাগায়ন, (৮) গর্ভমুণ্ড থেকে গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয় ডিম্বাণু পর্যন্ত পরাগনালির বৃদ্ধি, (৯) পরাগনালিতে জনন নিউক্লিয়াস থেকে দুটি পুংজনন কোষের উৎপত্তি, (১০) নিষেক ক্রিয়া, (১১) জাইগোট থেকে ভ্রূণের উৎপত্তি,(১২) প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস থেকে সস্যের উৎপত্তি, (১৩) ডিম্বাণু থেকে বীজের উৎপত্তি, (১৪) ফলের উৎপত্তি এবং (১৫) ফলের পরিপক্বতা।

এটি সুস্পষ্ট যে, জনন বৃদ্ধি খুবই জটিল এবং এটি বহিঃঅঙ্গসংস্থা, শারীরস্থান, শারীরতাত্ত্বিক এবং প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর সমষ্টি। পুষ্পায়নের উপর আলোর সময়সীমা (ফটোপিরিয়ডিজম) এবং তাপমাত্রার প্রভাব (ভার্নালাইজেশন) পরবর্তী অধ্যায় দুটিতে আলোচিত হয়েছে।

ফলের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা (Fruit growth and ripening)

বীজের বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ভাশয়ের চতুষ্পার্শ্বের কলাও বৃদ্ধি পায়, পরিণত হয় এবং কয়েক প্রকার শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন শুরু হয়। শুরুতে গর্ভাশয় বর্ধিত হয়, যেমন- ড্রুপজাতীয় ফলে অতিরিক্ত কলাও (যেমন- আপেলে থ্যালামাস) বর্ধিত হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্যই শাঁসালো ফলের উপর অধিকাংশ শারীরতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, শাঁসালো ফলের বৃদ্ধির কার্ভ হয় সিগময়েড (যেমন- টমেটো, আপেল, পেয়ার) অথবা দ্বৈত কার্ভ (যেমন–আঙুর, প্লাম, এপ্রিকট) প্রকারের। শেষোক্ত প্রকারে দুটি দ্রুত বৃদ্ধি দশা আছে এবং এদের মাঝে আছে অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি দশা। দুটি দ্রুত বৃদ্ধি দশার মধ্যে, দ্বিতীয়টিতে সস্য ও ভ্রূণের সক্রিয় বৃদ্ধি ঘটে।

ভ্রূণতাত্ত্বিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, কতিপয় প্রজাতিতে ফলের বৃদ্ধির সাথে গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগরেণুর অঙ্কুরোদ্গম এবং পরবর্তীকালে পরাগনালির বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। বর্তমানে এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে, ফলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পরাগায়ন অত্যাবশ্যক। উপরন্তু, এরজন্য ফলের অভ্যন্তরে বর্ধনশীল বীজেরও প্রয়োজন। ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ নিচচ (Nitsch) স্ট্রবেরিতে চিত্তাকর্ষক মাইক্রোসার্জিক্যাল পরীক্ষা করেছেন। সাধারণভাবে বলা হয় যে, অঙ্কুরিত পরাগনালি গর্ভাশয়ে অক্সিন সরবরাহ করে এবং গর্ভাশয়ে ক্রমাগত অক্সিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। অধিকন্তু, নবীন বর্ধনশীল বীজেও প্রচুর পরিমাণে অক্সিন থাকে। নিচচ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, বীজ অপসারণ করলে ফলের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

পার্থেনোকার্পিক ফলের ক্ষেত্রে, বীজের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু অপরিণত ডিম্বকে পূর্ণ থাকে। এখানে গর্ভাশয় স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় যদিও কোনো পরাগায়ন অথবা নিষেক হয় না। আঙুর, কলা, আনার ইত্যাদিতে পার্থেনোকার্পি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কতিপয় কিউকারবিট এবং সোলানেসীয় ফলকে পরাগায়ন ছাড়াই অক্সিন অথবা GA_3 প্রয়োগ করে পার্থেনোকার্পিক করা যায়।

ফলের বৃদ্ধির সময় পাতা, কাণ্ড, মূল ইত্যাদি অঙ্গ থেকে মেটাবোলাইটস ফলে পরিবাহিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কোষ বিভাজন হয় এবং নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইনিন ও জিব্বারেলিনের সংশ্লেষ হয়। কোষ বিভাজনে সাইটোকাইনিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোষের বিভাজনের পর কোষ দীর্ঘীকরণ পর্যায়ে IAA এবং GA এর গুরুত্বই বেশি।

ফল ভক্ষণের উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছতে কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে, যেমন– কোষ বিভাজন, কোষ দীর্ঘীকরণ, পরিণত হওয়া এবং পরিপক্বতা। প্রাথমিক অবস্থায় দ্রুত কোষ বিভাজন হয় ও এর পরেই হয় কোষ দীর্ঘীকরণ। তারপর সাইটোপ্লাজম কোষের প্রান্তে চলে যায় এবং কেন্দ্রে যে বৃহৎ কোষ-গহ্বর তৈরি হয় তা চিনিতে পূর্ণ হয় এবং পরে স্টার্চের পরিমাণও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ফল পরিণত হয় এবং তারপর পরিপক্বতার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সর্বশেষ পর্যায় হলো ফলের বার্ধক্যপ্রাপ্তি এবং এসময় ফল নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। দুপ্রকার ফল খুব বেশি পাওয়া যায়, যথা– বেরি ও ড্রুপ। একটি গর্ভাশয় থেকে এদের উৎপত্তি হয়। ড্রুপে (যেমন– নারকেল, আম ইত্যাদি) অন্তঃত্বক (endocarp) শক্ত থাকে। কখনো কখনো একটি ফুলের কয়েকটি গর্ভাশয় একত্রিত হয়ে যৌগিক ফলের সৃষ্টি করে, যেমন– কাঁঠাল।

ফলের বৃদ্ধির সময় রাসায়নিক পরিবর্তন

বর্ধনশীল ফলে কয়েক প্রকার মেটাবোলাইট পাওয়া গেছে। এছাড়া রঞ্জক এবং আস্বাদজনিত পরিবর্তন হয়।

ক. কার্বোহাইড্রেট এবং নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ

প্রায় সব কচি ফলেই প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে যা চিনির সংশ্লেষণে সহায়তা করে। ফলের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এই চিনির দরকার হয়। অধিকন্তু, অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট আসে পাতা থেকে। নাইট্রোজেনঘটিত যৌগেরও একই অবস্থা হয়। কচি ফলে যে কার্বোহাইড্রেট জমা হয় তা শ্বসনের সাবস্ট্রেট হিসেবে কাজ করতে পারে, জৈব অ্যাসিড তৈরি করতে পারে অথবা ফ্যাট স্টার্চ অথবা এমনকি সেলুলোজের জৈব সংশ্লেষণে অংশ নিতে পারে। সাইট্রিক এবং ম্যালিক অ্যাসিড থাকায় অনেক কচি ফল অম্ল স্বাদের হয়। তবে পরিপক্বতার সাথে সাথে এদের পরিমাণও কমে যায়। বিভিন্ন ফলে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড থাকে। অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার জন্যও ফলে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড তৈরি হতে পারে। ফলের প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়। ফলে বৃদ্ধির সাথে প্রোটিন সংশ্লেষণও সক্রিয় হয়। অনেক রসালো ফলে স্টার্চের পরিমাণও বেড়ে যায়। পরিপক্বতার পর্যায়ে স্টার্চের পরিমাণ হ্রাস পায়। বিভিন্ন প্রজাতির ফলে বিভিন্ন প্রকার চিনি থাকে। কমলা, আঙুর ইত্যাদি পরিপক্ক ফলে জৈব অ্যাসিড কমে যায় এবং চিনি বেড়ে যায়, কিন্তু লেবুর ক্ষেত্রে এটি হয় না।

খ. রঞ্জক দ্রব্যের পরিবর্তন

ফলের পরিণত অবস্থায় ক্লোরোপ্লাস্ট কমতে থাকে এবং ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্যারোটিনয়েড বাড়তে থাকে। পরিপক্ব ফলে রঙ নির্ভর করে ক্যারোটিনয়েড-এর প্রকার ও মাত্রার উপর। আলোর উপস্থিতিতে অ্যান্থোসায়ানিনেরও পরিবর্তন হয়।

গ. আস্বাদ-সৃষ্টিকারী যৌগ

মূলত আস্বাদ-সৃষ্টিকারী যৌগ হলো অ্যারোমেটিক ইস্টার, কার্বোঅক্সাইল যৌগ, অ্যালকোহল ইত্যাদি। তবে অ্যামাইল এসিটেটের জন্য কলার এবং টারপেনয়েড, কমারিন ইত্যাদির জন্য লেবুর গন্ধ হয়। আস্বাদ এবং গন্ধ ফলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য।

পরিপক্ব ফলের রাসায়নিক গঠনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আপেল, খেজুর, আম, কলা প্রভৃতি ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট আছে, আবার জলপাই, অ্যাভোকেডো প্রভৃতিতে ফ্যাট জমা থাকে। লেবুজাতীয় ফলে জৈব অ্যাসিড আছে; এগুলো হলো সাইট্রিক, ম্যালিক (আপেলে) অথবা টারটারিক অ্যাসিড (আঙুর)। সাধারণত ফলে কম পরিমাণে প্রোটিন থাকে।

ফলের পরিপক্বতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফল কতিপয় বৃদ্ধির পর্যায় অতিক্রম করে এবং এদের একটি হলো পরিপক্বতা। প্রকৃতপক্ষে, যেসময়ে ফলে বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় ঠিক তারপর থেকেই পরিপক্বতা আরম্ভ হয়। ফল পরিণত হলেই গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরিপক্বতা হলো ফল ভক্ষণের একটি অবস্থা।

ফলের পরিপক্বতার সাথে সাথে রঙ, আস্বাদ এবং গন্ধের পরিবর্তন হয়। এসময়েই ফল ভক্ষণের উপযুক্ত হয়। ফলের পরিপক্বতা এক প্রকার বার্ধক্যপ্রাপ্তি। গাছ থেকে সংগ্রহের পর অনেক ফলের পরিপক্বতা ঘটে অথবা এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এসময় পর্যায়ক্রমিকভাবে কিছু কিছু প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। তবে এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। ফলের পরিপক্বতাকে প্রভাবিত করে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

ক্লাইম্যাকটেরিক (Climacteric) : ফলের পরিপক্বতার সময় দৃশ্যমান পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্বসনের হারও দ্রুত বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ক্লাইম্যাকটেরিক এবং অনেক রসালো ফল, যেমন- আপেল, কলা, এপ্রিকট ইত্যাদিতে এটি বেশ সুস্পষ্ট। ডুমুর অথবা চেরির মতো ফলে এটি অনুপস্থিত। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সেসব ফলে ক্লাইম্যাকটেরিক অনুপস্থিত তাদের শ্বসন হার কম। প্রকৃতপক্ষে, কতগুলো যৌগিক ফলের শ্বসনের হার বেশ উচ্চ। সাধারণত ক্লাইম্যাকটেরিক ফল ক্যারোটিনয়েড-সমৃদ্ধ, কিন্তু নন-ক্লাইম্যাকটেরিক ফলে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে। আপেলে ক্লাইম্যাকটেরিক শুরু হলে ফসফোরাইলেশনের জন্য সাইটোপ্লাজম থেকে মুক্ত ফ্লুক্টোজের অবলুপ্তি হয়। একইসাথে টনোপ্লাস্টের ভেদ্যতার পরিবর্তন হয় যা স্বভাবতই কোষ-গহ্বর থেকে সাইটোপ্লাজমে ফ্লুক্টোজ চলাচলে সাহায্য করে। এ কারণে শ্বসনের হার বেড়ে যায়। বিকল্প ব্যাখ্যা হলো যে, ADP দ্বারা শ্বসনের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ATP/ADP অনুপাত বেশি হলে শ্বসনের হার কমে যায়। ফলের পরিপক্বতার প্রাথমিক পর্যায়ে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় বলে শ্বসনের ক্লাইম্যাকটেরিক বৃদ্ধি বেশি হয়। যখন ATP ভেঙে যায় এবং ADP বেড়ে যায়, তখন শ্বসনের হারও বেড়ে যায়। টমেটোর ফলে ২, ৪ ডিএনপি (2,4-DNP) প্রয়োগ করলে পরিপক্বতা বাধাগ্রস্ত হয়।

RNA বিপাক

ট্রেসার পদ্ধতি ব্যবহার করে জানা গেছে যে, পরিপক্কতার সময় কতগুলো ফলের RNA সংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়। আপেলের ক্লাইম্যাকটেরিক বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে RNA এর পরিমাণ প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যায়। কিন্তু যখন ক্লাইম্যাকটেরিক খুব বেশি হয়, তখন RNA সংশ্লেষণ খুব বেশি হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় ফলের পরিপক্কতার জন্য নতুন RNA সংশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। RNA এর পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রোটিনের পরিমাণও বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অনেক ফলের পরিপক্কতার জন্য নতুন প্রোটিন অত্যাবশ্যক। পরিণত, কিন্তু অপক্ক কলাও পেয়ার-এ সাইক্লোহেক্সিমাইড প্রয়োগে পরিপক্কতা চলতে পারে না, বিশেষ করে এটি যদি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। ধারণা করা হয় যে, ফল পরিপক্কতার জন্য এনজাইমগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হয়।

এনজাইম

ফলের পরিপক্কতার সময় কতগুলো এনজাইমের ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। সাধারণত কতিপয় হাইড্রোলয়টিক এনজাইম বৃদ্ধি পায়।। এগুলো হলো পলিগ্যালাকটুরোনেজ, সেলুলেজ, পেকটিন মিথাইল ইস্টারেজ ইত্যাদি। কতগুলো এনজাইম ফলকে নরম করে এবং এর জন্য ফলের স্বাদেরও পরিবর্তন হয়। স্টার্চ ভেঙে চিনি তৈরি হওয়ার জন্য কতগুলো ফল মিষ্টি হয়। কোনো কোনো ফলে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। তবে ফলের পরিক্কতায় কতিপয় এনজাইমের গুরুত্ব সুস্পষ্ট নয়। এদের মধ্যে আছে লাইপোঅক্সিডেজ এবং পারঅক্সিডেজ। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, ইথিলিনের জৈব-সংশ্লেষণে এই এনজাইমগুলো অংশগ্রহণ করে। কখনো কখনো বিভিন্ন প্রকার আইসোজাইমও ফলের পরিক্কতায় অংশ নেয়। ক্লোরোফাইলেজ এবং কাইপেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যথাক্রমে ক্লোরোফিল এবং মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ভাজান হয়। কোনো কোনো ফলে গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র এবং হেক্সোজ মনোফসফেট সান্ট-এ অংশগ্রহণকারী এনজাইমের পরিমাণও বেড়ে যায়।

রঞ্জকদ্রব্য তৈরি

পরিপক্কতার সময় ফলের রঙেরও নাটকীয় পরিবর্তন হয়। যেমন- টমেটোতে নিম্নলিখিত রঙের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন হয় :

সবুজ-সাদা-হলুদ-কমলা-লাল

লাইকোপেনের জন্য টমেটোর রঙ লাল হয়। ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হলে ক্যারোটিয়েড তৈরি হয়। তবে ক্যারোটিনয়েড তৈরির সাথে সব প্রকার ফলের রঙের সম্পর্ক নেই। অপরদিকে, অনেক ফলে, যেমন- আপেল, পরিপক্কের সময় অ্যান্থোসায়ানিন তৈরি হয়। বর্তমানের ধারণা এই যে, ফাইটোক্রোম সিস্টেম ফল পরিপক্কের সময় ক্যারোটিনয়েড এবং অ্যান্থোসায়ানিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ফলের পরিপক্কতার উপর পটাশিয়াম পুষ্টির প্রভাব

অধিকতর পটাশিয়াম পুষ্টির জন্য টমেটোর ফলে জৈব অ্যাসিড, বিশেষ করে সাইট্রিক ও ম্যালিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, টমেটো হলো একটি ক্লাইম্যাকটেরিক ফল, তাই ক্লাইম্যাকটেরিক পূর্ব শ্বসনের হার সর্বনিম্ন ; এরপর এই হার দ্রুত বেড়ে পূর্বের তুলনায় শতকরা ১০০ থেকে ২৫০ ভাগ বেড়ে যায়। টমেটো গাছে উচ্চ মাত্রায় পটাশিয়াম প্রয়োগ করলে এর শ্বসনের হার কম হয়, বিশেষ করে ক্লাইম্যাকটেরিক পর্যায়ে।

অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিমাণ পটাশিয়ামের জন্য বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির কারণ হলো ম্যালিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজের প্রভাবে ম্যালিক অ্যাসিডের জারণ। গ্লুটামিক অ্যাসিডের সাথে ট্রান্সমিনেশনের মাধ্যমে অন্তঃস্থ অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পাকা আমে অ্যাসপারটিক এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড হ্রাস পায়, কিন্তু আলফা-অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড বেড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ফলের পরিপক্বের সময় প্রোটিন সংশ্লেষণও হ্রাস পায়।

ফল পরিপক্বতায় হরমোনের নিয়ন্ত্রণ

পাঁচরকম উদ্ভিদ হরমোনই ফলের পক্বতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে ফলে IAA এর উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কচি বীজ হলো IAA সংশ্লেষণের প্রধান স্থান এবং পরিণত ফলে এটি তৈরি হয় ফলের মাংসল অংশে। প্রকৃতপক্ষে, কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত, অক্সিন ফল পরিপক্বতার হারকে হ্রাস করে। সম্ভবত ফলে ইথিলিন সংশ্লেষণে অক্সিন বাধা দেয়। বস্তুত, কতগুলো এনজাইম, যেমন-IAA অক্সিডেজ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তঃস্থ অক্সিনের মাত্রাকে লঘুকরণ করে ফলের পক্বতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অক্সিনের মাত্রা কম হলেই ফলের কলা ইথিলিনে সংবেদনশীল হয়।

ফলে অন্তঃস্থ সাইটোকাইনিনের পরিমাণ এবং এর বিপাক সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা গেছে। পাতায় এদের কার্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ফলে এরা প্রোটিনসহ ক্লোরোফিলের মাত্রা অপরিবর্তনশীল রাখে।

অক্সিন এবং সাইটোকাইনিনের মতো জিব্বারেলিনেরও ফলের পরিপক্বতার উপর প্রভাব আছে। এ বিষয়ে অধিকাংশ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে টমেটোর উপর। এক্ষেত্রে জিব্বারেলিক অ্যাসিড ক্লোরোফিল বিনষ্টকরণে বাধা দেয় এবং ক্যারোটিনয়েড জমাকরণকে বিলম্বিত করে, তাই রঞ্জক দ্রব্য দেরিতে তৈরি হয়। একইভাবে কলাতে জিব্বারেলিক অ্যাসিড স্প্রে করলে কলা হলুদ হয় না, যদিও অন্যান্য প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলে।

অনেক ফলে পরিপক্বতার পূর্বে ABA জমা হয়। সম্ভবত এই হরমোনও ফল পরিপক্বতা নিয়ন্ত্রণ করে। সংগ্রহের এক সপ্তাহ পর আপেলে ABA এর পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায়। সবুজ টমেটোর মাংসল অংশের ভিতরের দিকে ABA এর মাত্রা খুব বেশি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টমেটো কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) দিক বরাবর পাকতে শুরু করে এবং এই অবস্থা অগ্রসর হতে থাকলে উপরোক্ত সম্পর্কেরও বিপরীত অবস্থা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে যে, লাল আলোর প্রভাবে প্রথম কয়েকদিন টমেটোতে ABA এর পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং তারপর হ্রাস পায়। ধারণা করা হয় যে, ABA লাইকোপেন সংশ্লেষণকে উদ্দীপিত করে।

ফলের পরিপক্বতার ক্ষেত্রে ইথিলিন একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। ইথিলিনের অনুপস্থিতিতে ফল পরিপক্ব হতে ব্যর্থ হয়। সম্ভবত ইথিলিন ক্লাইম্যাকটেরিক ঘটায়। একইভাবে, নন-ক্লাইম্যাকটেরিক ফলে ইথিলিন প্রয়োগ করলে শ্বসনের হার বেড়ে যায়। সম্ভবত ইথিলিন তৈরির জন্য ক্লাইম্যাকটেরিক এবং নন-ক্লাইম্যাকটেরিক ফলকে পার্থক্য করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, IAA অক্সিডেজ দিয়ে অক্সিনকে বিনষ্ট করলেই ফলের পরিপক্বতাকে ত্বরান্বিত করা যায়। আলোও ইথিলিন তৈরিকে প্রভাবিত করে। যেমন-লাল আলো ইথিলিন তৈরিকে প্ররোচিত করে, কিন্তু অধিকলাল আলো মন্থর করে। স্বভাবতই, ফলের পরিপক্বতা একটি জটিল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া বলেই প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য যে, উদ্ভিদে ইথিলিন তৈরি কেবল আলো দ্বারাই প্ররোচিত হয় না। উদ্ভিদের কলা আঘাত পেলে অথবা রোগাক্রান্ত হলে অথবা ভৌত এবং রাসায়নিক পীড়নের (stress) জন্যও ইথিলিন তৈরি হয়। এমনকি কতগুলো ধাতুর আয়ন, যেমন- তামা ও ক্যালসিয়াম ইত্যাদির প্রভাবেও ইথিলিন তৈরি হয়।

ফলের মাংসল অংশ নরমকরণ

ফলের পরিপক্বতার সময় অদ্রবণীয় প্রোটোপেকটিন দ্রবণীয় পেকটিক যৌগে পরিণত হয়। এনজাইমের মাধ্যমে এটি ঘটে। নরমকরণের বিস্তারিত কৌশল এখনও জানা সম্ভব হয়নি। পরিপক্বতার সময় পলিমার শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, কার্বোঅক্সাইল গ্রুপের ডিমিথাইলেশন হয় এবং হাইড্রোঅক্সাইল গ্রুপের ডিঅ্যাসিটাইলেশন হয়। এগুলো কোষপ্রাচীরের উপাদান, যেমন- সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ-এর বন্ধনীর পরিবর্তনের মাধ্যমে কোষ-প্রাচীরের দৃঢ়তাকে প্রভাবিত করে।

কার্বোহাইড্রেট

অধিকাংশ ক্লাইম্যাকটেরিক ফলে স্টার্চ সঞ্চিত হয়। এনজাইমের প্রভাবে এগুলো ভেঙে দ্রবণীয় চিনিতে রূপান্তরিত হয়। এর জন্য ফল মিষ্টি হয়।

তিক্ততার অবসান

কতিপয় অপক্ব ফলে (যেমন- কলা, সবেদা), প্রোটিনের সাথে বিক্রিয়া করে, নিম্ন আণবিক ওজনের ট্যানিন (পলিফেনল) থাকে। তাই এসব ফল তিক্ত স্বাদের হয়। পরিপক্বতার সময় পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে ট্যানিন বৃহৎ অণুতে পরিণত হয়, প্রোটিনের সাথে বিক্রিয়ার ক্ষমতা হারায় এবং ফলের তিক্ততা হ্রাস পায়।

জৈব অ্যাসিড

জৈব অ্যাসিডের জন্য ফল অম্লস্বাদের হয়। চিনি এবং অ্যাসিডের অনুপাতের উপর এই স্বাদ নির্ভরশীল। পরিপক্বতার সাথে সাথে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ কমতে থাকে। তবে কলাতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়।

সুঘ্রাণ

পরিপক্ব ফলের সুঘ্রাণ হয়। এনজাইমের মাধ্যমে কতগুলো উদ্বায়ী রাসায়নিক যৌগের সংশ্লেষণ এবং নিঃসরণের জন্য ফলের সুঘ্রাণ হয়। এই উদ্বায়ী রাসায়নিক যৌগের মধ্যে আছে ইস্টার,ল্যাকটোন, অ্যালকোহল, অ্যাসিড, অ্যালডিহাইড, কিটোন, ফিনল, ইথার ইত্যাদি।

ফলের নিয়ন্ত্রিত পরিপক্বতা

গাছ থেকে সংগ্রহ করা মানেই একটি ফলের জীবন-সীমার পরিসমাপ্তি নয়। প্রস্বেদন, শ্বসন, আঘাত, পচন এবং শারীরবৃত্তীয় ভাঙনকে নিয়ন্ত্রণ করে কতগুলো ফলকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সাফল্যের সাথে সংরক্ষণ করা যায়। ফলের বিপাকের হারকে মন্থর করার জন্য কতকগুলো শারীরবৃত্তীয় এবং রাসায়নিক এজেন্ট ব্যবহার করা হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় রাখলে ফলের সংরক্ষণের সময়সীমা বেড়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রা দু'ভাবে কাজ করে— শ্বসনের হার মন্থর করে এবং অণুজীবের বৃদ্ধি রোধ করে। অন্তঃস্থ ইথিলিন তৈরিকেও তাপমাত্রা প্রভাবিত করে।

সম্প্রতি নিম্ন তাপমাত্রার সাথে বায়বীয় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে উচ্চ গুণগতমানের ফল সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আপেল, কমলা ইত্যাদি ফল সংরক্ষণে এই পদ্ধতি সাফল্যের সাথে

ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বায়ু কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় অথবা অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। একইভাবে কতগুলো ফল নিম্ন চাপে সংরক্ষণ করা হয়। এটি দীর্ঘকালীন ফল সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ইথিলিন অপসারণ করা হয় এবং অক্সিজেনের আংশিক চাপ হ্রাস করা হয়। এজন্য পরিপক্বতার হার মন্থর হয়। নিম্নমাত্রার গামা-রশ্মি প্রয়োগ করেও আম, পেঁপে, কলা ইত্যাদি ফলের সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যায়। কখনো কখনো ফল সংরক্ষণের জন্য ফলকে মোমের ইমালশন অথবা প্লাস্টিক ফিল্মে ডোবানো হয়। জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করেও পরিপক্বতাকে বিলম্বিত করা যায়।

কৃত্রিমভাবে ফল পাকানো

আম, টমেটো, কলা ইত্যাদি ফলকে পাকানো এবং কমলালেবুর সবুজ রঙ বিমোচনের জন্য বর্তমানে ইথিলিন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইথিলিন ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর উপর তাপমাত্রার প্রভাব আছে। এই গ্যাসের প্রভাবে ক্লোরোফিল অপসারিত হয় বলে ফলের হলুদ এবং কমলা রঙ প্রকাশ পায়। কোনো কোনো ফলে এই রঞ্জকগুলোর সংশ্লেষণও হয়। যেসব ফলে সুস্পষ্ট ক্লাইম্যাকটেরিক আছে, তাদের প্রাক-ক্লাইম্যাকটেরিক পর্যায়ে ০.১ থেকে ১০০ পিপিএম ইথিলিন কার্যকর। ইথিলিনের কতগুলো উৎস আছে, যেমন- ইথ্রিল, CPTA ইত্যাদি। কৃত্রিমভাবে কলা ও আম পাকানোর জন্য কখনো কখনো অ্যাসিটিলিন এবং কার্বন মনোঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়। গরম পানিতে ডোবালে আমের পরিপক্বতা দ্রুত হয় এবং রঙও আকর্ষণীয় হয়। এরজন্য অণুজীবের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। ফল পরিণত হওয়া এবং ফলের পরিপক্বতা দুটি ভিন্ন বিষয়। ফলের ভাল স্বাদের জন্য কেবল উপযুক্তভাবে পরিণত ফলকেই কৃত্রিমভাবে পাকানো উচিত।

স্ফীতকন্দ এবং বাল্বের বৃদ্ধি

কাণ্ড হিসেবে স্ফীত কন্দের এবং পাতার বৃন্তে স্ফীতি হিসেবে বাল্বের বৃদ্ধি প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় কার্বোহাইড্রেট এবং হ্যাটের সঞ্চয় ক্রিয়া এবং এসব অঙ্গের মেরুদেশীয়তা (polarity) নষ্টের মাধ্যমে। পাতায় প্রথমে এসব মেটাবোলাইট স্থানান্তর শুরু হয় এবং পরবর্তীতে স্ফীত অঙ্গে জমা হতে থাকে, যাকে উদ্ভিদের ফুল ও ফলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ফলের মতো অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন স্ফীত কন্দ এবং বাল্বেও হয়। এই সঞ্চয়ী অঙ্গ হলো স্ফীত কন্দ, বাল্ব, কর্ম এবং কাণ্ডের গোড়ার স্ফীত অংশ অথবা মূলের স্ফীত অংশ। গোলআলুর স্ফীত কন্দের বিকাশ শুরু হয় স্টোলনের (stolon) ঠিক নিচে অবস্থিত কর্টেকীয় কোষের দীর্ঘীকরণ এবং এর পরপরই কর্টেক্স কোষে মাইটোটিক কোষ বিভাজন হয় যা কন্দের বৃদ্ধি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলে। আলুর স্ফীত কন্দে পর্ব ও পর্বমধ্য আছে। স্টোলনের (যা অ্যাজিওট্রপিক কাণ্ড) অগ্রভাগে সাধারণত কন্দের বৃদ্ধি শুরু হয়। স্টোলনের মেরুদেশীয় দীর্ঘীকরণ হয় না এবং মৃত্তিকা বরাবর শায়িতভাবে বৃদ্ধি পায়। কচি পাতার গোড়ায় কার্বোহাইড্রেট জমাকরণের মাধ্যমে পিঁয়াজের বাল্বের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। শীর্ষস্থ ভাজক কলা এবং মূলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কচি পাতার পার্শ্বীয় স্ফীতির জন্য বাল্ব তৈরি হয়। বাল্বের অঙ্কুরোদ্গমের সময় মুকুলের শল্কপত্রে আবৃত কচি পাতার মাইটোটিক কোষ বিভাজন শুরু হয়। কন্দে প্রধানত স্টার্চ এবং কখনো কখনো ইনুলিন জমা থাকে। সুতরাং কন্দ তৈরি এবং স্টার্চ জমাকরণ দুটি পারস্পরিক নির্ভরশীল প্রক্রিয়া।

এটি জানা গেছে যে, পাতা থেকে কন্দে পরিবাহিত সুক্রোজ পরিশেষে স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। সুক্রোজ থেকে সুক্রোজ সিনথেটেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ইউরিডিন ডাইফসফেট

(UDP) থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়, যাকে স্টার্চ তৈরির অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর অ্যামাইলোজ সিনথেটেজের উপস্থিতিতে UDP গ্লুকোজ পলিস্যাকারাইড শৃঙ্খলের প্রান্তে যুক্ত হয়।

বিক্রিয়া ১ : সুক্রোজ + UDP + ATP $\rightleftharpoons$ UDP গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ+ADP

বিক্রিয়া ২ : UDP গ্লুকোজ + (গ্লুকোজ)$_n$ $\rightarrow$ UDP+(গ্লুকোজ)$_{n+১}$

বিক্রিয়া ১–এ যে ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় তা আবার ATP এর সাথে ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে প্রথমে গ্লুকোজ–১–ফসফেটে (হেক্সোকাইনেজের উপস্থিতিতে) পরিণত হয় এবং পরিশেষে আরো একটি ATP ব্যবহার করে UDP গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। স্টার্চ সংশ্লেষণে এটি ব্যবহৃত হয়। তাই এক অণু সুক্রোজ স্টার্চ দানায় দুটি অ্যামাইলোজ সংযোগ–এ রূপান্তরিত হয়।

সুক্রোজ +UDP+2ATP $\rightarrow$ ২ অ্যামাইলোজ সংযোগ+UDP+2ADP+2ip

অ্যামাইলোজ সিনথেটেজ এনজাইম ছাড়াও আরো দুটি এনজাইম স্টার্চ সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– গোলআলুতে এক প্রকার প্রারম্ভিক (starter) এনজাইম আছে যাকে ডি এনজাইম বলে। এর কাজ হলো সরল পলিস্যাকারাইড (যেমন– ম্যালটোট্রায়োজ) থেকে কতিপয় প্রাইমার (primer) তৈরি করা। অপর একটি এনজাইম, কিউ এনজাইম, অ্যামাইলোজ শৃঙ্খলের শাখাকরণকে ত্বরান্বিত করে।

গোলআলুর কন্দ তৈরির সময়, পাতা, কাণ্ড ও স্টোলনে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ সঞ্চিত হয়। স্টার্চ সঞ্চয় ছাড়াও, সঞ্চয়ী অঙ্গ, যেমন– কন্দ, বাল্ব, কর্ম এবং বর্ধিত কাণ্ডের প্রারম্ভের সময় অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি হ্রাস পায়; যেমন– পেঁয়াজের বাল্ব তৈরির সময় উদ্ভিদের ভূ-উপরিস্থ অংশের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। বৃদ্ধিকর হরমোন, যেমন– সাইটোকাইনিন, ইথিলিন, ABA এবং কতিপয় বৃদ্ধিরোধক দ্রব্যের প্রয়োগে কন্দের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এগুলো ছাড়াও, পরিবেশীয় প্রভাবক, যেমন– দিবাদৈর্ঘ্য, আলো এবং তাপমাত্রাও কন্দ এবং অন্যান্য সঞ্চয়ী অঙ্গের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সুক্রোজের মাত্রা বেশি হলেও, উপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্য না থাকলে কন্দের বৃদ্ধি হয় না, এর পরিবর্তে কাণ্ডের বৃদ্ধি বেশি হয়।

একটি এক্সোপোনেনশিয়াল কার্ভের আকারে কন্দের বৃদ্ধি অগ্রসর হয় ; মৌসুমের শেষের দিকে কন্দ-ভর্তি (filling) দ্রুত হয়। রসালো ফলের পরিপক্বতার মতোই কন্দের পক্বতার সময় নানারকম পরিবর্তন হয়। পক্বতার সময় চিনির পরিমাণ কমতে থাকে এবং স্টার্চের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এসময় শ্বসনের হার অপরিবর্তিত থাকে। গোলআলুর কন্দের প্রারম্ভের সময় স্টোলনের শীর্ষস্থ মুকুল মেরুপ্রবণতা হারায় এবং দৈর্ঘ্য বরাবর দীর্ঘীকরণের পরিবর্তে রেডিয়াল দিকে কোষ তৈরি শুরু হয়। এই মেরুপ্রবণতার পরিবর্তনের সাথে সাথে মজ্জা এবং কর্টেক্সীয় কোষ রেডিয়াল দিকে সম্প্রসারণ হতে থাকে। শীর্ষস্থ মুকুল কেন এরকম আচরণ করে তা জানা গেছে। উদ্ভিদকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় রাখলে মুকুলের এরকম আচরণ প্ররোচিত করা যায়। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, কন্দ তৈরির জন্য একপ্রকার পদার্থ দায়ী এবং এর জন্যই মুকুলের আচরণের পরিবর্তন হয়। সাইকোসিল (Cycocel, CCC) প্রয়োগের জন্য কন্দের প্রারম্ভ ও বৃদ্ধি প্ররোচিত হয়। উপরন্তু গোল কন্দের ভ্যারাইটিকে জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রদান করলে কন্দ লম্বা হয়ে যায়। জিব্বারেলিক অ্যাসিড কোষকে লম্বালম্বিভাবে দীর্ঘীকরণে প্ররোচিত করে।

বেনজাইল অ্যাডিনিন, সাইকোসিল এবং IAA প্রয়োগে *Dioscorea batatas*-এর আংশিক স্ট্রটিফায়েড বুলবিলের (bulbil) অঙ্কুরিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু GA_3 একে বাধা দেয়। GA_3 ব্যাটাটাসিনের (batatasin) মাত্রা বৃদ্ধি করে, ABA এর মাত্রা নয়। বুলবিলে ব্যাটাটাসিন তৈরির মাধ্যমে GA_3 এবং আলো এর অঙ্কুরোদ্গমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। *Dioscorea* এর বুলবিল থেকে তিন প্রকার ব্যাটাটাসিন পৃথক করা হয়েছে। ব্যাটাটাসিন হলো উদ্ভিদের সুপ্তাবস্থা সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক পদার্থ।

বার্ধক্যপ্রাপ্তি (Senescence)

অন্যান্য সজীব বস্তুর মতো উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়, বার্ধক্যপ্রাপ্তি ঘটে এবং অবশেষে মারা যায়। উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত বেশিদিন বাঁচে, এই সময় কয়েকদিন থেকে কয়েক হাজার বছর হতে পারে। যেকোনো সময় একটি উদ্ভিদে জীবন্ত, মৃত এবং সক্রিয়ভাবে বিভাজন সক্ষম কোষ থাকে। তাই সম্পূর্ণ উদ্ভিদে বার্ধক্য প্রাপ্তি প্রক্রিয়া পরীক্ষা করা খুব কঠিন। বীজপত্র, ফুলের পাপড়ি, পাতা ইত্যাদি অঙ্গে এটি ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়।

পাতার কার্যদক্ষতা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে এটি উদ্ভিদের একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বার্ধক্য প্রাপ্তির সাথে সাথে পাতার অধিকাংশ মেটাবোলাইট, যথা- প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অ্যামাইড হ্রাস পেতে থাকে। আণবিক পর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বার্ধক্য প্রাপ্তির সাথে সাথে কিছু প্রোটিন কমে যায়, কিছু লুপ্ত হয় এবং অপর কিছু তখনও থাকে। একইভাবে বিভিন্ন বয়সের কলায় বিভিন্ন প্রকার এনজাইম থাকে। বার্ধক্যপ্রাপ্তির সাথে সাথে নিউক্লিওটাইড, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, আয়ন এবং হরমোনের মাত্রারও পরিবর্তন হয়। প্রকৃত পক্ষে, বর্ধনশীল কচি পাতা সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে এবং পরিণত পাতা থেকে মেটাবোলাইট গ্রহণ করে।

বিচ্ছিন্ন পাতায় স্টার্চের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং রাইবোজোম এবং ক্লোরোপ্লাস্টও নষ্ট হয়ে যায়। এর পরিবর্তে সাইটোপ্লাজমে বৃহদায়কার লিপিডের বিন্দুর আবির্ভাব ঘটে এবং কোষ-গহ্বরও লুপ্ত হয়। ধীরে ধীরে কোষ ফাঁকা হয়ে যায়। বার্ধক্য প্রাপ্তির শেষ পর্যায়ে টনোপ্লাস্ট এবং বিভিন্ন কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গের ঝিল্লি নষ্ট হয়ে যায়। সব প্রকার উদ্ভিদেই এরকম প্রক্রিয়া দেখা যায়।

পাতার ATP সংশ্লেষণের ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং ক্লোরোপ্লাস্টের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ায় সালোকসংশ্লেষণে সৃষ্ট পদার্থের পরিমাণও কমে যায়। বার্ধক্য প্রাপ্তির সময় কতগুলো পাতায় হাইড্রোলেজে, যেমন- বিটা-গ্লুকোসাইডেজ, আলফা-গ্যাক্টোসাইডেজ, সেলোবায়েজ এর পরিমাণ বেড়ে যায়। তামাকের কচি পাতার তুলনায় পুরাতন পাতার বিটা-১,৩-গ্লুকানেজ এর কার্যকারিতা কয়েক গুণ বেশি। কতিপয় প্রোটিওলায়টিক এনজাইমের পরিমাণও পুরাতন পাতায় বেশি। একইভাবে, RNAase এর ক্রিয়াও বেড়ে যায়, তাই পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তির সময় RNAএর পরিমাণ কমে যায়। ATP জমা হওয়াতে নিউক্লিয়েজেস এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশীয় প্রভাবক, যেমন- পানি অথবা খনিজ মৌলের ঘাটতি, আলোর জন্য উদ্ভিদের মধ্যে-প্রতিযোগিতা অথবা অতিরিক্ত তাপমাত্রা বার্ধক্য প্রাপ্তি ঘটাতে পারে। পীড়নজনিত পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্ভিদে এরকম বার্ধক্য প্রাপ্তি দেখা যায় এবং একে কৌশলগত (tactical) বার্ধক্য প্রাপ্তি বলে।

বার্ধক্যপ্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণে আলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফাইটোক্রোমের মাধ্যমে আলোর প্রভাব পরিচালিত হয়। *Anagalis arvensis*-এ স্বল্প দিবালোকে RNA-এর পরিমাণ

বেড়ে যায়, বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং প্রচুর সংখ্যায় মূল তৈরি হয়। অপরদিকে, দীর্ঘ দিবালোকে এগুলো বার্ধক্যপ্রাপ্ত হয় এবং বার্ধক্যপ্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। *Marchantia*-এর থ্যালাসকে সাদা আলোতে এক ঘন্টা রাখলে বার্ধক্যপ্রাপ্তি হ্রাস পায়। প্রতিদিন পাঁচ মিনিট করে লাল আলোতে রাখলেও একইরকম ফলাফল পাওয়া যায়। তবে অধিকলাল আলোর প্রভাবে সাদা আলোর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।

কতিপয় হরমোন বার্ধক্যপ্রাপ্তিকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে, সাইটোকাইনিন একে বাধা দেয়। সাইটোকাইনিনের জন্য নিউক্লিয়েজের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ক্লোরোপ্লাস্ট ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। পুরাতন পাতায় সাইটোকাইনিনের পরিমাণ কম থাকে। অপরদিকে, ইথিলিন এবং ABA বার্ধক্য প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। গোলাপের অন্তঃস্থ ABA পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘস্থায়ী পাপড়ির তুলনায় স্বল্পস্থায়ী পাপড়িতে ABA এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বিচ্ছিন্ন ফুলে (cut flower) বার্ধক্যপ্রাপ্তির সাথে সাথে ইথিলিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। উপরন্তু, পুরাতন পাতায় ইথিলিনের উপস্থিতিতে ABA এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ABA নিউক্লিয়েজেসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। শ্বসনের হার এবং ABA ও ইথিলিনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বার্ধক্য প্রাপ্ত কলায় বিভিন্ন বিপাকীয় গতিপথ, যেমন- সালোকসংশ্লেষণ, প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং অন্তঃস্থ প্রভাবক, যেমন- জিব্বেরেলিক অ্যাসিডের উৎপাদন পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সাম্প্রতি গবেষণার ফলাফলে জানা গেছে যে, কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেমন- গ্লাইসিন, অ্যালানিন, সেরিন ইত্যাদি বার্ধক্য প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে, অপরপক্ষে, আরজিনিন একে বাধা দেয়। কয়েক প্রকার চিনি, যেমন- গ্লুকোজ, বার্ধক্যপ্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু ফ্রুকোটোজ এবং সুক্রোজের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। এই কার্বোহাইড্রেটগুলো অভিস্রবণীয়ভাবে কাজ করে না এবং এদের ক্রিয়ার পদ্ধতি ভালভাবে জানা যায়নি। কতগুলো কৃত্রিম বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক পদার্থ, যেমন- মরফ্যাকটিন, আলফা-ন্যাপথেলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ইত্যাদি বার্ধক্য প্রাপ্তি ঘটায়।

ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বার্ধক্য প্রাপ্তির প্রথমের দিকেই অধিকাংশ কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট এবং রাইবোজম সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল এবং সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

বার্ধক্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ প্রস্তাব করা হয়েছে। সাধারণভাবে এদেরকে নিম্নলিখিত চারটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. **বিষাক্ত পদার্থ :** একটি ধারণা হলো যে, বার্ধক্যপ্রাপ্তির সময় বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়।

খ. **অত্যাবশ্যক মেটাবোলাইটের অবলুপ্তি :** বার্ধক্যপ্রাপ্তির জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপাকে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক মেটাবোলাইটের পরিমাণ আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে।

গ. **ঝড়তি-পড়তি** (Wear and tear) **:** বার্ধক্যপ্রাপ্তির শুরুতে কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গের অবলুপ্তির জন্য কোষগুলো ঝড়তি-পড়তি হয়।

ঘ. **বংশগতীয় ক্ষতি :** কতিপয় উদ্ভিদে মিউটেটেড জিন থাকায় একটি নির্দিষ্ট বয়সে অঙ্গে/উদ্ভিদে বার্ধক্যপ্রাপ্তি ঘটায়।

উপরোক্ত কোনো মতবাদই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। বার্ধক্যপ্রাপ্তির সময় যেসব পদার্থ পৃথক করা হয়েছে, তাহলো সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট, কিন্তু এগুলো বার্ধক্যপ্রাপ্তিকে প্ররোচিত করে না। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপরিণতির সময় বিভিন্ন অঙ্গ থেকে যে পদার্থগুলো পৃথক করা যায় তাহলো অজৈব এবং জৈব অণু। কতিপয় বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, 'জুভেনিলিটি

ফ্যাক্টর'-এর মতো কিছু জিনিস আছে যা উদ্ভিদকে অঙ্গজ অবস্থায় রাখে। তবে এরকম কোনো পদার্থ উদ্ভিদ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে বলা যায়, একটি নয় কতিপয় প্রভাবক বার্ধক্যপ্রাপ্তির জন্য দায়ী।

অ্যাবসসিসন (Abscission)

শরৎকালে পাতা হলুদ, কাল, ধূসর এবং লাল রঙের হয়। পতনশীল পাতার রঙের পরিবর্তন হয় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং অ্যান্থোসায়ানিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য। পর্ণমোচী উদ্ভিদের ঋতুগত পত্রমোচন হয় এবং চিরসবুজ উদ্ভিদের বিভিন্ন সময় পত্রমোচন হয়।

বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন— পাতা, ফুল ও ফল পতনের প্রক্রিয়াকে অ্যাবসসিসন বলে। এটি খুবই জটিল শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং এটি কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া এবং বার্ধক্যজনিত পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

উদ্ভিদে, বিশেষ করে বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদে অ্যাবসসিসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পুরাতন পাতার বদলে নতুন পাতায় পানি ও খনিজ মৌলের পরিবহণকে এটি সহায়তা করে। একইভাবে, এটি একটি 'নিজস্ব-ছাঁটাইকরণ' (self-pruning) পদ্ধতি যার মাধ্যমে বর্ধনশীল কচি ফল এবং আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ মাতৃ-উদ্ভিদ থেকে ঝরে যায়। এর জন্য প্রতিযোগিতা কম হয় এবং রোগ জীবাণুর হাত থেকে উদ্ভিদ রক্ষা পায়। উপরন্তু, অঙ্গজ প্রোপাগিউল এবং ফলের বিসরণে এটি সাহায্য করে এবং বর্জ্য পদার্থ সমেত উদ্ভিদের অংশকে দূরীভূত করে অ্যাবসসিসন রেচকের মতো কাজ করে।

অঙ্গ-সংস্থানিকভাবে সুস্পষ্ট একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অ্যাবসসিসন সীমাবদ্ধ, এই অঞ্চলকে অ্যাবসসিসন অঞ্চল বলে। একটি অঙ্গ এবং মাতৃ-উদ্ভিদের মধ্যে সংযোগস্থলে অ্যাবসসিসন অঞ্চল অবস্থিত এবং পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই রকম। এক অথবা অধিক সংখ্যক কোষের স্তর দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত; পাতার বৃদ্ধির সময় এ কোষগুলো প্রস্থ বরাবর বিভাজিত হয়ে পত্রবৃন্ত বারাবর একটি অ্যাবসসিসন স্তর গঠন করে। একটি পাতায় সাধারণত একটি বা দুটি স্তর থাকে এবং এর রঙ ধূসর কিংবা বাদামি। *Gymnocladus* নামক এক প্রকার লেগুমজাতীয় উদ্ভিদের একটি পাতায় নব্বইটি অ্যাবসসিসন স্তর থাকে বলে জানা গেছে। এই অঞ্চলে কোষগুলো ক্ষুদ্র, দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ। এই অঞ্চলে ফাইবার থাকে না এবং লিগনিফিকেশন হয় না বা খুব সামান্য হয়। কোনো একটি অঙ্গের অ্যাবসসিসনের সময় অ্যাবসসিসন অঞ্চলের দূরবর্তী স্থানে একটি কোষের স্তর তৈরি হয়। এই কোষগুলো উচ্চ বিপাকীয় ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এরাই অ্যাবসসিসন স্তর গঠন করে। পত্রপতনের সময় অ্যাবসসিসন স্তরের কোষগুলোর মধ্য-পটল এবং সেলুলোজ প্রাচীর বিগলিত হয়, ফলে পত্রবৃন্ত কেবল ভাসকুলার উপাদান দ্বারা কাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। বাতাস অথবা অভিকর্ষের জন্য মাতৃউদ্ভিদ থেকে পাতাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অ্যাবসসিসনের জন্য একটি ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন কাণ্ডে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাবসসিসন স্তর তৈরির সময় কাণ্ডের নিকটবর্তী অ্যাবসসিসন স্তরের কোষগুলোর বিভাজন চলতে থাকে। তাই কাণ্ডের ক্ষতচিহ্ন একটি রক্ষাকারী স্তর তৈরি হয় যা উদ্ভিদে রোগজীবাণু প্রবেশে বাধা দেয়। এই স্তরের কোষগুলো লিগনিনযুক্ত অথবা সুবেরিনযুক্ত হতে পারে।

কতগুলো প্রভাবক অ্যাবসসিসনকে ত্বরান্বিত করে। এগুলো হলো চরম তাপমাত্রা, দ্রুত পানি ঘাটতি, লজিং (lodging), বর্ধিত শ্বসন হার অথবা অক্সিজেন গ্রহণ, স্বল্প দিবালোক এবং কতিপয় বায়োটিক প্রভাবক, যেমন— পোকামাকড় এবং ছত্রাকের আক্রমণ এবং কতগুলো রাসায়নিক যৌগ, যেমন— ডিফোলিয়েন্ট, ইথিলিন ইত্যাদি। এটি দেখা গেছে যে, শীর্ষমুকুলের

পত্রফলক অপসারিত করলে পত্রবৃন্তের অ্যাবসসিসন বিলম্বিত হয়। এটি প্রতীয়মান হয় যে, মুকুলে একপ্রকার পদার্থ তৈরি হয় যা অ্যাবসসিসন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। IAA প্রয়োগ করেও একইরকম ফলাফল পাওয়া যায়। পত্রবৃন্তের তুলনায় পত্রফলকে বেশি মাত্রায় অক্সিন থাকে, কিন্তু পুরাতন পাতা অ্যাবসসিসন পর্যায়ে পৌঁছালে পত্রফলক ও পত্রবৃন্তে একই মাত্রায় অক্সিন থাকে। এর প্রেক্ষিতে অ্যাবসসিসনের ব্যাখ্যা করতে কেউ কেউ অক্সিন–গ্রেডিয়েন্ট মতবাদের প্রস্তাব করেছেন। তবে এই মতবাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রতিককালের গবেষণায় জানা গেছে যে, অ্যাবসসিসন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া, নিষ্ক্রিয়ভাবে পত্র কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের পতন নয়। প্রকৃতপক্ষে, অক্সিজেন অথবা কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি হলে অ্যাবসসিসন বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপরন্তু, RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের রোধকের দ্বারা অ্যাবসসিসন বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইথিলিন দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোষপ্রাচীর ভাঙ্গন কোনো অঙ্গের পৃথকীকরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত পেকটিক পদার্থের বিগলনের জন্য কোষগুলো পৃথক হয়, তবে কখনো কখনো প্রাথমিক কোষপ্রাচীর পুরোপুরি আত্তীকরণ হতে পারে। পেকটিন মিথাইল হস্টারেজ এবং সেলুলেজ অ্যাবসসিসনের জন্য অত্যাবশ্যক।

Coleus এ পেকটিনের মিথাইলেশনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, এরফলে মধ্যপট্টলে দ্রবণীয় পেকটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পেকটিনেজ এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মধ্য–পট্টলের পেকটিক পদার্থের ভাঙনের ফলে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম মুক্ত হয়। *Phaseolus* এ অ্যাবসসিসন অঞ্চলে সেলুলোজের মাত্রা বেড়ে যায়। সেলুলোজের চারটি প্রধান আইসোজাইম *Phaseolus*–এ আছে, কিন্তু অ্যাবসসিসনের পূর্বে মাত্র একটির পরিমাণ বাড়ে।

কতগুলো প্রাকৃতিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাবসিসনকে ত্বরান্বিত করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে,অন্যান্য এনজাইম, যেমন– অ্যাসিড ফসফেটেজ অ্যাবসসিসনে অংশ নেয় যা ঝিল্লি, RNA, চিনি ফসফেট গাঠনিক প্রোটিন ইত্যাদিকে ধ্বংস করে। কোনো কোনো গবেষক অ্যাবসসিসনে পারঅক্সিডেজের ভূমিকারও উল্লেখ করেছেন।

অ্যাবসসিসনে অক্সিন একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি ধারণা করা হয় যে, অন্তঃস্থ অক্সিনের মাত্রা এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। পাতার বয়স এবং ফলের পরিপক্বতার সাথে সাথে অক্সিনের মাত্রা কমে যায়। অক্সিনের প্রভাবে ক্লোরোফিল, RNA এবং প্রোটিনের ভাঙন বিলম্বিত হয়। বার্ধক্যপ্রাপ্তির সময় অক্সিনের মাত্রা হ্রাসের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, অক্সিন সংশ্লেষণের হার কমে যাওয়া বা রোধ হওয়া অথবা পরিবহণ, জারণ এবং ডিকার্বোঅক্সিলেশন প্রভাবিত হতে পারে। এসব প্রক্রিয়া আবার ইথিলিন দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ট্রিপ্টোফ্যান থেকে অক্সিন রূপান্তরে ইথিলিন বাধা দেয়। ফলের বর্ধনের সময় পুষ্টি উপাদানের পরিবহণকে অক্সিন ত্বরান্বিত করে। এর জন্যে বেশি পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সহজলভ্যতার কারণে অক্সিনের সংশ্লেষণ বেড়ে যায়। তবে পরিপক্ব ফল থেকে পুষ্টি উপাদান বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফলে অক্সিনের মাত্রা হ্রাস পায়। তাই অক্সিনের ঘনমাত্রা অ্যাবসসিসনকে রোধ কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারে। যেমন– পরিণত ফলের তুলনায় কচি ফল NAA প্রয়োগে বেশি সংবেদশীল এবং তাই NAA প্রয়োগে ফল ঝরে যায়। জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে আবার NAA এর ক্রিয়াকে নষ্ট করে দিতে পারে।

যদিও ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দেই অ্যাবসসিসনকে উদ্দীপিত করতে ইথিলিনের ভূমিকা সম্পর্কে জানা গিয়েছিল, তবে এর ক্রিয়ার প্রকৃত কৌশল জানার জন্য সাম্প্রতি গবেষণা করা হয়েছে। কোনো অঙ্গের অ্যাবসসিসনের পূর্বে অ্যাবসসিসন অঞ্চলের দূরবর্তী কলায় অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ইথিলিন তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলে ইথিলিনের মাত্রা বেশি করলে অ্যাবসসিসন ঘটে এবং

পরিণত পাতা অপেক্ষাকৃত দ্রুত সাড়া দেয়। ইথিলিন অ্যাবসসিসন অঞ্চলের কোষে সেলুলেজ তৈরিকে উদ্দীপিত করে। এই হরমোন আবার অ্যাবসসিসনে অংশগ্রহণকারী এনজাইমের সংশ্লেষণের জন্য অত্যাবশ্যক শক্তিসমৃদ্ধ যৌগ তৈরি এবং শ্বসনের হারকে উদ্দীপিত করে।

অপর একটি হরমোন ABA অ্যাবসসিনকে ত্বরান্বিত করে এবং ABAইথিলিন তৈরি নিয়ন্ত্রণ করে। সেলুলেজ এবং পেকটিনেজ এনজাইমের সংশ্লেষণের হারকে ABA বৃদ্ধি করে ; এটি নির্দেশ করে যে, RNA অথবা প্রোটিন সংশ্লেষণকে প্রভাবিত করে এই হরমোন অ্যাবসসিসনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যাবসসিসনের উপর জিব্বারেলিক অ্যাসিডের পরোক্ষ প্রভাব আছে। ধারণা করা হয় যে, অন্যান্য হরমোন, যেমন- IAA এর সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে জিব্বারেলিক অ্যাসিড ক্রিয়া করে। অ্যাবসসিসন বিলম্ব করতে সবচেয়ে কার্যকর হলো সাইটোকাইনিন। এর প্রভাবে ক্লোরোফিল দেরিতে নষ্ট হয়, পেকটিডেজ, রাইবোনিউক্লিয়েজ প্রভৃতি এনজাইমের কার্যকারিতাকে দীর্ঘায়িত করে। অক্সিনের মাত্রায় হ্রাস পাওয়া এবং বার্ধক্য প্রাপ্তির সময় অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণে বাধা দেয়।

সম্প্রতি কতিপয় গবেষক কতগুলো ফ্যাক্টরকে খাঁটি অবস্থায় পৃথক করতে সমর্থ হয়েছে এবং এদেরকে এস এফ (SF) বলা হয়।

রাসায়নিক গঠন কিংবা প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়ার দিক থেকে এগুলো IAA ABA থেকে পৃথক। এস এফ অ্যাবসসিসনকে ত্বরান্বিত করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ইথিলিন তৈরিকে উদ্দীপিত করে। ধারণা করা হয় যে, এস এফ ইথিলিন সংশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন কলায় এস এফ ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে, কিন্তু অ্যাবসসিসন বা বার্ধক্যপ্রাপ্তির সময় ঝিল্লি ভেঙে যায় ও এস এফ মুক্ত হয় এবং ইথিলিনের জৈব-সংশ্লেষণকে প্ররোচিত করে অ্যাবসসিসনে পরিণত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ভিদ হরমোন

উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আলো, পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অনেক খনিজ পদার্থ এবং কোষের অভ্যন্তরস্থ কতগুলো রাসায়নিক পদার্থ অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এ রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় না। এ পদার্থগুলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকর দ্রব্য বলে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিকর দ্রব্যসমূহকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-উদ্ভিদ হরমোন ও ভিটামিন। কতগুলো দ্রব্য আবার উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে রোধ করে। এদেরকে বৃদ্ধিরোধক (growth inhibitor) বলে।

উদ্ভিদ হরমোন এক প্রকার জৈব পদার্থ যা উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় এবং খুবই সামান্য মাত্রায় তৈরি হওয়ার স্থান থেকে দূরবর্তী অংশে বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদ হরমোন প্রাকৃতিক (natural) অথবা কৃত্রিম (synthetic) হয়।

যদিও ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন (যিনি জৈব-অভিব্যক্তির মতবাদের জন্য বিখ্যাত) উদ্ভিদে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্যের উপস্থিতি অনুমান করেন, তবুও ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভিদ থেকে এ দ্রব্য পৃথক করা সম্ভব হয়নি। আরো দশ বছর পর এর রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে সার্বিক তথ্য পাওয়া যায়। এ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্যকে অক্সিন নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে উদ্ভিদে আরো বিভিন্ন প্রকার হরমোনের উপস্থিতি আবিষ্কৃত হয়। তবে সর্বপ্রকার হরমোনের মধ্যে অক্সিনের প্রভাবই উদ্ভিদে সব থেকে বেশি থাকে।

উদ্ভিদ হরমোনের শ্রেণিবিভাগ

গুণাবলি ও কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ হরমোনকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

১. অক্সিন (Auxin)। যথা- ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA)।
২. জিব্বারেলিন (Gibberellin)। যথা- জিব্বারেলিক অ্যাসিড (GA)।
৩. সাইটোকাইনিন (Cytokinin)। যথা- জিয়াটিন।
৪. অ্যাবসসিসিক অ্যাসিড (Abscisic acid)।
৫. ইথিলিন (Ethylene)।

১. অক্সিন (Auxin)

আবিস্কার ও রাসায়নিক প্রকৃতি

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী জুলিয়াস ভন স্যাকস (Julius Von Sachs), তাঁকে উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানের জনক নামে অভিহিত করা হয় তিনি মনে করতেন যে, কতগুলো রাসায়নিক বস্তু (যাকে বর্তমানে হরমোন বলা হয়) উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ

তৈরির জন্য দায়ী এই বস্তু বিভিন্ন মেরুদেশীয় প্যাটার্নে উদ্ভিদে চলাচল করে এবং বৃদ্ধি ও বিপরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, এই বস্তুর বিভিন্নতার জন্য উদ্ভিদের অঙ্গগুলোর মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য হয়। তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা অবশ্য খুব সামান্যই এই তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন এবং পরিশেষে এর অর্ধ-শতাব্দী পর অঙ্গ তৈরির এই বস্তুর মতো রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে এটি জানা গেছে যে, প্রত্যেক প্রকার হরমোনই বিপরিণতির বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাই একটি অঙ্গ তৈরির জন্য একটি নির্দিষ্ট হরমোনের নিয়ন্ত্রণের সাকের ধারণাটি সঠিক ছিল না।

ফটোট্রপিজম এবং জিওট্রপিজম নিয়ে গবেষণার সময় অক্সিন আবিষ্কৃত হয়। উদ্ভিদের চলন, বিশেষ করে ফটোট্রপিজমের প্রতি চার্লস ডারউইনের গভীর আগ্রহ ছিল। এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'The power of movements in plants' শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাতে উদ্ভিদে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্যের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি ক্যানারি ঘাসের *(phalaris)* ভ্রূণমুকুলাবরণী (coleoptile) আলোর সামনে রেখে লক্ষ্য করেন যে, এটি আলোর দিকে বেঁকে যায়। ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ ঢেকে দিয়ে অথবা কেটে ফেলে তিনি দেখতে পান যে, ভ্রূণমুকুলাবরণী আলোর দিকে বেঁকে যায় না। এ পরীক্ষার ফলাফল থেকে ডারউইন মন্তব্য করেন যে, ভ্রূণমুকুলাবরণীর উপর অংশ থেকে নিম্নাংশে এক প্রকার সংবেদন (stimulus) স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এ প্রকার চলন ঘটে।

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে বয়সেন-জেনসেন (Boysen-Jensen) জই-এর (oats) ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ কেটে এবং কাটা অংশের উপর এক খণ্ড আগার রেখে তার উপর পুনরায় কর্তিত অগ্রভাগটি স্থাপন করে লক্ষ্য করেন যে, অগ্রভাগ আলোর দিকে বেঁকে যায়। যদিও বয়সেন-জেনসেন এ পরীক্ষার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি, তবুও এটি প্রমাণ করে যে, ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার দ্রব্য থাকে যা আগারে দ্রবীভূত হতে পারে। এজন্যই যখন আগার খণ্ডটি ভ্রূণমুকুলাবরণীর কর্তিত অংশে স্থাপন করা হয়, তখন এ দ্রব্য ভ্রূণমুকুলাবরণীর সাথে সংযোজিত হয়।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে পাল (Paal) উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ কেটে ফেলেন এবং কর্তিত অগ্রভাগ বাকি অংশের সাথে অপ্রতিসমভাবে (asymetrically) স্থাপন করে লক্ষ্য করেন যে, অগ্রভাগ একপ্রকার পদার্থ নিঃসৃত করে যা তার নিম্নাংশের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

এফ. ডব্লিউ. ওয়েন্ট (F.W.Went, 1926, 1928) নামক একজন ওলন্দাজ তরুণ উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্র সুনির্দিষ্টভাবে অক্সিন আবিষ্কার করেন। ওয়েন্ট এর মূল পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল খুব সরল। তিনি জই এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগগুলো কেটে ৩% আগারের একটি পাতলা স্তরের উপর রাখেন। ১ থেকে ৪ ঘণ্টা পর অগ্রভাগগুলো সরিয়ে নিয়ে আগারকে ছোট ছোট খণ্ড করেন। এরপর আগারের এই ছোট খণ্ডগুলোকে ভ্রূণমুকুলাবরণীর কাটা অংশের উপর অপ্রতিসমভাবে রেখে দেন। এর ফলে অন্ধকারেও ভ্রূণমুকুলাবরণী বেঁকে যায়। একেই জই-এর বক্রীয় পরীক্ষা (avena curvature test) বলে।

যদিও ওয়েন্ট ব্যাপন পদ্ধতিতে অক্সিনকে পৃথক করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন, তবে তিনি একে বিশুদ্ধভাবে পৃথক করতে অথবা এই রাসায়নিক পদার্থের গঠন শনাক্ত করতে সক্ষম হননি। রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিনের গঠন শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিন পৃথক করার প্রথম চেষ্টা অবশ্য জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণী অথবা কোনো উদ্ভিদের কলা থেকে হয়নি, কেননা উদ্ভিদে এটি এতো অল্প পরিমাণে থাকে যা ছিল সে সময়ের রাসায়নিক

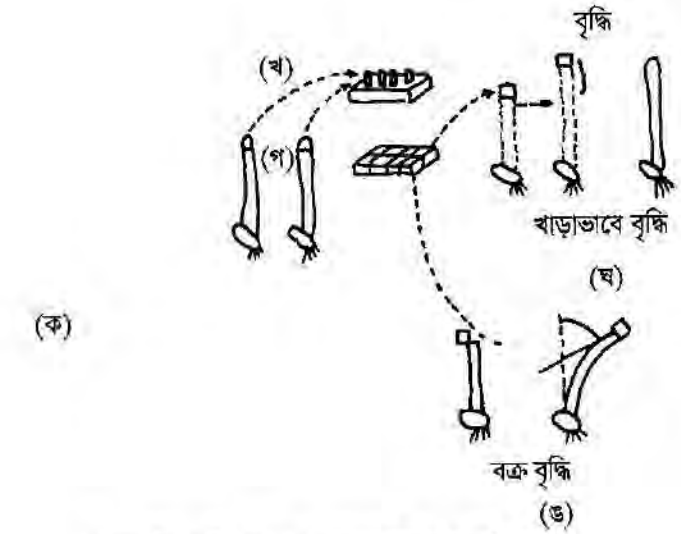

(ওয়েন্টের জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর বৃদ্ধি পরীক্ষা)

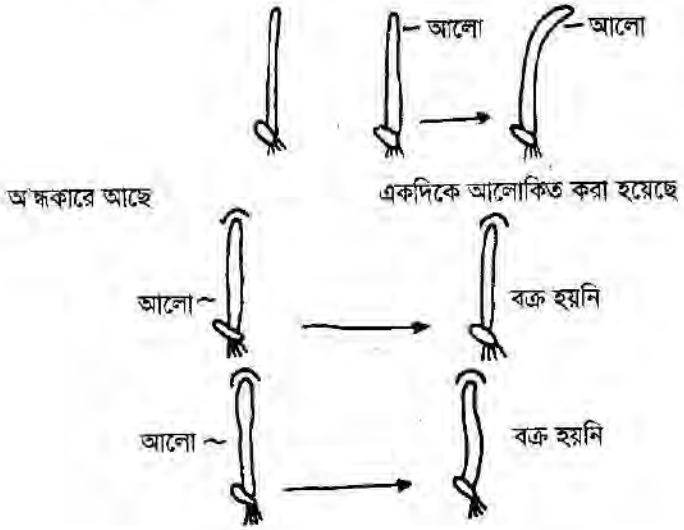

(ডারউইনের ঘাসের ভ্রূণমুকুলাবরণীর বক্রীয় পরীক্ষা)

চিত্র ৫.১ : অক্সিন আবিষ্কারের বিভিন্ন পর্যায়

বিশ্লেষণ পদ্ধতির জন্য খুবই সামান্য। তাই প্রাণরসায়নবিদরা জই-এর বক্রীয় পরীক্ষা ঘটাতে পারে এমন পদার্থসমৃদ্ধ অন্য জৈব বস্তুর উৎসের সন্ধান করেন। কগল এবং হ্যাগেন স্মিট (Kogl and Haagen-Smit, 1931) ১৫০ লিটার মানুষের মূত্র থেকে ৪০ মিলিগ্রাম অক্সিন A (auxin A) পৃথক করেন। রাসায়নিকভাবে একে অ্যানহাইড্রোলিক ($C_{18}H_{32}O_5$) বলে। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কগল, এরফলিবেন এবং হ্যাগেন-স্মিট (Kogl, Erxleben and Haagen-smit) ভুট্টা দানার তেল থেকে অক্সিন B (auxin B) পৃথক করেন। রাসায়নিকভাবে একে অক্সোলোনিক ($C_{18}H_{30}O_4$) বলে। অবশ্য অক্সিন A এবং অক্সিন B পুনরায় পৃথক করা সম্ভব হয়নি। তাই এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পরবর্তী সময়ে কগল এবং তাঁর সহকর্মীরা মানুষের মূত্র থেকে অপর একপ্রকার অক্সিন পৃথক করেন এবং একে হেটারোঅক্সিন নাম দেন। পরিশেষে একে ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) নাম দেয়া হয়। অক্সিন A এবং অক্সিন B উদ্ভিদে পাওয়া যায় না, কিন্তু IAA সব উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রধান প্রাকৃতিক হরমোন।

কগল এবং কস্টারমানস (Kogl and Kostermans, 1934) ঈস্ট থেকে IAA পৃথক করেন। *Rhizopus suinus* নামক ছত্রাকের কালচার থেকে কে.ভি. থিম্যান (K.V. Thimann) IAA পৃথক করেন ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে IAA উপস্থিতির কথা জানা যায়। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো যে, জার্মানিতে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে এলিংগার (Ellinger) কর্তৃক কৃত্রিমভাবে IAA সংশ্লেষণের সময় থেকেই এটি রসায়নবিদদের কাছে পরিচিত ছিল, তবে পূর্বে কেউ-এর জৈব কার্যাদির কথা অনুমান করতে পারেননি।

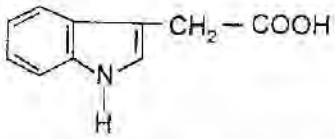

চিত্র ৫.১ : ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের গঠন

অক্সিনের উৎপত্তিস্থল

উদ্ভিদে অক্সিন সক্রিয়ভাবে তৈরি হয় কাণ্ডের অগ্রভাগে, বিশেষ করে অগ্রস্থ মুকুলের নতুন কচি পাতা, ঘাস ও খাদ্যশস্যের চারার ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে, বর্ধনশীল ভ্রূণ, বর্ধনশীল ফল প্রভৃতি স্থানে। অন্ধকারের তুলনায় আলোতে সবুজ পাতায় দ্রুত অক্সিন তৈরি হয়।

অক্সিনের জৈব-সংশ্লেষণ (biosynthesis of auxin)

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কে.ভি. থিম্যান লক্ষ্য করেন যে, *Rhizopus suinus* নামক একপ্রকার ছত্রাক ট্রিপটোফ্যান নামক একপ্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত করতে পারে। ট্রিপটোফ্যান IAAএর উৎস কিনা সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এস.এ.গর্ডন এবং এস.এফ.নিভ (S.A. Gordon and S.F.Nieve) প্রস্তাব করেন যে, ট্রিপটোফ্যান থেকে IAA দুটি পথে তৈরি হতে পারে। প্রথম পথে ট্রান্সঅ্যামিনেজ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রিপটোফ্যান ইন্ডোল-পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় ট্রিপটোফ্যান ট্রান্সমিনেজ এনজাইম ছাড়াও একটি আলফা-কিটো অ্যাসিড এবং পাইরিডক্সাল ফসফেটের

প্রয়োজন হয়। পরের ধাপে ইন্ডোল-পাইরুভিক অ্যাসিড ডি-কার্বোঅক্সিলেশন হয়ে ইন্ডোল-অ্যাসিটালডিহাইডে পরিণত হয়। ইন্ডোল-পাইরুভিক অ্যাসিড ডি-কার্বোঅক্সিলেজ এনজাইম এবং থায়ামিন পাইরোফসফেট এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইন্ডোল অ্যাসিটালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ইন্ডোল অ্যাসিটালডিহাইড দ্রুত জারিত হয়ে IAA তে পরিণত হয়।

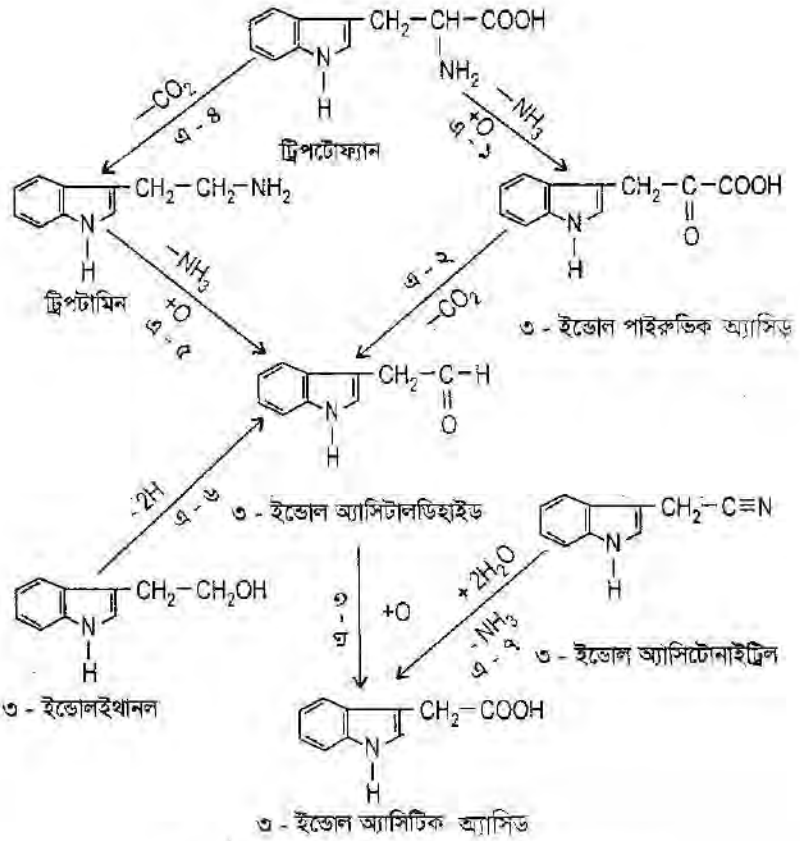

চিত্র ৫.৩ : ট্রিপটোফ্যান থেকে অক্সিন সংশ্লেষণের সম্ভাব্য পথ

দ্বিতীয় পথের প্রথমে ধাপে ট্রিপটোফ্যান ডি-কার্বোঅক্সিলেজ এনজাইমের প্রভাবে ট্রিপটোফ্যান ডি-কার্বোঅক্সিলেশন হয়ে ট্রিপটামিন হয় এবং পরের ধাপে অ্যামিন অক্সিডেজের উপস্থিতিতে ট্রিপটামিন আবার রূপান্তরিত হয় ইন্ডোল অ্যাসিটালডিহাইডে যা জারিত হয়ে IAA তে পরিণত হয়। উভয়পথেই ইন্ডোল অ্যাসিটাইলডিহাইড তৈরি হয়, তাই একে IAA

এর অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। IAA সংশ্লেষণের উভয়পথই অনেক উদ্ভিদে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এস.এ. গর্ডন (S.A.Gordon) প্রস্তাব করেছেন যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিভিন্ন দশায় অথবা একই উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন পথে কার্যকর।

উপরোক্ত ইন্ডোলিক যৌগ ছাড়াও কোনো কোনো উদ্ভিদে কতিপয় অন্যান্য ইন্ডোলিক যৌগও IAA এর অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন- *Cucurbita pepo* এর চারাগাছে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ডোল-৩-ইথানলে পরিণত হয়। ক্রুসিফেরি গোত্রের উদ্ভিদে ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটোনাইট্রিল এবং নাইট্রিলেজ এনজাইম থাকে যা নাইট্রিলকে সরাসরি IAA তে রূপান্তরিত করে। কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন- টমেটো) ইন্ডোল এসিটামাইড উপস্থিত থাকে যা হাইড্রোলেজ বিক্রিয়ার মাধ্যম IAA তে পরিণত হয়। এগুলো ছাড়াও কোনো কোনো উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে অক্সিনের অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে অন্যান্য ইন্ডোলিক যৌগ আছে। উল্লেখ্য যে, অক্সিনের অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে ডি-ট্রিপটোফ্যান এল-ট্রিপটোফ্যানের সমান অথবা এর চেয়েও বেশি কার্যকর, যদিও শেষোক্তটিই হলো একমাত্র আইসোমার যা উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রোটিনে প্রাকৃতিকভাবে থাকে।

মুক্ত এবং আবদ্ধ অক্সিন (Free and bound auxin)

প্রাকৃতিক অক্সিন IAA বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় উদ্ভিদ কলায় থাকে। মুক্ত অক্সিন হলো সেই অক্সিন যাকে দ্রুত নিষ্কাশন করা যায় (যেমন- অম্লকারে () সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ডাই-ইথাইল ইথারে ২ ঘণ্টায়) এবং এনজাইমোলাইসিস, হাইড্রোলাইসিস অথবা অটোলাইসিসের মাধ্যমে উদ্ভিদ কলা থেকে যে অক্সিন মুক্ত হয়, তাকে আবদ্ধ অক্সিন বলে। স্বভাবতই, বৃদ্ধির জন্য মুক্ত অক্সিন দ্রুত ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিতে বিভিন্ন অবস্থায় আবদ্ধ অক্সিন থাকতে পারে। সাধারণত আবদ্ধ অক্সিনকে IAA এর সঞ্চয়ী অবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে বীজ এবং সঞ্চয়ী অঙ্গে অক্সিন গ্লাইকোসাইল ইস্টার প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এটি হরমোনের নিষ্ক্রিয় সঞ্চয়ী অবস্থা যা থেকে এনজাইমের প্রভাবে IAA মুক্ত হয়। কতগুলো ক্রুসিফেরি গোত্রের উদ্ভিদে অ্যাসকরবিজেন এবং গ্লুকোব্রাসিসিনকেও অক্সিনের আবদ্ধ অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অক্সিন পেপটাইডকে, যেমন- ইন্ডোল-অ্যাসিটালটিহাইড অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, সাধারণত ডিটক্সিফিকেশন দ্রব্য হিসেবে গণ্য করা যায় যা একমুখীভাবে তৈরি হয় এবং অতিরিক্ত অক্সিন জমাকরণ থেকে উদ্ভিদ কলাকে রক্ষা করে।

অক্সিনের পরিবহণ

কাণ্ডের অন্তঃস্থ অক্সিনের প্রধানত অগ্রভাগ থেকে গোড়ার দিকে (basipetally) মেরুদেশীয় (polar) পরিবহণ হয়। এই প্রকার পরিবহণ কেবল ভ্রূণমুকুলাবরণীর কর্তিত অংশ অথবা *Coleus* এর পরিবহণ কলাবিহীন কাণ্ডেই হয় না কিন্তু পাতার শিরাতেও হয়। সুতরাং প্যারেনকাইমা কলা ও পরিবহণ কলা উভয়েই মেরুদেশীয় পরিবহণে সক্ষম। অক্ষত উদ্ভিদে কিভাবে অক্সিনের পরিবহণ হয়, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুব সামান্যই। তবে অনেক পরোক্ষ প্রমাণ নির্দেশ করে যে, ফ্লোয়েম দিয়ে দ্রুত অক্সিন পরিবাহিত হয়, ঘণ্টায় ১ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার। পরিণত কাণ্ড, ভ্রূণমুকুলাবরণী এবং পত্রবৃন্তের অগ্রভাগ থেকে গোড়ারদিকে মেরুদেশীয় পরিবহণ হ্রাস পায়। সামান্য পরিমাণ অক্সিন গোড়া থেকে অগ্রভাগেও (acropetally) পরিবাহিত হয় এবং এটি অ-বিপাকীয় (non-metabolic) এবং ব্যাপনের মাধ্যমে এটি হয় বলে প্রতীয়মান হয়।

সাধারণভাবে, অক্ষত মূল কিংবা কাণ্ডে বৃদ্ধিকর দ্রব্য প্রয়োগ করলে তা জাইলেম ও ফ্লোয়েম উভয় দিয়েই পরিবাহিত হয় এবং এই পরিবহণ অ-মেরুদেশীয় ; এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১০ মিলিমিটার কিংবা এর চেয়েও বেশি হতে পারে।

কাণ্ডের তুলনায় মূলে অক্সিন পরিবহণ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম জানা গেছে। মূলে অক্সিনের পরিবহণ হয় গোড়া থেকে অগ্রভাগে অর্থাৎ কাণ্ডের গোড়া থেকে মূলের অগ্রভাগে। কাণ্ডের চেয়ে মূলে অপেক্ষাকৃত কম মেরুদেশীয় পরিবহণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

অক্সিনের মেরুদেশীয় পরিবহণ একটি সক্রিয় (শক্তি–নির্ভরশীল) প্রক্রিয়া। ব্যাপনের হারের তুলনায় এই হার (জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ডে ১২ থেকে ২০ মিলিমিটার/ঘণ্টায়) অনেক বেশি। এই প্রক্রিয়া তাপমাত্রায় সংবেদনশীল। জই–এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ডে মেরুদেশীয় পরিবহণ অক্সিজেনের ঘনমাত্রার (প্রায় শতকরা ৫ ভাগ পর্যন্ত) উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় এই পরিবহণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু, জই–এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ডে তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্টের বিপরীত দিকে এই পরিবহণ হতে পারে। অক্সিন পরিবহণের মেরুদেশীয় প্রবণতা কাণ্ড, পত্রবৃন্ত, মূল এবং জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সাথে হ্রাস পায়।

অক্ষত উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপরিণতিতে হরমোন কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে স্বভাবতই অক্সিনের মেরুদেশীয় পরিবহণের কৌশল সম্পর্কে জানতে হবে। তবে এই কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এই কৌশল ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি মতবাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

সবচেয়ে পুরাতন ধারণা হলো বৈদ্যুতিক মেরুপ্রবণতা মতবাদ। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এফ. ব্রুইট প্রস্তাব করেন যে, ট্রপিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য একটি বৈদ্যুতিক ফিল্ডের মাধ্যমে অক্সিনের পার্শ্বীয় পুনর্বণ্টন হয় এবং এই ধারণা অনেক বছর ধরে বহাল ছিল। যেমন– এ. আর. শ্র্যাঙ্ক (A.R. Schrank) ১৯৪৫ থেকে ৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক মেরুপ্রবণতা এবং অক্সিনের পরিবহণ নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি জই এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ থেকে গোড়ার দিকে বৈদ্যুতিক বিভবের (potential) পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভ্রূণমুকুলাবরণীর একপার্শ্বে আলো প্রদান করলে, আলোকিত অংশের তুলনায় অন্ধকার অংশ ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হয়। আনুভূমিকভাবে রাখলে অন্য অংশের তুলনায় তলদেশ ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হয়। বিজ্ঞানী শ্র্যাঙ্ক প্রস্তাব করেন যে, শারীরতাত্ত্বিক pH–এ IAA অ্যানায়ন অবস্থায় থাকে এবং একটি বৈদ্যুতিক গ্রেডিয়েন্ট বরাবর অক্সিনের পরিবহণ হয়, অর্থাৎ সৃষ্ট বৈদ্যুতিক গ্রেডিয়েন্টের কারণে অক্সিনের মেরুদেশীয় পরিবহণ সম্ভব হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অক্সিন পরিবহণের বিভবের গ্রেডিয়েন্টের বিষয়টি বাতিল করে দিয়েছে। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে, ভ্রূণমুকুলাবরণীর দৈর্ঘ্য বরাবর বৈদ্যুতিক বিভবের গ্রেডিয়েন্ট এবং ট্রপিক উদ্দীপনার সৃষ্ট প্রস্থ বরাবর বৈদ্যুতিক বিভব হয় অক্সিনের মেরুদেশীয় পরিবহণের কারণে নয় বরঞ্চ এই পরিবহণের জন্য ট্রপিক উদ্দীপনা হয়। তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পদার্থবিজ্ঞানী আই.এ.নিউম্যান (I.A.Newman) এক প্রকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন যা জই-এর অগ্রবিহীন ভ্রূণমুকুলাবরণীর গোড়ার দিকে অক্সিন পরিবহণের সময় অনুসরণ করে। ভ্রূণমুকুলাবরণী বরাবর এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পরিবহণের হার ঘণ্টায় প্রায় ১৪ মিলিমিটার, যা অক্সিন পরিবহণের হারের প্রায় সমান। উপরন্তু, তিনি দেখান যে, অগ্রবিহীন ভ্রূণমুকুলাবরণীর উপর IAA প্রদান করলে একটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। নিউম্যানের প্রকল্প অনুসারে অপরিবর্তনশীল ঘনমাত্রায় ভ্রূণমুকুলাবরণী

বরাবর IAA পরিবাহিত হয় না, একটি তরঙ্গের আকারে পরিবাহিত হয়। অক্সিনে পরিবহণের বি.আই.এইচ স্কটের (B.I.H.Scott) ফিডব্যাক ধারণাকে নিউম্যান সমর্থন করেন। ভ্রূণমুকুলাবরণীতে অক্সিন পরিবহনের ফিডব্যাক সিস্টেমে তিনটি উপাদান অংশ নেয় বলে স্কট উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, IAA ঘনমাত্রা এবং ঝিল্লির ভেদ্যতা। তাঁর মতানুসারে, একটি ভ্রূণমুকুলাবরণী বরাবর অক্সিনের পরিবহণের সময় এটি ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটায়, এজন্য একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় যা আবার হরমোনকে ভ্রূণমুকুলাবরণীর নিচের দিকে ঠেলে দেয়।

বিজ্ঞানী লিওপোল্ড এবং হল-এর (Leopold and Hall, 1966) মেরুদেশীয় ক্ষরণ (polar secretion) মতবাদ নিউম্যান ও স্কটের কিছু কিছু ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানী লিওপোল্ড এবং হল প্রস্তাব করেন যে, একটি কোষের এক প্রান্তের তুলনায় অন্য প্রান্তে পক্ষপাতমূলকভাবে অধিক পরিমাণে অক্সিন ক্ষরণের জন্য অক্সিনের মেরুদেশীয় পরিবহণ হয়।

অক্সিনের বায়োঅ্যাসে (Bioassay of Auxin)

কোনো উদ্ভিদ থেকে অক্সিন সুচারুরূপে নিষ্কাশন করার পর এর ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের জন্য কতিপয় রাসায়নিক পদ্ধতি আছে। কিন্তু প্রতি কিলোগ্রাম সজীব উদ্ভিদ কলায় মাত্র কয়েক মাইক্রোগ্রাম (10^{-6}গ্রাম) অক্সিন থাকে যার পরিমাণ সাধারণ পদ্ধতির দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই বায়োঅ্যাসে পদ্ধতির দ্বারা এটি নির্ণয় করা হয়। জীবন্ত বস্তু ব্যবহার করে কোনো সক্রিয় জৈব পদার্থের প্রভাব পরীক্ষা করার পদ্ধতিকে বায়োঅ্যাসে বলে। যদিও অক্সিন আবিষ্কারের পর অক্সিনের জন্য অনেক বায়োঅ্যাসে উদ্ভাবিত হয়েছে, তবুও এদের মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার সাধারণভাবে স্বীকৃত। এগুলো হলো : (১) জই এর বক্রীয় পরীক্ষা (avena curvature test), (২) জই-এর খণ্ড পরীক্ষা (avena section test), (৩) ফাঁড়া মটরশুঁটির কাণ্ডের বক্রীয় পরীক্ষা (split pea stem curvature test) এবং (৪) ক্রেশ মূলের বৃদ্ধিরোধ পরীক্ষা (cress root inhibition test)।

১. জই-এর বক্রীয় পরীক্ষা

এ অধ্যায়ের প্রথমের দিকে জই-এর বক্রীয় পরীক্ষার সামান্য বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটি অক্সিনের জন্য প্রথম বায়োঅ্যাসে এবং সম্ভবত সর্বোত্তম। এ পরীক্ষার বিশেষত্ব হলো এই যে, জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর এক পার্শ্বে অক্সিন প্রয়োগ করলে, সেই পার্শ্ব দিয়েই অক্সিন দ্রুত নিচের দিকে ব্যাপিত হয়; পার্শ্বীয় ব্যাপন খুব সামান্য পরিমাণ হয়। এর ফলে ভ্রূণমুকুলাবরণীর দুই পাশের বৃদ্ধি ভিন্ন হবে, তাই ভ্রূণমুকুলাবরণীর এক পাশ বেঁকে যাবে। এ বক্রতা একটি পরিসর পর্যন্ত অক্সিন প্রয়োগের পরিমাণের সমানুপাতিক। এ পরীক্ষার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

অঙ্কুরোদ্গমের পর জই-এর চারা অন্ধকারে রাখা হয়। নীল আলোতে রাখলে ভ্রূণমুকুলাবরণীর অক্সিনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যায়। ভ্রূণমুকুলাবরণীর উচ্চতা ১৫ থেকে ৩০ মিলিমিটার হলে এর অগ্রস্থ ১ মিলিমিটার কেটে বাদ দেয়া হয়, ফলে অক্সিনের স্বাভাবিক উৎস নষ্ট হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা পর আবার অগ্রস্থ ২ থেকে ৪ মিলিমিটার কেটে ফেলা হয়। এখন অক্সিন মিশ্রিত এক খণ্ড আগার কর্তিত ভ্রূণমুকুলাবরণীর এক পাশে রাখা হয়। এ পাশ দিয়ে অক্সিন ভ্রূণমুকুলাবরণীর ভিতরে প্রবেশ করে। নব্বই মিনিট পর চারাগাছের ছায়া এক খণ্ড ব্রোমাইড কাগজে ফেলে ফটো নেয়া হয়। এ ফটো থেকে বক্রতার কোণ পরিমাপ করা হয়। অক্সিনের পরিমাণ যতো বেশি হবে, এ কোণও ততো বেশি হবে।

২. জই-এর খণ্ড পরীক্ষা

অক্সিন কোষ দীর্ঘায়িত করতে পারে কেবল এ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই এ পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত। জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ড ব্যবহার করে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জে. বনার (J. Bonner) এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। কতিপয় অক্সিন IAA এর মতো দ্রুত স্থানান্তরিত হতে পারে না। সেসব খণ্ড পরীক্ষা খুব উপযোগী। এ পরীক্ষার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

অঙ্কুরোদ্গমের পর জই-এর চারাকে ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় অন্ধকারে জন্মানো হয়। ভ্রূণমুকুলাবরণী ২৫ থেকে ৩০ মিলিমিটার দীর্ঘ হলে গোড়া থেকে কাটা হয়। অগ্রস্থ ৪ মিলিমিটার অংশ কেটে বাকি অংশ থেকে ৩ থেকে ৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের খণ্ড তৈরি করা হয়। সবগুলো খণ্ডকে কমপক্ষে এক ঘণ্টা পাতিত পানিতে রাখা হয় এবং পরে ২০ মিলিলিটার অক্সিনের দ্রবণ পেট্রিডিসে রেখে তাতে ঐ খণ্ড রাখা হয়। ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১২, ২৪, অথবা ৪৮ ঘণ্টা রাখার পর অকিউলার মাইক্রোমিটার (ocular micrometer) যুক্ত একটি ডিসেকটিং (dissecting) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খণ্ডগুলোর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়। এ পরীক্ষায় খণ্ডগুলোর বৃদ্ধি অক্সিনের ঘনত্বের লগারিদমের (logarithm) সমানুপাতিক।

৩. ফাড়া মটরশুঁটির কাণ্ডের বক্রীয় পরীক্ষা

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এফ. ডব্লিউ. ওয়েন্ট (F.W. Went) সর্বপ্রথম এ পরীক্ষার বর্ণনা প্রদান করেন। এ পরীক্ষার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

অঙ্কুরোদ্গমের পর মটরশুঁটির বীজ অন্ধকারে আট দিন রাখা হয়। চারাতে প্রতিদিন তিন বার করে লাল আলো প্রদান করা হয়, এতে চারার অক্সিনের প্রতি সংবেদশীলতা বৃদ্ধি পায়। কাণ্ডের অগ্রস্থ কিছু অংশ কেটে ফেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বসন্ধির মধ্যবর্তী অংশের দেড় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের খণ্ড কাটা হয়। এ খণ্ডগুলো ঘণ্টাখানেক পাতিত পানিতে রাখা হয়, এতে যে অন্তঃস্থ অক্সিন যদি কিছু থেকে থাকে তা বের হয়ে আসবে। এরপর খণ্ডগুলোকে লম্বালম্বিভাবে ফেড়ে (নিচের কিছু অংশ জোড়া লাগানো থাকবে) পেট্রিডিসে রাখা হয় এবং ঐ পেট্রিডিসে ২৫ মিলিলিটার অক্সিনের দ্রবণ দেয়া হয়। প্রতিটি পেট্রিডিসে পাঁচটি অথবা ছয়টি খণ্ড রাখলেই চলে। ছয় ঘণ্টা পর ফাড়া কাণ্ডের অগ্রভাগের বক্রতা পরিমাপ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এ বক্রতা অক্সিনের ঘনত্বের লগারিদমের সাথে মোটামুটি সমানুপাতিক।

৪. ক্রেশ মূলের বৃদ্ধিরোধ পরীক্ষা

কাণ্ডের তুলনায় মূল অক্সিনের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। প্রকৃতপক্ষে, অক্সিনের যে ঘনত্বে কাণ্ডের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, সে ঘনত্বে মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে খুব অল্প ঘনত্বে অক্সিন মূলের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। ক্রেশ মূলের বৃদ্ধিরোধ পরীক্ষার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

বীজ জীবাণুমুক্ত করে ভেজা ফিল্টার কাগজে অঙ্কুরোদ্গম করা হয়। চারাগাছের মূল মোটামুটি লম্বা হলে এগুলো অন্য পেট্রিডিসে রাখা হয় এবং ঐ পেট্রিডিসে ১৫ মিলিলিটার অক্সিনের দ্রবণ যোগ করা হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর মূলের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। অক্সিনের ঘনত্ব যতো বেশি হবে মূলের বৃদ্ধিও ততো কম হবে।

অক্সিনের ক্রিয়ার কৌশল

সব প্রকার হরমোন আবিষ্কারের পর, এর প্রত্যেকটির বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি কিভাবে সম্পন্ন হয় তা জানার জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অক্সিন (এবং অন্যান্য হরমোনের) ক্রিয়ার

কৌশল ব্যাখ্যার একটি প্রধান জটিলতা হলো যে, অক্সিন উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের শারীরতাত্ত্বিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, অক্সিনের ভিন্ন ভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক কার্যের জন্য একটি মৌলিক স্থান আছে অথবা অনেকগুলো স্থান ও ক্রিয়ার কৌশল আছে। সত্যিকারভাবে এ বিষয়টি সম্পর্কে এখনও ভালভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে অক্সিনের ক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

অক্সিনের ক্রিয়ার কৌশলের মতবাদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় :

(১) অক্সিন-নিয়ন্ত্রিত সব প্রকার শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার জন্য সবসময় অক্সিনের উপস্থিতির প্রয়োজন। ভ্রূণমুকুলাবরণীর অক্সিন প্ররোচিত কোষ দীর্ঘীকরণের ক্ষেত্রে, অক্সিন প্রয়োগের ১০ মিনিট অথবা এরচেয়ে কম সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি হার বেড়ে যায়। তারপর অক্সিন প্রত্যাহার করে নিলে ১০ মিনিটের মধ্যেই বৃদ্ধি হার হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যে বৃদ্ধি হার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

(২) অক্সিন (সাধারণত অন্যান্য হরমোনের মতো) খুবই কম মাত্রায় (যেমন- $১০^{-৬}$ মোলার) সক্রিয়। তাই অক্সিনের মাধ্যমে একটি প্রারম্ভিক ট্রিগারিং প্রতিক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটে। এটি নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে : (ক) কতিপয় এনজাইমের সক্রিয়ণে একটি অ্যালোস্টেরিক ইফেক্টর (effector) হিসেবে কাজ করে, (খ) কতিপয় এনজাইমের সংশ্লেষণকে উদ্দীপিত করে, অথবা (গ) ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটায়।

(৩) এটি সুস্পষ্টও যে, কয়েক ঘন্টা ধরে কোষের দীর্ঘীকরণ চলার জন্য ক্রমাগত RNA (বিশেষ করে (mRNA) এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। নতুন RNA (mRNA) এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের উপর অক্সিনের কোষ দীর্ঘীকরণের হার বৃদ্ধির ক্ষমতা নির্ভরশীল।

(৪) অক্সিনের কতিপয় প্রতিক্রিয়া এতো দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, জিনের সক্রিয়ণ যে অক্সিনেরই প্রধান কাজ তা অনুধাবন করা যায় না। যেমন- অক্সিন প্রয়োগের ১০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ভ্রূণমুকুলাবরণী এবং কাণ্ডের খণ্ডের দীর্ঘীকরণ হয় : ২০ সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের চলন (streaming) প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় এবং ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে অক্সিন কর্তৃক ঝিল্লির পটেনশিয়ালের পরিবর্তন ঘটে।

অক্সিন-প্ররোচিত কোষ দীর্ঘীকরণে পানি সম্পর্ক

অক্সিন-প্ররোচিত কোষ দীর্ঘীকরণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। কোষপ্রাচীর শিথিলকরণের (loosening) জন্য বিশেষভাবে অক্সিনের প্রয়োজন হয়, কোষ দীর্ঘীকরণের নিজের জন্য নয়। আমরা জানি $\psi = \psi_\pi + \psi_\rho$। অক্সিন কর্তৃক পানি পরিশোষণ দ্রুত করার জন্য বাইরের তুলনায় কোষের অভ্যন্তরে পানির পটেনশিয়ালকে অবশ্যই অধিকতর ঋণাত্মক হতে হবে। যদি ψ_π অধিকতর ঋণাত্মক হয় অথবা ψ_ρ হ্রাস পায় তাহলে ψ অধিকতর ঋণাত্মক হতে পারে। অক্সিনের প্রতিক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলি পর্যায়ক্রমিকভাবে সংঘটিত হয়।

(১) অক্সিন কোষপ্রাচীরের শিথিলকরণকে ত্বরান্বিত করে, তাই কোষপ্রাচীরের প্রসারণশীলতার বাধা হ্রাস পায়, (২) ψ_ρ হ্রাস পায়, (৩) অন্তঃস্থ ψ অধিকতর ঋণাত্মক হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে পানি কোষে প্রবেশ করে, (৪) কোষের আয়তন বেড়ে যায় এবং কোষপ্রাচীর অপরিবর্তনশীলভাবে প্রসারিত হয়।

অক্সিনের কোষপ্রাচীর শিথিলকরণ ক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বৈত ক্রিয়া প্রাথমিক অবস্থায় ইলাসটিসিটি (elasticity) এবং পরবর্তীতে প্লাসটিসিটির (plasticity) উপর প্রভাব। এ দুটি প্রভাবের মধ্যে শেষোক্তটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কোষপ্রাচীরের প্লাসটিসিটির সাথে কোষ

দীর্ঘীকরণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সঠিক মাত্রায় অক্সিন প্রয়োগ করে কোষ দীর্ঘীকরণের একটি চক্র সমাপ্তির পর অক্সিন প্রত্যাহার করে নিলে কোষপ্রাচীরের দৃঢ়তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

অক্সিন-প্ররোচিত কোষপ্রাচীর শিথিলকরণের প্রকৃতি

প্রাথমিক কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল এবং অন্যান্য পলিস্যাকারাইড আড়াআড়িভাবে সজ্জিত থাকে। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার অ্যালবারসিম (Peter Albersheim) এবং সহযোগিরা প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের ম্যাক্রোমলিকুলার উপাদানগুলোর ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন।

অ্যালবারসিম এবং সহযোগিরা অক্সিন-প্ররোচিত কোষ দীর্ঘীকরণের একটি মডেল উদ্ভাবন করেছেন ; এর বৈশিষ্ট্য এরূপ। যেহেতু কোষপ্রাচীর দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়, তাই সেলুলোজ ফাইব্রিলগুলো তাদের দৈর্ঘ্য বরাবর পরস্পর থেকে সরে যাওয়া অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে, প্রসারিত এবং প্রসারিত হয়নি এমন কোষপ্রাচীরের দৃঢ়তা একইরকম ; এটি নির্দেশ করে যে, প্রসারণের পূর্বে এবং প্রসারণ হওয়ার পর একই ক্ষেত্রফলের কোষপ্রাচীরে আড়াআড়ি সংযোজকের সংখ্যা এবং রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণের পার্থক্য খুব সামান্য। অর্থাৎ পলিমারগুলোর মধ্যে আড়াআড়ি সংযোজক বন্ধনীর ভাঙ্গনের ফলে যদি কোষপ্রাচীর প্রসারিত হয়, তাহলে কোষ দীর্ঘীকরণের পর নতুন আড়াআড়ি সংযোগ তৈরির একটি পদ্ধতি অবশ্যই আছে।

কোষপ্রাচীরের আড়াআড়ি সংযোজকের ভাঙা ও তৈরি হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানী অ্যালবারসিম এবং সহযোগিরা একটি প্রকল্পের প্রস্তাব করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, জাইলোগ্লুকান পলিমার এবং সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনীই হলো কোষপ্রাচীরের গঠনগত পলিমারগুলোর মধ্যে একমাত্র অসমযোজী (non-covalent) আড়াআড়ি সংযোজক। সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল বরাবর জাইলোগ্লুকান স্থানান্তর সম্ভব হয় একটি কৌশলের মাধ্যমে (এনজাইমঘটিত অথবা এনজাইমঘটিত নয়) যা হাইড্রোজেন বন্ধনী ভাঙা ও তৈরি হওয়াকে ত্বরান্বিত করে ; এটি আবার সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল বরাবর জাইলোগ্লুকানকে স্থানান্তরে সহায্য করে। জাইলোগ্লুকান পলিমারের এই স্থানান্তর হারকে কতকগুলো প্রভাবক ত্বরান্বিত করে, যেমন- উচ্চ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা, যা হাইড্রোজেন বন্ধনীকে দুর্বল করে দেয়। pH বাড়িয়ে অথবা তাপমাত্রা কমিয়ে এই উচ্চ হারের স্থানান্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করা সম্ভব। উপরন্তু, যেহেতু জাইলোগ্লুকান পলিমারের রিডিউসিং প্রান্ত সমযোজী বন্ধনীর সাহায্যে কোষপ্রাচীরের অ-সেলুলোজিক উপাদানের সাথে লেগে থাকে, তাই স্থানান্তরের সময় এটি কোষপ্রাচীরে একদিকে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণে হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপের ফলে যখন সন্নিকটবর্তী সেলুলোজ ফাইব্রিলগুলো বিপরীতদিকে দ্রুতবেগে স্থানান্তরিত হয় তখন প্রতিটি সেলুলোজ ফাইব্রিলে লেগে থাকা জাইলোগ্লুকান পরিমারগুলো কেবল একদিকেই স্থানান্তরিত হয়।

অ্যালবারসিম এবং সহযোগীরা আরো প্রস্তাব করেছেন যে, অক্সিন কোষ-ঝিল্লিতে একটি হাইড্রোজেন আয়ন পাম্পকে সক্রিয় করতে পারে, এজন্য কোষপ্রাচীরে pH হ্রাস পায়, জাইলোগ্লুকান স্থানান্তর বৃদ্ধি পায় এবং তাই কোষপ্রাচীর বেশি শিথিল হয়।

অক্সিনের ক্রিয়ার স্থান

বর্তমানে অক্সিনের ক্রিয়ার স্থান সম্পর্কে দুটি প্রধান ধারণা প্রচলিত আছে। একটি ধারণায় কোষ-প্রাচীরকে অক্সিনের ক্রিয়ার স্থান বলে বিবেচনা করা হয়, যা অ্যালবারসিম এবং সহকর্মীদের গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে। অপর ধারণায় নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাকের উপর আলোকপাত করা হয়। অক্সিন প্রয়োগে অনেক কোষপ্রাচীর শিথিলকরণ প্রক্রিয়া সরাসরি নিউক্লিয় কার্যকলাপ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, অক্সিন প্ররোচিত বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার সাথে বর্ধিত RNA সংশ্লেষণ সম্পর্কিত। তাই অক্সিনের ক্রিয়ার স্থান একাধিক।

নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন বিপাকের উপর অক্সিনের প্রভাব

এটি সুস্পষ্ট যে, কোষের অব্যাহত দীর্ঘীকরণের জন্য অব্যাহতভাবে RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রয়োজন। অক্সিন তিন প্রকার RNA এর সংশ্লেষণই বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে rRNA এর সংশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে, যেহেতু mRNA এর তুলনায় rRNA এবং tRNA এর গড় আয়ুষ্কাল বেশি, তাই অক্সিনের প্রভাবে এ দুপ্রকার RNA বেশি জমা থাকে। অক্সিন-প্ররোচিত কোষ দীর্ঘীকরণের হারের ক্ষমতা নতুন RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। পূর্বে সংশ্লেষিত RNA এবং প্রোটিনের সাহায্যে অক্সিন বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। এই পর্যবেক্ষণের সরল ব্যাখ্যা হলো যে, (যদিও সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে) সুনির্দিষ্ট RNA, সম্ভবত mRNAএর সংশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্সিন অংশ নেয়, অর্থাৎ অক্সিনের কাজ হলো ট্রান্সক্রিপশনাল (transcriptional) পর্যায়ে নির্দিষ্ট জিন সক্রিয় করার কোনো শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষণের ছাঁচ (template) হিসেবে এসব RNA কাজ করে।

অক্সিনের ক্রিয়ার অ্যাসিড বৃদ্ধি মতবাদ

অ্যাসিড-বৃদ্ধি মতবাদ অনুসারে অক্সিন একটি অম্লকরণ (acidification) প্রক্রিয়ার, সম্ভবত একটি ঝিল্লি আবদ্ধ হাইড্রোজেন আয়ন পাম্প সূত্রপাত করে। এরফলে কোষপ্রাচীরের ম্যাট্রিক্সের দ্রবণের pH হ্রাস পায়। কোষপ্রাচীরের শিথিলকরণে দায়ী কতিপয় (এখনও কাল্পনিক) এনজাইম নিম্ন pH সক্রিয় হয়, কোষপ্রাচীর শিথিল হয় এবং কোষের নিজস্ব রসস্ফীতি চাপে কোষের দীর্ঘীকরণ হয়।

অক্সিন-প্ররোচিত কোষ দীর্ঘীকরণে হাইড্রোজেন আয়ন যে, একটি দ্বিতীয় বার্তাবাহক (second messenger) হিসেবে কাজ করে তা প্রথম প্রকাশ করেন ডি. এল. রেলী এবং আর. ক্লিল্যান্ড (D.L. Rayle and R. Cleland) ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে এবং নিম্নলিখিত প্রমাণাদি একে সমর্থন করে : (১) নিম্ন pH জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণী এবং মটর ও সয়াবিনের কাণ্ডের অংশ অধিকতর দ্রুত গতিতে দীর্ঘ হয়, (২) জই এবং সূর্যমুখীর কোষপ্রাচীরের প্রসারণশীলতা নিম্ন pH বৃদ্ধি পায়, (৩) জই, মটর ও ভুট্টায় অক্সিন-বর্ধিত দীর্ঘীকরণের পূর্বে অক্সিন প্ররোচিত হাইড্রোজেন আয়নের নির্গমন হয়, এবং (৪) কতকগুলো প্রাচীর আবদ্ধ এনজাইমের, গ্লাইকোসাইডেজ, অপেক্ষাকৃত নিম্ন pH-এ সর্বোত্তম ক্রিয়া করে।

অক্সিন-প্ররোচিত হাইড্রোজেন আয়নের নির্গমন এবং এর প্রভাবে ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ডের অধিকতর বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষমতার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে অ্যাসিড বৃদ্ধি মতবাদ প্রকাশের আগেই জানা গেছে। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে জেমস বনার (James Banner) বলেন যে, pH ৭.২ এর তুলনায় pH ৪.১-এ ভ্রূণমুকুলাবরণীর বৃদ্ধি আট গুণ বেশি হয়। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে,

BANSDOC Library DHAKA

নিম্ন pH-এ জন্য কোষপ্রাচীরের প্রসারণশীলতা অনেক বেড়ে যায়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কে. ভি. থিম্যান (K.V. Thimann) লক্ষ্য করেন যে, অক্সিনের প্রভাবে ভ্রূণমুকুলাবরণী খণ্ডের দীর্ঘীকরণের সাথে সাথে ইনকিউবেশন মাধ্যমেরও অম্লকরণ হয়। একইবছর বিজ্ঞানী জিন এবং কলেটি নিচ (Jean and Collette Nitsch) পর্যবেক্ষণ করেন যে, অক্সিন উপস্থিত থাকলেও অথবা না থাকলেও উভয়ক্ষেত্রেই কোষ দীর্ঘীকরণের উপর হাইড্রোজেন আয়নের ধণাত্মক প্রভাব আছে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীর-শিথিলকরণ প্রভাবক যদি হাইড্রোজেন আয়ন হয়, তাহলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। একটি হলো যে, বহিঃস্থ অক্সিন এবং বহিঃস্থ হাইড্রোজেন আয়নের জন্য একইরকম বৃদ্ধির উদ্দীপনা হবে। জই-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ডে এটিই সত্যিকার অর্থে ঘটে। অক্সিন প্রয়োগের প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যেই খণ্ডগুলো দীর্ঘ হতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তী ১০ থেকে ১৫ মিনিটে সর্বোচ্চ হারে পৌঁছায়। অনুরূপভাবে, সর্বোত্তম হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রায় (pH ৩.০) দীর্ঘীকরণের একই সর্বোচ্চ হার হয়, কিন্তু মন্থর গতির সময়সীমা (lag period) মাত্রা প্রায় ১ মিনিট। অক্সিন এবং হাইড্রোজেন আয়ন উভয়েই একইভাবে প্রাচীরের প্রসারণশীলতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোষের রসস্ফীতি চাপ সর্বোচ্চ থাকলেই উভয়েই ক্রিয়াশীল এবং উভয়েই দীর্ঘীকরণের জন্য একই রকম অস্বাভাবিক তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু, অক্সিন এবং হাইড্রোজেন আয়নের বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়ায় পার্থক্য আছে। বিপাকীয় রোধক (যেমন- সায়ানাইড এবং ডাইনাইট্রোফেনল) অক্সিন-প্ররোচিত দীর্ঘীকরণকে বাধা দেয়, কিন্তু অ্যাসিড-প্ররোচিত প্রতিক্রিয়ার উপর এর কোনো প্রভাব নেই। অধিকন্তু, অক্সিন নয়, কিন্তু অম্লীয় দ্রবণ প্রাচীরকে শিথিল করে, পৃথকীকৃত কোষপ্রাচীরে প্রয়োগ করা হলেও।

দীর্ঘীকরণের জন্য হাইড্রোজেন আয়নের সর্বোত্তম ঘনমাত্রা নির্ধারণে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ভ্রূণমুকুলাবরণী খণ্ডের কিউটিকুল অক্ষত থাকে কি থাকে না তার উপর এর উত্তর প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে। কিউটিকুল অক্ষত থাকলে, ইনকিউবেশন দ্রবণের pH কেবল ৫ এর কম হলে খণ্ডগুলো প্রসারিত হয় এবং সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়ার জন্য pH ৩ এর প্রয়োজন। তবে মোমযুক্ত কিউটিকুল (হাইড্রোজেন আয়ন প্রবেশে বাধা দেয়) ঘষে সরিয়ে দিলে, pH ৫.৮ এর কম হলে কোষ-প্রাচীর শিথিলকরণ প্ররোচিত হয় এর সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ৪.৮ অথবা এর চেয়েও কম pH-এ।

অ্যাসিড বৃদ্ধি মতবাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দ্বিতীয় প্রধান নির্ণায়ক যা পূরণ করতে হবে তা হলো বৃদ্ধি-ত্বরান্বিতকারী মাত্রর অক্সিনকে ভ্রূণমুকুলাবরণীর কোষ থেকে হাইড্রোজেন আয়ন নির্গমন করতে হবে। যদি ভ্রূণমুকুলাবরণীর খণ্ডকে চেঁছে কিউটিকল অপসারিত করে অল্প আয়তনের লঘু বাফার দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে এবং সময়ের সাথে pH নিয়ন্ত্রণ করলে প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যে অক্সিন-প্ররোচিত অম্লকরণ দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

অক্সিন কিভাবে কোষপ্রাচীর অম্লকরণ করে তার কৌশল এখনও জানা যায়নি, তবে এ বিষয়ে দুটি কাল্পনিক মডেল বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি মডেলে অনুমান করা হয় যে, অক্সিনের প্রধান কার্য সম্পন্ন হয় কোষঝিল্লিতে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে হার্ডিন, চেরী, মোর এবং লেম্বি (Hardin, Cherry, Morre and Lembi) প্রস্তাব করেন যে, সয়াবিনের কোষ-ঝিল্লিতে একটি নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টর আছে যা হলো অপসারিত অক্সিন এবং এটি সয়াবিনের হাইপোকটাইল এর বিশুদ্ধ RNA পলিমারেজের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এই মডেল অনুসারে অক্সিনের প্রাথমিক ক্রিয়া হয় কোষঝিল্লির সাথে এবং অক্সিন-নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণেও এর প্রভাব আছে।

BANSDOC Library
18137

যদিও এই মডেলটি অনেকাংশে কাল্পনিক, তথাপিও একটি রিসিপ্টর মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, যা আবার একটি সুনির্দিষ্ট RNA পলিমারেজের সাথে ক্রিয়া করতে পারে, অক্সিন এবং কোষ-ঝিল্লির পারস্পরিক ক্রিয়া নিউক্লিয়াসে স্থানান্তরিত হতে পারে। এই ক্রিয়ার ফলে DNA ট্রান্সক্রিপশন পরিবর্তিত হয় এবং RNA সংশ্লেষণের পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন হয়। এটি ধারণা করা হয় যে, রিসিপ্টরের সাথে অক্সিনের ক্রিয়ার জন্য কোষঝিল্লি থেকে কোষপ্রাচীরে একটি হাইড্রোজেন আয়ন মুক্ত হয়, এই প্রভাব কোষপ্রাচীরের শিথিলকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলেই প্রতীয়মান হয়।

বিজ্ঞানী রে (Ray, 1977) বলেছেন যে, ভুট্টার ভ্রূণমুকুলাবরণীর অমসৃণ অন্তঃপ্লাজমীয় জালিতে অক্সিনের প্রতি ঘনিষ্ঠ আকর্ষণসম্পন্ন বন্ধন স্থান (binding site) আছে, এবং তিনি অক্সিনের ক্রিয়ার একটি বিকল্প মডেলের প্রস্তাব দেন। এক্ষেত্রে অক্সিনের প্রথমিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় অন্তঃপ্লাজমীয় জালির ঝিল্লিতে। তিনি যুক্তি দেন যে, অন্তঃপ্লাজমীয় জালিতে রিসিপ্টর স্থানের সাথে সংযুক্তি, সাইটোপ্লাজম থেকে অন্তঃপ্লাজমীয় জালির সিস্টারনাল (cisternal) স্থানে হাইড্রোজেন আয়নের স্থানান্তরকে প্ররোচিত করে। অন্তঃপ্লাজমীয় জালির নিঃস্রাবী (secretory) প্রোটিনের সাথে হাইড্রোজেন আয়ন কোষপ্রাচীরে স্থানান্তরিত হয়, সম্ভবত গলজি তন্ত্রের মাধ্যমে এটি সংঘটিত হয়।

অক্সিনের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি

অক্সিন নিম্নলিখিত শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে :

১. **কোষ দীর্ঘীকরণ** (Cell elongation) : উদ্ভিদ কোষের দীর্ঘীকরণে অক্সিন সহায়তা করে। তবে অক্সিন কিভাবে কোষ দীর্ঘ করে সে বিষয়ে অনেক মতবাদ আছে। সম্ভবত নিম্নলিখিত কারণে অক্সিন কোষকে দীর্ঘ করতে পারে :

(ক) কোষের অভিস্রবণীয় চাপ বৃদ্ধি করে, অথবা

(খ) কোষপ্রাচীরের চাপ কমিয়ে দিয়ে, অথবা

(গ) কোষের ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে, অথবা

(ঘ) বার্তাবাহক RNA (mRNA) এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে সুনির্দিষ্ট এনজাইম তৈরিকে সহায়তার মাধ্যমে।

২. **অগ্রমুকুলের প্রাধান্য** (Apical dominance) : অনেক উদ্ভিদে দেখা যায় যে, অগ্রমুকুলের উপস্থিতিতে পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অগ্রমুকুলে যে অক্সিন তৈরি হয় তা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পার্শ্বমুকুলে আসে এবং এর বৃদ্ধি ব্যাহত করে। যদি অগ্রমুকুল কেটে ফেলে অক্সিনের উৎস নষ্ট করে দেয়া যায়, তবে পার্শ্বমুকুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

৩. **শিকড় গজানো** (Root initiation) : যে পরিমাণ অক্সিন কাণ্ডের বৃদ্ধির সহায়তা করে, সে পরিমাণ অক্সিন মূলের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে, কিন্তু শাখামূলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাই যে সমস্ত উদ্ভিদে কাণ্ডের কাটা অংশের দ্বারা বংশবিস্তার হয়, কৃত্রিম অক্সিন প্রয়োগ করে এসব কাটা অংশের শিকড় গজান ত্বরান্বিত করা যায়।

৪. **পাতা ও ফল পতন বন্ধকরণ** : পাতা ও ফলের গোড়াতে অ্যাবসিসিসিন স্তর তৈরি রোধ করে অক্সিন অপরিণত পাতা ও অপক্ব ফল পতন বন্ধ করে।

৫. **পার্থেনোকার্পি** (Parthenocarpy) : অক্সিন প্রয়োগ করলে নিষিক্তকরণ ছাড়াই ফল উৎপাদিত হয় এবং এ ফলে কোনো বীজ থাকে না। এ প্রক্রিয়াকে পার্থেনোকার্পি বলে। প্রকৃতিতেও এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

৬. **ক্যালাস** (Callus) **প্রস্তুতকরণ** : কোষের দীর্ঘীকরণ ছাড়াও অক্সিন কোষের বিভাজনেও সহায়তা করে।

৭. **ফটোট্রপিজম বা আলোক-নির্ণীত চলন** (Phototropism) : উদ্ভিদ অঙ্গের চলন আলোকের গতিপথ প্রভাবিত হলে তাকে আলোক-নির্ণীত চলন বলে। সাধারণত উদ্ভিদের কাণ্ড আলোর উৎসের দিকে এবং মূল আলোর উৎসের বিপরীত দিকে বর্ধিত হয়। তাই উদ্ভিদের কাণ্ড অভিগ আলোকবর্তী এবং মূল প্রতীপ আলোকবর্তী। উদ্ভিদের আলোক-নির্ণীত চলনের সাথে অক্সিনের সম্পর্ক বিদ্যমান। আলোর প্রভাবে উদ্ভিদের আলোকিত অংশের অক্সিনের প্রয়োজন হয়। তাই কাণ্ডের ক্ষেত্রে আলোকিত অংশের বিপরীত দিকে অক্সিনের পরিমাণ বেশি থাকায় সে প্রান্তে বৃদ্ধি বেশি হয়, ফলে কাণ্ড আলোকাভিমুখী হয়। মূলের আলোকিত অংশের অক্সিনের পরিমাণ কম থাকায় সে অংশের বৃদ্ধি বেশি হয় ফলে মূল আলোর বিপরীত দিকে বেঁকে যায়।

৮. **জিওট্রপিজম বা অভিকর্ষ-নির্ণীত চলন** (Geotropism) : পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অভিকর্ষের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের চলনকে অভিকর্ষ নির্ণীত চলন বলে। উদ্ভিদের প্রধান মূল অভিকর্ষের দিকে এবং কাণ্ড এর বিপরীত দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রধান মূল অভিগ ও অভিকর্ষবর্তী (positively getroptic) এবং কাণ্ড প্রতীপ অভিকর্ষবর্তী (negatively geotropic)। আলোক নির্ণীত চলনের মতো অভিকর্ষ-নির্ণীত চলনও অক্সিনের কার্যের সাথে জড়িত। মৃত্তিকায় সমান্তরালভাবে রাখা উদ্ভিদ অঙ্গের নিচে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অক্সিনের পরিমাণ বেশি থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অক্সিনের যে ঘনত্ব কাণ্ডের বৃদ্ধির সহায়তা করে সে ঘনত্ব মূলের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। তাই কাণ্ডের নিম্নাংশের কোষে অক্সিনের ঘনত্ব বেশি থাকায়, উপরের অংশ থেকে নিম্নাংশের কোষগুলো অধিকতর বৃদ্ধি পায়, ফলে কাণ্ড খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠে। অপরদিকে, মূলের নিম্নাংশের অধিকতর ঘন অক্সিন সে অংশের কোষের বৃদ্ধিকে বাধা দেয় এবং উপরের অংশে অক্সিন কম ঘন থাকায় সেখানকার কোষ অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল অভিকর্ষ অভিমুখী হয়।

কৃত্রিম অক্সিন এবং কৃষিক্ষেত্রে তার ব্যবহার

অক্সিনের বহুবিধ কার্যাবলি আবিষ্কারের পর IAA এর মতো অন্য কোনো কৃত্রিম পদার্থের এ জাতীয়-ক্ষমতা আছে কিনা তা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কতগুলো কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোন আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ইন্ডোল প্রোপায়নিক অ্যাসিড (IPA), ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড (IBA), আলফা এবং বিটা ন্যাপথেলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (NAA), ফেনক্সিঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (FAA), ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (PAA), ২,৪- ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (২,৪,-ডি) এবং ২,৪,৫-ট্রাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (২,৪,৫--টি) এর নাম করা যেতে পারে। কৃষিবিদ এবং উদ্যানবিদরা এ সমস্ত কৃত্রিম অক্সিন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করছেন।

১. **শিকড় গজানো** (Rooting) : অনেক উদ্ভিদ পাতা ও কাণ্ডের কাটা অংশের (cutting) দ্বারা বংশবিস্তার করে। এ কাটা অংশের সাফল্য নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি এতে শিকড় গজায় তার উপর। কৃত্রিম অক্সিন ব্যবহার করে শিকড় গজান ত্বরান্বিত করা যায়। IBA প্রয়োগ করে এলাচি লেবু ও বীজশূন্য লেবুর পাতার কলম সম্ভব হয়েছে। NAA এর সাহায্যে আমের গুটিকলমে শতকরা একশত ভাগই শিকড় গজিয়েছে। IAA এবং IBA প্রয়োগ করে লিচুর ভাল গুটি কলম সম্ভব হয়েছে।

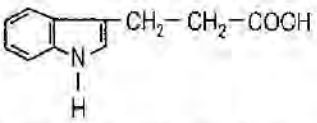

ইন্ডোল -৩- প্রোপায়নিক অ্যাসিড

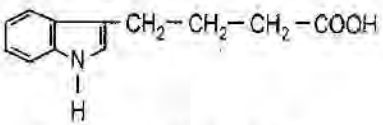

ইন্ডোল -৩- বিউটারিক অ্যাসিড

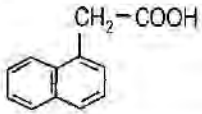

আলফা-ন্যাপথেলিন অ্যাসিটিক এসিড

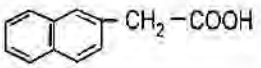

বিটা-ন্যাপথেলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড

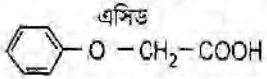

ফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড

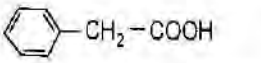

ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড

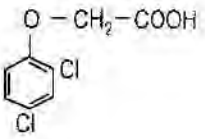

২,৪ - ডি

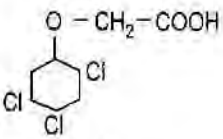

২,৪,৫ - ডি

চিত্র ৫.৪ : কতিপয় কৃত্রিম অক্সিনের গাঠনিক সংকেত

২. **বীজশূন্য ফল উৎপাদন বা পার্থেনোকার্পি** (Parthenocarpy) : বীজশূন্য ফল সবার কাছে অধিক পছন্দ। প্রকৃতিতে বীজ তৈরির সাথে সাথেই ফল তৈরি হয় এবং এটি পরাগায়নের উপর নির্ভরশীল। ফুলের গর্ভমুণ্ড অথবা গর্ভাশয়ে কৃত্রিম অক্সিন প্রয়োগ করে নিষিক্তকরণ ছাড়াই ফল উৎপাদান করা যায়। এসব ফলে কোনো বীজ থাকে না এবং ফল বেশ বড় হয়। IAA এবং IBA প্রয়োগ করে পেয়ারা, টমেটো, আপেল, পেঁপে এবং কমলালেবুর বীজশূন্য ফল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। অদূর ভবিষতে অক্সিন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো সুস্পষ্ট হলে ফল উৎপাদনকারীরা বেশ বড় আকারের বীজশূন্য ফল ইচ্ছামতো তৈরি করতে পারবেন।

৩. **ফুল, ফল এবং পাতা পাতলাকরণ** (Thinning) : কোনো কোনো উদ্ভিদে দেখা যায় যে, একবছর হয়তো খুব বেশি সংখ্যায় ফুল ও ফল হলো, কিন্তু পরের বছর ফুল হয় না অথবা হলেও খুব সামান্য সংখ্যায় হয়। তাই এসব উদ্ভিদে ফুল ও ফল পাতলা করা দরকার। হাত দিয়ে পাতলাকরণ খুব অসুবিধাজনক এবং ব্যয়বহুল। কৃত্রিম অক্সিন ব্যবহার করে সাফল্যের সাথে এসব করা সম্ভব হয়েছে। যেসব দেশে যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে, সেখানে ফল সংগ্রহের জন্য পাতার সংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, যান্ত্রিক উপায়ে তুলা সংগ্রহের সময় তুলাগাছে বেশি পাতা

থাকলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই তুলা সংগ্রহের পূর্বে অক্সিন প্রয়োগ করে পাতার সংখ্যা হ্রাস করা হয়।

৪. **অপক্ক ফল পতন বন্ধকরণ** (Prevention of pre-harvest drop of fruit) : ফলের গোড়াতে অ্যাবসসিসন স্তর তৈরি হওয়ার জন্য অনেক উদ্ভিদের ফল পরিপূর্ণভাবে পাকার আগেই ঝরে পড়ে। এতে ফল উৎপাদনকারীদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়। NAA ব্যবহার দ্বারা অ্যাবসসিসন স্তর তৈরি বন্ধ করে অথবা বিলম্ব করিয়ে অপক্ক ফল পতন বন্ধ করা যায়।

৫. **পুষ্পায়ন** (Flowering) : অক্সিন ব্যবহার করে ইচ্ছামতো উদ্ভিদে ফুল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এতে সুবিধা হলো যে, বারোমাসই একই সাথে একই আকারের ফল পাওয়া যায়। ২,৪-ডি এবং NAA পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করে আমাদের দেশেও এ সময়ে আনারস উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

৬. **সুপ্তাবস্থা নিয়ন্ত্রণ** (Control of dormancy) : বীজ, কন্দ, স্ফীতকন্দ, গুঁড়িকন্দ প্রভৃতির সুপ্তাবস্থার সময় অক্সিন বৃদ্ধি করতে পারে এবং এটি শস্যের গুদামজাতকরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গোলআলুতে দেখা গেছে যে, কিছুদিন গুদামজাত করার পরই আলু অঙ্কুরিত হতে থাকে। এর ফলে কৃষক-ব্যবসায়ীদের খুবই অসুবিধা হয়। তাই IBA এবং NAA আলুতে প্রয়োগ করে দুই-তিন বছর পর্যন্ত আলু গুদামজাত করা সম্ভব হয়েছে। কতগুলো অক্সিন আবার সুপ্তাবস্থা তাড়াতাড়ি ভেঙে অঙ্কুর গজাতে সাহায্য করে।

৭. **ফলের পক্কতা ও মিষ্টতা নিয়ন্ত্রণ** : কলা এবং আপেলে ২, ৪-ডি প্রয়োগ করে দ্রুত পক্কতা আনয়ন এবং মিষ্টতা বর্ধন সম্ভব হয়েছে। পক্কতার সময়ে এটি স্টার্চকে চিনিতে রূপান্তরিত করার কাজ ত্বরান্বিত করে।

৮. **লজিং বন্ধকরণ** : (Prevention of lodging) : অনেক উদ্ভিদ, বিশেষ করে গ্রামিনি গোত্রের উদ্ভিদ কিছুটা বড় হওয়ার পর হেলে পড়তে চায়। একেই লজিং বলে। আলফা-ন্যাপথেলিন অ্যাসিটামাইট গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করে লজিং বন্ধ করা যায়।

৯. **আগাছানাশক ওষুধ হিসেবে** (Weed killer) : আগাছা নিয়ন্ত্রণে অক্সিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারে ২, ৪-ডি সবচেয়ে বেশি কার্যকর। চওড়া পাতাবিশিষ্ট দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উপর উপযুক্ত সময়ে ও মাত্রায় ২, ৪-ডি ছিটিয়ে দিলে শ্বসনের গতি বৃদ্ধি পাওয়াতে গাছ মরে যায়, কিন্তু গ্রামিনি গোত্রের উদ্ভিদের কোনো ক্ষতি হয় না। সৌভাগ্যবশত অধিকাংশ খাদ্যশস্যই গ্রামিনি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাই এসব খাদ্যশস্যের জমিতে আগাছা দমনের জন্য অক্সিন ব্যবহার করা হচ্ছে।

২। জিব্বারেলিন (Gibberellin)

আবিষ্কার ও রাসায়নিক প্রকৃতি

জিব্বারেলিন দ্বিতীয় বৃহত্তম উদ্ভিদ হরমোন। বিংশশতক কুড়ির দশকে যখন বিজ্ঞানী এফ. ডব্লিউ. ওয়েন্ট (F. W. Went) এবং অন্যান্য শারীরতত্ত্ববিদরা IAA এর প্রকৃতি এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তখন কয়েকজন জাপানি গবেষক ধান গাছের ছত্রাকজনিত একপ্রকার রোগ নিয়ে কাজ করছিলেন। *Gibberella fujikuori* নামক

ছত্রাকের আক্রমণে ধান গাছে বাঁকনী (bakanae) নামে এক প্রকার রোগ হয়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ই. কিউরোসোয়া (E. kurosawa) নামক একজন রোগতত্ত্ববিদ লক্ষ্য করেন যে,কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে জন্মালে এ ছত্রাক এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত করে যা সুস্থ ধান গাছে ছিটিয়ে দিলে বাঁকানী রোগের লক্ষণ সৃষ্টি হয়।

তবে, প্রকৃতপক্ষে জিব্বারেলিন আবিষ্কারের শুরু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কোনিসী (Konishi) নামক একজন অর্ধ-শিক্ষিত জাপানি কৃষক কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং এতে ধানের বর্তমানে যাকে বাঁকানী রোগ বলে তার প্রাথমিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এই রোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, সুস্থ গাছের তুলনায় রোগাক্রান্ত গাছ বেশি লম্বা হয়। এছাড়া পত্রবেষ্টক (leaf sheath) দীর্ঘ হয়, পাতা দীর্ঘ, সরু এবং পাতলা হয়। মূলের বৃদ্ধি এবং কুশি তৈরি হ্রাস পায়, গাছ ক্লোরোটিক এবং রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হলে গাছ মারা যায়।

১৮৯৮ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হোরি (Hori) সর্বপ্রথম এই রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক এবং রোগের বর্ণনা প্রদান করেন। কিউরোসোয়া কয়েক বার ব্যর্থতার পর অবশেষে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে *Gibberella fujikuroi* ছত্রাক জন্মানো খাদ্য মাধ্যম ধান ও ভুট্টার চারাগাছে প্রয়োগ করে বাঁকানী এই ছত্রাকের শ্রেণিবিন্যাস সংশোধন করেন এবং বলেন বাঁকানী রোগ সৃষ্টি করে *Fusarium moniliforme* sheld. , এটি হলো *Gibberella fujikuroi* (saw) wr. নামক অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাকের অযৌন অবস্থা অথবা অসম্পূর্ণ অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, *Fusarium moniliforme* বিভিন্ন প্রকার পোষককে, যেমন- ভুট্টা, তুলা, ধান, আখ আক্রমণ করে।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি, ইয়াবুটা (T. Yabuta) *Gibberella fujikuroi* নিঃসৃত পদার্থকে জিব্বারেলিন নামকরণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে টি. ইয়াবুটা এবং ওয়াই. সুমিকি (Y. Sumiki) *Gibberella fujikuroi* থেকে জীবজভাবে সক্রিয় দুটি স্ফটিকাকার পদার্থ পৃথক করেন এবং এদেরকে জিব্বারেলিন A এবং জিব্বারেলিন B নামকরণ করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে জাপানিদের গবেষণার ফলাফল জাপানের বাইরের বিজ্ঞানীদের তেমন কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে বিজ্ঞানীরা জাপান ভ্রমণ করেন এবং জিব্বারেলিন বিষয়ক গবেষণার ফলাফল ভালভাবে জানতে সক্ষম হন। তাই প্রায় ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জিব্বারেলিন পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (USDA) এর এফ.এইচ. স্টোডোলা এবং সহকর্মীরা ছত্রাকের নির্যাস থেকে জিব্বারেলিন পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রায় একই সময়, ইংল্যান্ডের ইমপেরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ-এর (ICI) বিজ্ঞানীরা [যেমন- ব্রিয়ান, বোরো, এলসন, ক্রস (Brian, Borrow, Elson, Cross)] ছত্রাকের কাজ শুরু করেন। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ উভয় গবেষণার ফলে *Gibberella fujikuroi* এর কালচার থেকে সম্পূর্ণ নতুন রাসায়নিক পদার্থ পৃথক হয় ; USDA এর বিজ্ঞানীরা একে 'জিব্বারেলিন এক্স' এবং ICI এর বিজ্ঞানীরা একে জিব্বারেলিক অ্যাসিড' নাম দেন। শেষোক্ত নামটিই বর্তমানে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

উনিশশত পঞ্চাশের দশকে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের উপর ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত জিব্বারেলিক অ্যাসিডের প্রভাব বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হয় এবং একই দশকে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে

জিব্বারেলিক অ্যাসিডের মতো প্রাকৃতিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সি.এ.ওয়েস্ট (C.A. West) এবং বি.ও. ফিন্নি (B.O. Phinney) এবং ইংল্যান্ডের ICI এর অকার্স রিসার্চ লেবরেটরীর এম. র‍্যাডলি (M. Radley) আলাদাভাবে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ থেকে প্রাকৃতিক জিব্বারেলিক অ্যাসিড পৃথক করেন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাকমিলান এবং সুটার (Macmillan and suter) *phaseolus coccineus* এর অপক্ব বীজ থেকে জিব্বারেলিক অ্যাসিড-১ (GA1) পৃথক করেন এবং এর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। একই বছর ওয়েস্ট এবং মুরাসিজ (West and Murashige) *Phaseolus vulgaris* এর বীজ থেকে GA_1 পৃথক করে শনাক্ত করেন। বর্তমানে এটি সুনিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে, সব উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রজাতিতেই প্রাকৃতিকভাবে জিব্বারেলিন উপস্থিত। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ থেকে তের প্রকার জিব্বারেলিক অ্যাসিড পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে GA-3 ($C_{19}H_{22}O_6$) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

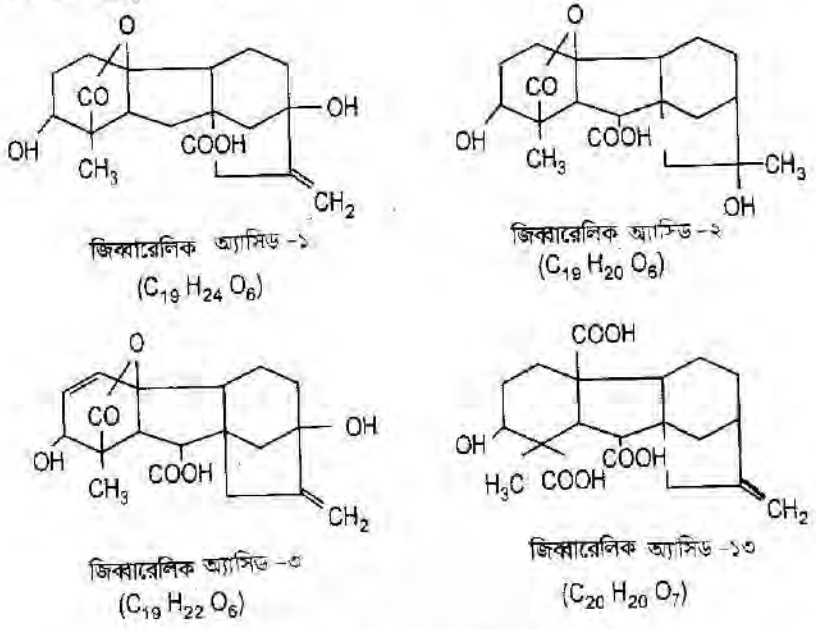

চিত্র ৫.৫ : কতিপয় জিব্বারেলিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত

প্রাকৃতিকভাবে জিব্বারেলিক অ্যাসিড তিনটি রাসায়নিক অবস্থায় থাকে, এদের মধ্যে দুটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয়েছে, কিন্তু তৃতীয়টি কাল্পনিক। এগুলো হলো (ক) মুক্ত GA, (খ) সংযুক্ত GA এবং (গ) অন্যান্য পানিতে দ্রবণীয় অথবা আবদ্ধ GA।

মুক্ত GA ১৯-কার্বন অথবা ২০-কার্বন, মনো-, ডাই- অথবা ট্রাই-কার্বোঅক্সালিক অ্যাসিড হিসেবে থাকে। ২০-কার্বন এবং ১৯-কার্বন GA হলো সেসব যৌগ যাতে যথাক্রমে কার্বন অণু ২০ আছে অথবা নেই। GA গুলোর মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য হলো A বলয়ে একটি ল্যাকটোন কনফিগারেশনের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি এবং হাইড্রোক্সাল গ্রুপের সংখ্যা ও অবস্থান।

জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈবসংশ্লেষণ

জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈব-সংশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য এসেছে *Gibberella fujikuroi* ছত্রাকের উপর গবেষণার মাধ্যমে ; তবে ধারণা করা হয় যে, উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে একইভাবে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষণ হয়। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈব-সংশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে বন্য কিউকাম্বারের *(Marah macrocarpus)* অপক্ব বীজের সস্য নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সি.এ. ওয়েস্ট এবং সহকর্মীদের গবেষণার ফলাফল থেকে। জিব্বারেলিন রাসায়নিকভাবে প্রাকৃতিক রাবার, ক্যারোটিনয়ড এবং স্টেরয়েড-এর (এদেরকে একত্রে টারপেনয়েড বলে) সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই কতিপয় টারপেনয়েড পদার্থের জৈব-সংশ্লেষণ পথের সাথে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষণের সাদৃশ্য আছে। চিত্র ৫.৬-এ জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈব-সংশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।

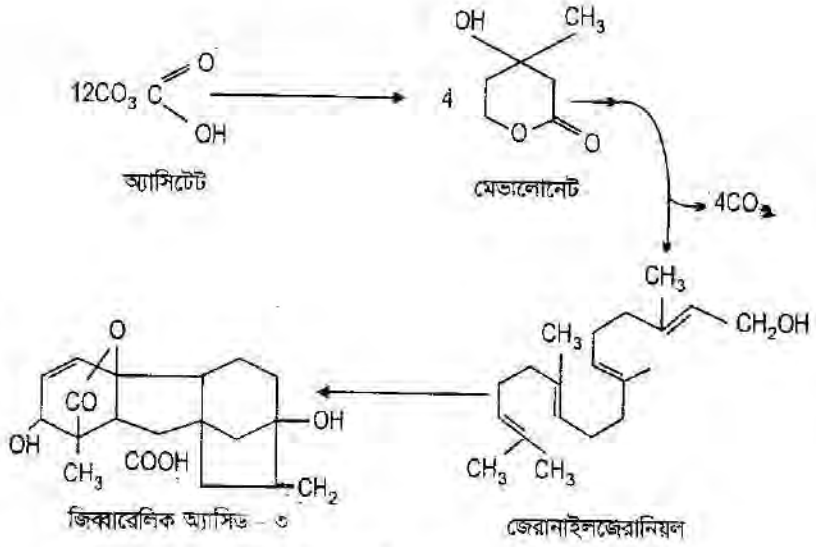

চিত্র ৫.৬ : জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈব-সংশ্লেষণের প্রস্তাবিত পথ

জিব্বারেলিনের স্থানান্তর

জাইলেম ও ফ্লোয়েমসহ সব কলায় এবং সবদিকেই জিব্বারেলিন দ্রুতগতিতে স্থানান্তরিত হয়।

জিব্বারেলিনের বায়োঅ্যাসে

জিব্বারেলিনের কয়েকটি বায়োঅ্যাসের মধ্যে দুটির বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো :

১. খর্বকায় ভুট্টা পরীক্ষা (Dwarf maize test) : উদ্ভিদ প্রজাতির খর্বকার জাতে জিব্বারেলিন প্রয়োগ করলে কাণ্ড দীর্ঘ হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদে খর্বকায় অবস্থার জন্য একটি রিসিসিভ জিন দায়ী। এ পরীক্ষার জন্য কেবল একটি রিসেসিভ জিনের জন্য দায়ী উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়।

এই পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজতর এবং এর জন্য বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। খর্বকায় এবং স্বাভাবিক ভুট্টার বীজ ভিজিয়ে স্যাঁতস্যাতে ভারমিকিউলাইটে বপন করা হয়। প্রথম পাতা অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকারে রাখা হয়। তারপর প্রথম পাতার গোড়ায় জিব্বারেলিন প্রয়োগ করা হয়। পরিশেষে পত্রাবরণীর (leaf sheath) প্রসারণ (extension) পরিমাপ করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, ০.০০১ থেকে ১০ মাইক্রোগ্রাম পরিসরে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে পত্রাবরণীর প্রসারণও বৃদ্ধি পায়।

২. **যবের সস্য পরীক্ষা** (Barley endosperm test) : দানাশস্য, যেমন– যব, গম, জই প্রভৃতির বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় ভ্রূণ থেকে জিব্বারেলিন নির্গত হয়ে অ্যালিউরোন কোষে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে আলফা-অ্যামাইলেজ এনজাইমের সংশ্লেষণকে প্রবৃত্ত (induce) করে। তাই আলফা-অ্যামাইলেজের পরিমাণ নির্ণয় করে জিব্বারেলিনের কার্যকারিতার সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যবের বীজ দুভাগ করে কেটে ভ্রূণের অংশ বাতিল করা হয়। সস্যের অংশ নির্বীজ করে তিনদিন পর্যন্ত পানি শোষণ করতে দেয়া হয়। তারপর ঐ বীজ একটি ফ্লাস্কে রাখা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পর উক্ত দ্রবণ পরিশ্রুত করে আলফা-অ্যামাইলেজের ক্রিয়া (স্টার্চকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করার ক্ষমতা) বিশ্লেষণ করা হয়। খর্বকায় ভুট্টা পরীক্ষার তুলনায় জিব্বারেলিক অ্যাসিডের কম ঘনত্বেও এ পরীক্ষা সংবেদনশীল।

জিব্বারেলিনের ক্রিয়া-কৌশল

অঙ্কুরিত বীজ হাইড্রোলয়টিক এনজাইম তৈরি করে যা সঞ্চয়ী কোষে সঞ্চিত ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন ভেঙে ফেলে। এসব হাইড্রোলেজেসের উৎস এবং এদের তৈরি হওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং মুক্তকরণ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার কৌশল বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে তথ্য প্রদান করে। বিশেষ করে অঙ্কুরিত যবের দানার গবেষণার ফলাফল সফল হয়েছে।

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হেবারল্যান্ড্র (Haberlandt) উল্লেখ করেন যে, রাই-এর (rye) অ্যালিউরোন স্তর এক প্রকার পদার্থ (পদার্থগুলো) তৈরি করে যা সস্যের স্টার্চি অংশের তরলীকরণ এবং স্টার্চের দানার বিগলন করে। ব্রাউন এবং এসকম্বি (Brown and Escombe) ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে যবের দানার এই পর্যবেক্ষণ সুনিশ্চিতকরণ করেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী এল.জি. প্যালেগ (L.G. Paleg) এবং জাপানের বিজ্ঞানী এইচ. ইয়োমো (H.Yoma) পৃথকভাবে দেখান যে, যখন যবের দানার সস্যে GA_3 প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি আলফা-অ্যামাইলেজসহ কতিপয় অ্যামাইলোলয়টিক এনজাইম তৈরি করে ও চিনি মুক্ত করে এবং অঙ্কুরোদগমকে উদ্দীপিত করে। ডি.ই. ব্রিগস (D.E Briggs) ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আরো কতগুলো হাইড্রোলয়টিক এনজাইম (প্রোটিয়েজ, ফসফেটেজ এবং বিটা-গ্লুকানেজ) নিয়ে এই পর্যবেক্ষণ আরো প্রসারিত করেন।

একটি যবের দানার প্রাকৃতিক অঙ্কুরোদগমের সময় ভ্রূণ হলো বাইরের জিব্বারেলিক অ্যাসিডের উৎস। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এম. র‍্যাডলি (M. Radley) দেখান যে, অঙ্কুরোদগমের প্রথম দুইদিন স্কুটেলাম এবং এরপর ভ্রূণের অক্ষ জিব্বারেলিক অ্যাসিডের মতো পদার্থ তৈরি করে। ভ্রূণ থেকে নির্গত হওয়া জিব্বারেলিক অ্যাসিড সস্য দিয়ে ব্যাপিত হয়ে অ্যালিউরোন স্তরে পৌঁছে, এখানেই হাইড্রোলয়টিক এনজাইম তৈরি করে। ভ্রূণ ছাড়াও দানার অপর জীবন্ত কোষ হলো অ্যালিউরোন যা কয়েক স্তর কোষ দ্বারা গঠিত এবং এটিই সস্যের সবচেয়ে বাইরের স্তর।

তাই অ্যালিউরোন স্তর হলো সমসত্ত্ব, বিভাজন-অক্ষম কোষের সমষ্টি যা সস্যের স্টার্চ ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করে।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ গবেষকরা যবের ভ্রূণবিহীন অর্ধেক দানা পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে এটি জানা সম্ভব হয় যে, আলফা-অ্যামাইলেজের কার্যকারিতা জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এরপর কয়েক বছরের মধ্যেই গবেষকরা স্টার্চযুক্ত অংশ থেকে ভ্রূণবিহীন অর্ধেক দানা তিনদিন ইমবাইব করে অ্যালিউরোন স্তর পৃথক করতে সক্ষম হন। যবের পৃথকীকৃত অ্যালিউরোন স্তরকে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের দ্রবণের ইনকিউবেশন করলে কয়েক প্রকারের হাইড্রোলায়টিক এনজাইম তৈরি হয়। জিব্বারেলিক অ্যাসিড-নির্ভর এই এনজাইম নতুনভাবে তৈরি দেখা গেছে আলফা-অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ, বিটা-১, ৩-গ্লুকানেজ এবং রাইবোনিউক্লিয়েজের ক্ষেত্রে।

অ্যালিউরোন স্তরে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার স্থান ও কৌশল

এটি স্পষ্ট যে যবের অ্যালিউরোন স্তরে আলফা-অ্যামাইলেজসহ অন্যান্য হাইড্রোলেজেসের সংশ্লেষণের জন্য দায়ী জিনের ডিরিপ্রেশন (derepression) ঘটায়। তবে এটি নিশ্চিত নয় যে, ট্রান্সক্রিপশনাল (transcriptional) পর্যায়ে (mRNA সংশ্লেষণের সময়), ট্রান্সক্রিপশনাল পরবর্তী পর্যায়ে অথবা ট্রান্সলেশনাল পর্যায়ে (প্রোটিন সংশ্লেষণের সময়) জিব্বারেলিক অ্যাসিড সরাসরি কাজ করে। বিজ্ঞানী ডব্লিউ.এইচ.ইভিনস এবং বিজ্ঞানী জে.ই. ভারনার (W.H. Evins and J.E Varner) ১৯৭১ এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে পৃথকীকৃত অ্যালিউরোন স্তরের মন্থরগতি সময়ে (lag period) জিব্বারেলিক অ্যাসিড-আবেশিত আলফা-অ্যামাইলেজ সংশ্লেষণের পর্যায়ক্রমিক প্রাণ রাসায়নিক ধাপগুলো পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখতে পান যে, রাইবোজোম, পলিরাইবোজোম এবং অন্তপ্লাজমীয় জালি বেশি তৈরি হয়। জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগের ২ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যেই এসব প্রভাব আরম্ভ হয়। তাঁরা মন্তব্য করেন যে, হরমোন-উদ্দীপিত প্রোটিন সংশ্লেষণের পূর্বশর্ত হলো মনোরাইবোজোমের সংখ্যা এবং পলিরাইবোজোমের শতকরা হার বৃদ্ধি। অ্যাবসসিসিক অ্যাসিড যবের অ্যালিউরোন স্তরে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের প্রভাবকে নষ্ট করে দেয় এবং RNA সংশ্লেষণকেও বাধা দেয় যা আবার পলিরাইবোজোম তৈরিতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড নির্দেশিত mRNA সংশ্লেষণকে প্ররোচিত করে, যা আবার অধিক সংখ্যায় পলিরাইবোজোম এবং অ্যালিউরোন স্তরে নতুন করে সুনির্দিষ্ট হাইড্রোলেজেসের তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট।

তবে একটি প্রশ্ন হলো যবের অ্যালিউরোন স্তরে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার কৌশলের যে বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এবং উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপরিণতি নিয়ন্ত্রণে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের অংশগ্রহণের কৌশল একই কি-না স্বভাবতই এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে।

জিব্বারেলিনের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি

জিব্বারেলিনের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. কাণ্ড দীর্ঘীকরণ : জিব্বারেলিন অনেক উদ্ভিদের, বিশেষ করে বংশগতীয় খর্বকায় উদ্ভিদের কাণ্ডকে দীর্ঘ করে। সাধারণত পর্বমধ্যের (internode) কোষের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধির মাধ্যমে কাণ্ড দীর্ঘ হয়। কাণ্ড দীর্ঘীকরণ ছাড়াও জিব্বারেলিন কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতার আকারও বৃদ্ধি করে।

২. পুষ্পায়ন : অনেক উদ্ভিদের পুষ্পায়নে কিছু সময়ের জন্য নিম্নতাপ (২ থেকে ৪° সেলসিয়াস) এবং তারপর দীর্ঘ দিনের প্রয়োজন হয়। যদি নিম্নতাপ প্রদান করা না হয়, তবে কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ (একে বোল্টিং বলে) বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঘন সন্নিবিষ্ট পাতার সৃষ্টি হয়। জিব্বারেলিন প্রয়োগ করলে নিম্নতাপ ছাড়াই কোনো কোনো উদ্ভিদের পুষ্পায়ন হয়।

৩. বীজের অঙ্কুরোদ্গম : কতগুলো আলো সংবেদনশীল উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গম অন্ধকারে বেশ কম হয়, কিন্তু আলোতে স্বাভাবিক অঙ্কুরোদ্গম হয়। এসব বীজে জিব্বারেলিন প্রয়োগ করে অন্ধকারেও স্বাভাবিক অঙ্কুরোদ্গম করা যায়।

৪. বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা : কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজের অথবা মুকুলের পরিপক্কতার সাথে সাথেই অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এ অবস্থাকে সুপ্তাবস্থা বলে। জিব্বারেলিন প্রয়োগ করে বীজের ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙা যায়।

সারণি ৫.১ : অক্সিন ও জিব্বারেলিনের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য

উদ্ভিদ প্রতিক্রিয়া	অক্সিন	জিব্বারেলিন
১. মেরুদেশীয় পরিবহণ	হাঁ	না
২. শিকড় গজানো ত্বরান্বিত করে	হাঁ	না
৩. অগ্রমুকুলের প্রাধান্য	হাঁ	না
৪. পত্রপতন বিলম্বকরণ	হাঁ	না
৫. ক্যালাস তৈরি প্রবৃত্ত করে	হাঁ	না
৬. বংশগতীয় খর্বকায় উদ্ভিদ দীর্ঘ করে	না	হাঁ
৭. বীজের অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করে এবং সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে	না	হাঁ
৮. দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে পুষ্পায়ন ঘটায়	না	হাঁ

৩. সাইটোকাইনিন (Cytokinin)

আবিষ্কার ও রাসায়নিক প্রকৃতি

এ জাতীয় হরমোন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সি.ও. মিলার, এফ স্কুপ, এম.এইচ. ভন সল্টজা এবং এফ.এম.স্ট্রং (C.O. Miller, F. Skoog, M.H. Von Saltza and F.M. Strong) হেরিং মাছের শুক্রাণুর DNA এর অটোক্লেভ করা নমুনা থেকে এক প্রকার পদার্থ পৃথক করেন, একে কাইনেটিন (৬-ফরফুরাইল-অ্যামাইনো পিউরিন, $(C_{10}H_9N_5O)$ নাম দেয়া হয়। এটি কোষ বিভাজনে খুব সক্রিয়। তবে প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদে কোষ বিভাজনের জন্য যে সুনির্দিষ্ট পদার্থের প্রয়োজন হয়, সে সম্পর্কে প্রথম ধারণা প্রদান করেন জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ জে. ওয়াইজনার (J. Wiesner) ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে হেবারল্যান্ড (Haberlandt) বলেন যে, ফ্লোয়েম কলার ব্যাপনযোগ্য পদার্থ আলুর স্ফীতকন্দের প্যারেনকাইমা কোষকে বিভাজন করতে পারে। হেবারল্যান্ডের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি এবং সম্প্রসারিত করে জ্যাবলনস্কি এবং স্কুগ (Jablonski and Skoog, 1954) দেখান যে, এক খণ্ড ভাসকুলার কলা তামাকের মজ্জার (pith) কলায় রাখলে মজ্জার কলা বিভাজিত হয়, যা অন্যভাবে বিভাজিত হতো না। এই পর্যবেক্ষণের পর ভাসকুলার কলায় অবস্থিত অজ্ঞাত পদার্থ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে (যা কোষ বিভাজন ঘটায়)।

তাই সাইটোকাইনিনের চূড়ান্ত আবিষ্কার হলো প্রায় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. স্কুগের টিস্যু কালচার গবেষণার সরাসরি ফলাফল। স্কুগ এবং তাঁর সহকর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তামাকের ভালভাবে বর্ধিত হওয়া কাণ্ডের কর্তিত বিভাজন ক্ষমতাহীন পরিণত মজ্জার অংশ ব্যবহার করেছেন।

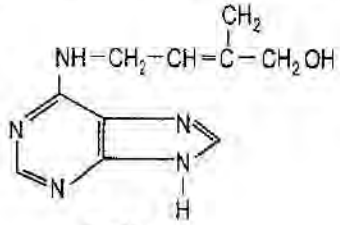

জিয়াটিন

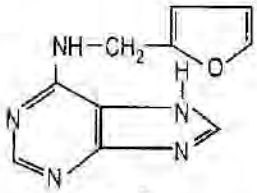

কাইনেটিন
(৬- ফারফুরাইল অ্যামাইনো পিউরিন)

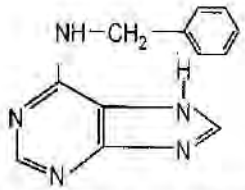

৬ - বেনজাইল অ্যামাইনোপিউরিন

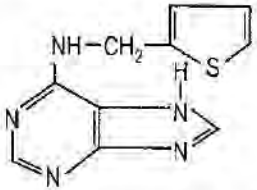

৬- (২- থিনাইল অ্যামাইনো) পিউরিন

চিত্র ৫.৭ : কতিপয় সাইটোকাইনিনের গাঠনিক সংকেত

প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত প্রথম সাইটোকাইনিন পৃথকীকরণের গৌরব অর্জন করেন নিউজিল্যান্ডের DSIR এর ফল গবেষণা ডিভিশনের ডি.এস. লিথাস এবং আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি.ও. মিলার। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে মিলার ভুট্টার অপক্ব বীজ থেকে এক প্রকার সাইটোকাইনিন পৃথক করেন। কিন্তু একে স্ফটিকাকৃতি এবং শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। তবে লিথাম (১৯৬৩) ভুট্টা থেকে এক প্রকার সাইটোকাইনিন পৃথক ও স্ফটিকাকৃতি করতে সমর্থ হন। এ প্রাকৃতিক হরমোনকে জিয়াটিন (Zeatin) নাম দেয়া হয়। পরবর্তীতে মিলার এবং লিথাম (১৯৬৫) দেখান যে, মিলার যে পদার্থ পৃথক করেছিলেন তাও জিয়াটিন। এরপর জিয়াটিন ও এর রাইবোসাইড এবং রাইবোনিউক্লিওটাইড অনেক উৎস থেকে পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে, লিথাম (১৯৬৮) নারকেলের তরল সস্যের কোষ বিভাজন ত্বরান্বিতকারী প্রধান সক্রিয় পদার্থকে জিয়াটিন রাইবোসাইড হিসেবে শনাক্ত করেন। জিয়াটিন আবিষ্কারের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে সাইটোকাইনিন পৃথক করা হয় এবং এদের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়।

সাইটোকাইনিনের জৈব-সংশ্লেষণ

সাইটোকাইনিনের জৈব সংশ্লেষণ সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা সম্ভব হয়েছে। জিয়াটিন এবং অন্যান্য সাইটোকাইনিনের গঠন দেখে ধারণা করা হয় যে, যে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় অ্যাডিনিন এবং অন্যান্য পিউরিন সংশ্লেষণ হয়, সাইটোকাইনিনও সে পথে সংশ্লেষিত হয়।

সাইটোকাইনিনের স্থানান্তর

সম্ভবত জাইলেমের মধ্যদিয়ে সাইটোকাইনিন ঊর্ধ্বমুখে স্থানান্তরিত হয়। তবে কতিপয় গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এটি নিম্নমুখেও স্থানান্তরিত হয়।

সাইটোকাইনিনের বায়োঅ্যাসে

সাইটোকাইনিনের কয়েকটি বায়োঅ্যাসের মধ্যে দুটির বর্ণনা নিচে প্রদত্ত হলো :

১. **সয়াবিনের ক্যালাস পরীক্ষা** (Soybean callus test) : নির্জীব করার পর সয়াবিন বীজের অঙ্কুরোদ্গম করা হয়। বীজপত্র কেটে ৪×৪×২ মিলিমিটার আকারের টুকরো করা হয় এবং ক্যালাস তৈরির জন্য এগুলোকে কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে রেখে দেয়া হয় (প্রায় তিন সপ্তাহ)। ৩×২×২ মিলিমিটার আকারের ক্যালাস কলার সজীব ওজন (fresh weight) নেয়ার পর সাইটোকাইনিনের বিভিন্ন দ্রবণে তিন সপ্তাহ রাখা হয়। তারপর পুনরায় ক্যালাস কলার ওজন নেয়া হয়। সাইটোকাইনিনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ক্যালাসের ওজনও বেড়ে যায়। তবে এ বৃদ্ধি প্রতি লিটারে ০.০০১ থেকে ১০ মিলিগ্রাম সাইটোকাইনিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ বায়োঅ্যাসের একটি প্রধান অসুবিধা হলো যে, এটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৩ থেকে ৫ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন।

২. **মূলার বীজপত্র পরীক্ষা** (Radish cotyledon test) : ২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারে মূলার বীজ ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত অঙ্কুরোদ্গম করা হয়। প্রত্যেক চারাগাছ থেকে ক্ষুদ্রতর বীজপত্রটি কেটে ওজন নেয়া হয়। পেট্রিডিসে রক্ষিত ফিল্টার কাগজে সাইটোকাইনিনের দ্রবণ প্রয়োগ করে বীজপত্রগুলো রাখা হয়। অবিচ্ছিন্ন ফ্লোরোসেন্ট আলোতে তিনদিন বৃদ্ধি পাওয়ার পর বীজপত্রগুলোকে পুনরায় ওজন করা হয়। ওজনের বৃদ্ধি প্রয়োগকৃত সাইটোকাইনিনের ঘনত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি

১. **কোষ বিভাজন** : সাইটোকাইনিনের প্রধান কাজ হলো কোষের বিভাজনের গতি বাড়িয়ে দেয়া।

২. **কোষের দীর্ঘীকরণ** : অক্সিন ও জিব্বারেলিনের মতো সাইটোকাইনিন ও কোষের দীর্ঘীকরণে সহায়তা করে।

৩. **বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙন** : জিব্বারেলিনের মতো সাইটোকাইনিন কোনো কোনো আলো-সংবেদনশীল বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গন করে অঙ্কুরোদ্গমের সহায়তা করে।

৪. **বার্ধক্যকে বিলম্বিতকরণ** : সাইটোকাইনিন পাতার বার্ধক্যকে বিলম্বিত করে পাতাকে বেশি দিন সতেজ রাখে।

৪. অ্যাবসসিসিক অ্যাসিড (Abscisic acid)

আবিষ্কার ও রাসায়নিক প্রকৃতি

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ডি. জে. অসবোর্ন (D. J. Osborne) লক্ষ্য করেন যে, পতনশীল পাতায় অ্যাবসসিসন ত্বরান্বিতকারী ব্যাপনশীল এক প্রকার পদার্থ থাকে, যার রাসায়নিক প্রকৃতি IAA অথবা অন্য কোনো জানা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ থেকে পৃথক। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে লিউ এবং কার্নস (Liu and Carns) তুলার পরিপক্ব ফল থেকে এক প্রকার স্ফটিকাকার পদার্থ পৃথক করেন ও একে প্রথমে অ্যাবসসিসিন (abscision) নাম দেন, পরে এর নামকরণ করা হয় অ্যাবসসিসিন-১। এই পদার্থ তুলার পত্রফলকহীন পত্রবৃন্তের অ্যাবসসিসন ঘটাতে সক্ষম। তুলার কচি ফল থেকে

ওহকুমা (Ohkuma) এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে অপর একটি অ্যাবসসিসিন-ত্বরান্বিতকারী পদার্থের স্ফটিক পৃথক করেন এবং একে অ্যাবসাসিসিন-২ নাম দেন। তাঁরা এই নতুন পদার্থের কতকগুলো রাসায়নিক ও শারীরতাত্ত্বিক ধর্মের বর্ণনা দেন এবং $C_{15}H_{20}O_4$ এই রাসায়নিক সংকেতের প্রস্তাব দেন। একই বছরে (১৯৬৩) যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সি.এফ. ইগলস এবং পি.এফ. ওয়ারিং (C.F. Eagles and P.F. Wareing) ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে *Betula pubescens*-এর পাতা থেকে এক প্রকার বৃদ্ধি রোধক পদার্থ পৃথক করেন যা বর্ধনশীল চারাগাছের মুকুলে প্রয়োগ করলে মুকুল সুপ্ত হয়ে যায়। এই অজ্ঞাত পদার্থ এবং সুপ্তাবস্থা প্ররোচিত করে এমন অন্যান্য অন্তঃস্থ পদার্থকে তাঁরা ডর্মিন (dormin) নাম দেন।

ডরমিনের রাসায়নিক প্রকৃতি দ্রুত শনাক্ত করার জন্য ওয়ারিং ইংল্যান্ডের সেল রিসার্চ লিমিটেডের (Shell Resarch Limited) সাহায্য নেন। কিছুদিন পর, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে, জে. ডব্লিউ. কর্নফোর্থ, বি.ভি. মিলবরো, জি. রেব্যাক (সবাই সেল-এর বিজ্ঞানী) এবং পি.এফ. ওয়ারিং *Acer pseudoplatanus* এর পাতা থেকে প্রাপ্ত ডর্মিন এবং অ্যাবসিসিসিন ২ এর ধর্মের তুলনা করেন। এদের আণবিক ওজন, অবলোহিত (infrared) বর্ণালী এবং গলাঙ্ক দেখে তাঁরা মন্তব্য করেন যে, ডর্মিন এবং অ্যাবসিসিসিন-২ একই পদার্থ। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ওহকুমা এবং তাঁর সহকর্মীরা অ্যাবসিসিসিন-২ এর যে আণবিক গঠনের প্রস্তাব দেন, একই বছর (১৯৬৫) কর্নফোর্থ এবং সহযোগীরা তা সুনিশ্চিত করেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দেই ওহকুমা সবীজ উদ্ভিদের কতিপয় প্রজাতি থেকে অ্যাবসিসিসিক অ্যাসিডের কয়েকটি অ্যানালগ সংশ্লেষণ করেন এবং ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে (+) – অ্যাবসিসিসিক অ্যাসিড শনাক্ত করেন।

স্পষ্টই ডর্মিন এবং অ্যাবসিসিসিন-২ এর নাম নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাই ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কানাডায় অটোয়ায় অনুষ্ঠিত উদ্ভিদের বৃদ্ধিকর দ্রব্যের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এদেরকে অ্যাবসিসিসিক অ্যাসিড নাম দেয়া হয়। একে সংক্ষেপে ABA বলে। ABA হলো এক প্রকার সেসকুইটারপেনয়েড (sesquiterpenoid. 15-c) যৌগ, যা মনোটারপিন, ডাইটারপিন (জিব্বারেলিক অ্যাসিডসহ), ক্যারোটিনয়েড এবং ট্রাইটার্পিনের সাথে সম্পর্কিত।

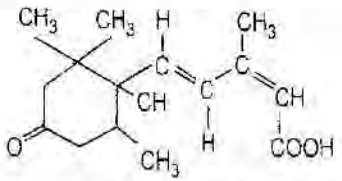

চিত্র ৫.৮ : (+)- অ্যাবসিসিসিক অ্যাসিডের গাঠনিক সংকেত

অ্যাবসিসিসিকি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষণ

গঠনের দিক থেকে ABA এবং ক্যারোটিনয়েড ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। জিব্বারেলিনের জৈব-সংশ্লেষণের মতো, অ্যাসিটাইল কো-এনজাইম A থেকে কিছু মধ্যবর্তী পদার্থ তৈরির মাধ্যমে ABA সংশ্লেষিত হয়। দুটি পথে ABA সংশ্লেষিত হতে পারে। ABA তে পনেরটি কার্বন আছে, তাই ধারনা করা হয় যে, তিনটি পাঁচ-কার্বনবিশিষ্ট যৌগ (আইসোপেন্টাইল পাইরোফসফেট) মিলিত হয়ে ABA তৈরি হয়। অপর পথটি হলো বার্ধক্যপ্রাপ্ত কলা এবং অঙ্গের ক্যারোটিনয়েড ভেঙে ABA তৈরি হয়। কতিপয় গবেষক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভায়োলাজ্যান্থিন (violaxanthin) ABA সংশ্লেষের অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে কাজ করে।

BANSDOC Library

অ্যাবসসিসিক অ্যাসিডের স্থানান্তর

পি.এফ. ওয়ারিং এবং তাঁর সহযোগীরা লক্ষ্য করেছেন যে, *Acer pseudoplatanus* এবং *Ribes nigram* এর পরিণত পাতায় ABA তৈরি হয় ও কাণ্ডের শীর্ষে স্থানান্তরিত হয়। ফ্লোয়েম এবং সম্ভবত জাইলেমের ভিতর দিয়ে ABA স্থানান্তরিত হয়।

অ্যাবসসিসিকঅ্যাসিডেরবায়োঅ্যাসে

অ্যাবসসিসিক অ্যাসিডের দুটি বায়োঅ্যাসের বর্ণনা নিচে প্রদত্ত হলো :

১. **পত্রের অ্যাবসসিসন বায়োঅ্যাসে** (Leaf abscission bioassay) : বিনের ত্রিফলক (trifoliate) পাতার অনুপত্রিকাত্রয়ের বৃন্তের কিছু উপরে কেটে ফেলা হয়। অনুপত্রিকার বৃন্ত যেখানে পত্রাক্ষের সাথে যুক্ত হয় সেখানে অ্যাবসসিসন স্তর অবস্থিত। অনুপত্রিকার বৃন্তের কাটা অংশে ল্যানোলিন পেস্টে (lanolin paste) ABA প্রয়োগ করা হয়। কিছু সময় পর পর একটি শক্ত তার দিয়ে বৃন্তে চাপ প্রয়োগ করা হয়। যদি ABA অ্যাবসসিসন ত্বরান্বিত করে, তাহলে যে বৃন্তে ABA প্রয়োগ করা হয়নি তার তুলনায় প্রয়োগকৃত বৃন্তের অ্যাবসসিসন ত্বরান্বিত হবে।

২. **মুকুলের সুপ্তাবস্থার বায়োঅ্যাসে** (Bud dormancy bioassay) : *Fagus sylvatica* অথবা *Acer pseudoplatanus*–এর চারা উপযুক্ত আলো ও তাপমাত্রায় জন্মানো হয় যাতে বৃদ্ধি খুব ভাল হয়। তারপর অগ্রমুকুলে ABA প্রয়োগ করা হয়। যদি এ মুকুল সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ বন্ধ হয়ে যায়, তবে বোঝা যাবে যে উক্ত ABA হর্মিনের মতো ক্রিয়া করে।

অ্যাবসসিসিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার কৌশল

সুপ্ত কলা জীবন্ত, কেননা এর শ্বসন হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর খুব মন্থর গতিতে বৃদ্ধি হয়। তবে সুপ্ত কলা বা অঙ্গের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না ; এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু প্রক্রিয়া আছে যা বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। ডি. টুয়ান এবং জে. বন্নার (D. Tuan and J. Bonner, 1964) প্রস্তাব করেন যে, সুপ্তকোষের বংশগতীয় পদার্থ (DNA) সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবদমিত থাকে। এ প্রকল্প অনুসারে DNA ট্রান্সক্রিপশন, বার্তাবাহক RNA তৈরি এবং বৃদ্ধি ও বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ও গঠনগত প্রোটিন তৈরি হওয়াও অবদমিত হয়। টুয়ান এবং বন্নার এই প্রকল্প পরীক্ষার জন্য গবেষণা পরিচালনা করেন। বিশেষ করে তাঁরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলনা করেন : গোলআলুর স্ফীতকন্দের সুপ্ত এবং অসুপ্ত মুকুলের RNA সংশ্লেষণের হার ও DNA নির্ভরশীল RNA সংশ্লেষণ ঘটাতে এরকম মুকুলের ক্রোমাটিনের ক্ষমতা।

এ ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। গোলআলুর স্ফীতকন্দে ইথিলিন ক্লোরোহাইড্রিন প্রয়োগে সুপ্তাবস্থা ভাঙা মুকুলের তুলনায় DNA এবং DNA নির্ভরশীল RNA সংশ্লেষণে সুপ্ত মুকুলের ক্ষমতা ছিল খুব সীমিত, যেমন– দেখা গেছে সুপ্ত মুকুল থেকে পৃথকীকৃত ক্রোমাটিনের ক্ষেত্রে। তাই মন্তব্য করা হয়েছে যে, আলুর স্ফীতকন্দের সুপ্ত মুকুলে DNA প্রধানত অবদমিত অবস্থায় থাকে এবং সুপ্তাবস্থা ভাঙার সাথে সাথে বংশগতীয় পদার্থের ডিরিপ্রেশন হয়।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জার্ভিস (Jarvis) এবং সহকর্মীরা *Corylus avellana* এর সুপ্ত ও অসুপ্ত বীজ নিয়ে গবেষণা করে একইরকম ফলাফল পান। তাঁরা সুনিশ্চিত করেন যে, সুপ্ত বীজের স্ট্রাটিফিকেশনের প্রয়োজন হয় এবং বহিঃস্থ জিব্বারেলিক অ্যাসিড শৈত্য প্রদানকে প্রতিস্থাপিত

করতে পারে। অক্ষত ভ্রূণ এবং পৃথকীকৃত ক্রোমাটিন ব্যবহার করে তারা দেখতে পান যে, জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রথমে ট্রান্সক্রিপশনের জন্য লভ্য DNA -এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং পরে RNA সংশ্লেষণ বৃদ্ধি করে।

ABA এর ক্রিয়ার আণবিক কৌশল এখনো অজ্ঞাত। তবে, এই হরমোনের দুটি প্রধান প্রাণরাসায়নিক প্রভাব জানা গেছে। একটি হলো কোষঝিল্লির পরিবর্তন, যা কোষঝিল্লি বরাবর একটি জীবজ-বৈদ্যুতিক (bio-electric) পটেনশিয়ালের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং পটাশিয়াম আয়নের বহির্গমন হয়। দ্বিতীয়, প্রধান প্রভাব হলো RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণকে বাধা প্রদান। জিব্বারেলিক অ্যাসিডের অনেক এবং অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের কতিপয় প্রভাবকে ABA নষ্ট করে দেয়। যেমন- যবের অ্যালিউরোন স্তরে জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্ররোচিত হাইড্রোলয়জেস তৈরিতে ABA বাধা দেয়। এর ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, DNA-নির্ভরশীল RNA সংশ্লেষণে ABA বাধা দেয়।

শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি

১. পত্ররন্ধ্রের নিয়ন্ত্রণ : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণে ABA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে সম্প্রতি জানা গেছে। মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি হলে পাতায় ABA জমা হয়। ABA-এর জলীয় দ্রবণ পাতায় ছিটিয়ে দিলে পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ রসস্ফীতিত্ব হারায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পানি ঘাটতি অবস্থা ABA তৈরি এবং রক্ষীকোষে জমা করতে প্ররোচিত করে। তবে ABAএর বেশি ঘনত্বে রক্ষীকোষ পানি হারায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। পত্ররন্ধ্র বন্ধ হলে প্রস্বেদনের হার কমে যায় এবং উদ্ভিদ অন্তঃস্থ পানি সংরক্ষণে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে প্রারম্ভিক পর্যবেক্ষণ শুরু হয় ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এবং সেসময় দেখা গেছে যে, নিম্নমাত্রায় (যেমন- ১ মাইক্রোমোলার) বহিঃস্থ ABA পাতায় স্প্রে করলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ জানা যায় যে, পত্ররন্ধ্র বন্ধের জন্য এটি ঘটে। তাই অন্তঃস্থ ABA এর প্রভাবে যে পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া এবং উদ্ভিদের পানি সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান স্পষ্ট হতে থাকে।

ABA প্রয়োগে পত্ররন্ধ্রের বন্ধ হওয়া বেশ দ্রুত হয় ; ভুট্টা *Rumex obtusifolia* এবং সুগার বিটের মতো উদ্ভিদে কর্তিত পাতার গোড়ায় ABA প্রয়োগের ৩ থেকে ৯ মিনিটের মধ্যেই পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু, পত্ররন্ধ্র বন্ধের পূর্বে এবং মন্থরগতি সময়ের (lag period)১০ থেকে ১৫ মিনিট আগে পানি-ঘাটতি পাতায় অতি দ্রুত অন্তঃস্থ ABA এর ঘনমাত্রা বেড়ে যায়। ABA এর প্রভাবে রক্ষীকোষ থেকে পটাশিয়াম আয়ন বের হয়ে যায় এবং রসস্ফীতিত্ব হারায়, ফলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, রক্ষীকোষের ABA এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উভয়ের ঘনমাত্রাই পত্ররন্ধ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। রক্ষীকোষের উপর এদের একটির প্রতিক্রিয়া অপরটির ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল। যেমন- যখন পানি ঘাটতি হয়, রক্ষীকোষে ABAএর ঘনমাত্রা বেড়ে যায়, এবং সেই সাথে রক্ষীকোষ পটাশিয়াম আয়ন এবং রসস্ফীতিত্ব হারায়, ফলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। তাই উদ্ভিদকে পানি স্বল্পতার হাত থেকে রক্ষা করে। অপর দিকে, যদি উদ্ভিদে পানি প্রদান করা হয়, তাহলে রক্ষীকোষে ABAএর ঘনমাত্রা হ্রাস পায়, পটাশিয়াম আয়ন এবং রসস্ফীতিত্ব ফিরে আসে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা হ্রাস পায় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায় তাই পাতায় কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করতে পারে।

২. মুকুলের সুপ্তাবস্থা : ABA কতগুলো বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের মুকুলের সুপ্তাবস্থার সময় বৃদ্ধি করে। মুকুলের সুপ্তাবস্থা নিয়ন্ত্রণে কতগুলো বৃদ্ধিরোধক পদার্থের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন বিজ্ঞানী টি. হেমবার্গ (T. Hemberg) ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, *Fraxinus* এর মুকুল এবং গোলআলুর স্ফীতকন্দের সুপ্তাবস্থার সাথে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মাত্রার অজ্ঞাত বৃদ্ধি রোধক পদার্থের সম্পর্ক আছে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে কায়াসি (Kawase) কচি বার্চ (*Betula pubescens*) গাছেও একইরকম ফলাফল পান এবং মুকুলের সুপ্তাবস্থা ঘটাতে স্বল্প দিবালোক (১০ ঘন্টা) এবং দীর্ঘ রাতের প্রভাব সুনিশ্চিত করেন।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কাষ্ঠল উদ্ভিদের মুকুলের সুপ্তাবস্থা নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হলো দিবাদৈর্ঘ্য। অধিকাংশ কাষ্ঠল উদ্ভিদে, দীর্ঘ দিবালোক অঙ্গজ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং স্বল্প দিবালোকে এই বৃদ্ধি হ্রাস পায় ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা হয়।

৩. বীজের সুপ্তাবস্থা : *Fraxinus* এর দুটি প্রজাতির বীজের অঙ্কুরোদ্গমের উপর ABA এর প্রভাব সম্পর্কে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে। বিজ্ঞানী ই. সন্ডহেইমার (E. Sondheimer) এবং সহযোগীরা গবেষণা করেন তাঁরা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রজাতি *F. americana* এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের *F. ornus* (এই বীজে স্ট্র্যাটিফিকেশনের প্রয়োজন হয় না) এর বীজ ব্যবহার করেন। উভয় প্রজাতির সব কলাতেই ABA উপস্থিত ছিল, কিন্তু *F. americana* এর সুপ্ত বীজে এবং পেরিকার্পে সর্বোচ্চ মাত্রায় ছিল। *F. americana*-এর বীজের স্ট্রাফিকেশনের (শৈত্য প্রদান) সময় ABA এর মাত্রা পেরিকার্পে শতকরা ৩৭ ভাগ এবং বীজ শতকরা ৬৮ ভাগ হ্রাস পায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শৈত্য প্রদানের পর *F. americana* এর বীজের ABA এর ঘনমাত্রা, *f. ornus* বীজের স্বাভাবিক মাত্রার মতো নিম্ন হয়েছিল। এটি স্পষ্ট যে, *F. americana* এর বীজের অঙ্কুরোদ্গমে ABA এর ভূমিকা আছে এবং স্ট্র্যাটিফিকেশনের সুস্পষ্ট প্রভাব হলো বীজের অন্তঃস্থ ABA এর পরিমাণ হ্রাস করা।

বিজ্ঞানী সন্ডহেইমার এবং তাঁর সহকর্মীদের গবেষণার ফলাফলে আরো জানা যায় যে, *F. americana* এর বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং চারাগাছের বৃদ্ধিতে সম্ভবত ABA ছাড়াও অন্যান্য হরমোনের ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা উল্লেখ করেন যে, অঙ্কুরোদ্গমে বহিঃস্থ ABA এর প্রভাবকে বহিঃস্থ জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে নষ্ট করে দেয়া যায় ; তবে এক্ষেত্রে পাতার বৃদ্ধি ও ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ হ্রাস পায়। জিব্বারেলিক অ্যাসিডের সাথে কাইনেটিন প্রয়োগে অবশ্য পাতার বৃদ্ধি ও ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ স্বাভাবিক হয়। অঙ্কুরোদ্গমে ABA-এর প্রভাবকে শুধু কাইনেটিন নষ্ট করতে পারে না। *F. americana* এবং *F. ornus* উভয়ের সুপ্ত নয় এমন বীজের অঙ্কুরোদ্গমকে ABA বাধা দেয়। অপর উদ্ভিদ হলো *Corylus avellana* (এর স্ট্র্যাটিফিকেশনের প্রয়োজন হয়), যার উপর বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে। এর স্ট্র্যাটিফিকেশন না দেয়া সুপ্ত বীজে বহিঃস্থ জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে অঙ্কুরোদ্গম হয়। এক্ষেত্রে শৈত্য প্রদানের জন্য অন্তঃস্থ জিব্বারেলিক অ্যাসিড তৈরি হয় ; এটি দ্রুত হয় যদি স্ট্র্যাটিফিকেশন দেয়া বীজ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরিয়ে আনা হয়। উপরন্তু, অ্যামো ১৬১৮ (জিব্বারেলিক অ্যাসিড সংশ্লেষণরোধক) প্রয়োগে শৈত্য প্রদানের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।

মুকুলের সুপ্তাবস্থার মতো, শৈত্যের প্রয়োজন হয় এমন বীজের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি-ত্বরান্বিতকারী এবং বৃদ্ধি-রোধকারী হরমোনের সমতার প্রশ্নটি দেখা দেয়। স্ট্র্যাটিফিকেশনের সময় অথবা এর অব্যাহিত পরে রোধকের পরিমাণ কমিয়ে (যেমন *F. americana*) অথবা ত্বরান্বিতকারী হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে (যেমন- *Coorylus avellana*) অথবা অন্যান্য প্রজাতিতে উভয়ভাবেই এই সমতার পরিবর্তন করা যায়।

৪. **অ্যাবসসিসন :** যদিও অংশত ABAএর অ্যাবসসিসন ঘটানোর ক্ষমতার কারণে এই হরমোন আবিষ্কৃত হয়েছিল, তথাপিও কোনো অঙ্গের স্বাভাবিক অ্যাবসসিসন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা স্পষ্ট নয়। এল.এ. ডেভিস এবং এফ.টি. অ্যাডিকট (L. A Davis and F. T. Addicott) গ্যাস-লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফির সাহায্যে তুলার বীজের ABA এর পরিমাণ নিরূপণ করেন। তাঁরা দেখতে পান যে, কচি ফলের পতন, বার্ধক্যপ্রাপ্তি এবং পরিপক্ব ফলের বিসরণের সাথে উচ্চ মাত্রার ABAএর সম্পর্ক আছে। ফলের পক্বতার প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব কচি ফল ঝরে যায়, তাদের তুলনায় শেষের দিকে ঝরে যাওয়া কচি ফলে প্রায় দ্বিগুণ ABA থাকে। তাই, কমপক্ষে তুলার ফলের ক্ষেত্রে, অ্যাবসসিসন নিয়ন্ত্রণে ABA এর যথেষ্ট ভূমিকা আছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

তবে পাতার অ্যাবসসিসন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা তেমন স্পষ্ট নয়। সাধারণভাবে, পাতার অ্যাবসসিসনের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ABA এর প্রয়োজন হয়। পাতার অ্যাবসসিসনের নিয়ন্ত্রণ অন্যান্য হরমোনের দ্বারাও হতে পারে।

৫. **বার্ধক্যপ্রাপ্তি :** এই হরমোন পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে।

৬. **পুষ্পায়ন :** এই হরমোন কতিপয় স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের দীর্ঘ দিবালোকে পুষ্পায়ন ঘটায়।

৫. ইথিলিন (Ethylene)

আবিষ্কার ও রাসায়নিক প্রকৃতি

ইথিলিন এক প্রকার বায়বীয় উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন (C_2H_4), এবং কার্বনসমৃদ্ধ বস্তু যেমন- কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি অসম্পূর্ণ দহনে এটি তৈরি হয়। ইথিলিন ধোঁয়ার একটি উপাদান। যদিও উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে ইথিলিনের প্রভাব সম্পর্কে প্রায় আশি বছর আগে জানা গেছে, তবে উদ্ভিদ হরমোন হিসেবে এর স্বীকৃতি সাম্প্রতিককালের। ডি.এন. নেজুবো (D.N. Nejubow) নামক একজন রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ হলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি উদ্ভিদের উপর ইথিলিনের প্রভাব সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বলেন যে, ইথিলিনের জন্য, এটি গ্যাসের আলোর একটি উপাদান, পাণ্ডুর মটরের চারাগাছে ট্রিপল প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এজন্য কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ রোধ হয়, কাণ্ডের স্ফীতিত্ব হয় এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কাণ্ড আনুভূমিক হয়। কয়েক বছর পর, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী এইচ. এইচ. কোজিনস (H.H. Cousins) জ্যামাইকার সরকারকে এই মর্মে উপদেশ দেন যে, জাহাজে কমলা এবং কলা একসাথে রাখা উচিত নয়, কেননা কিছু অশনাক্ত উদ্বায়ী পদার্থ কলাকে দ্রুত পাকিয়ে ফেলে।

১৯১৭ এবং ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কতিপয় গবেষক মত প্রকাশ করেন যে, ইথিলিন ফলের পক্বতাকে উদ্দীপিত করে। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কতিপয় গবেষক আরো দেখান যে, অনেক উদ্ভিদের অংশ, বিশেষ করে রসালো ফল ইথিলিন তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদের কতিপয় প্রতিক্রিয়ার উপর বহিঃস্থ ইথিলিনের প্রভাব এবং বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ কলা (tissue) ও রসালো ফল কর্তৃক ইথিলিন তৈরি পর্যবেক্ষণ করে ডব্লিউ ক্রোকার, এ.ই. হিচক এবং পি. ডব্লিউ জিমারম্যান (W. Crocker, A.E. Hichock and P.W. Zimmerman, এরা সকলেই নিউইয়র্কের বয়েস থমপসন ইন্সটিটিউট ফর প্লান্ট রিসার্চের বিজ্ঞানী) ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে

প্রস্তাব করেন যে, ইথিলিন অবশ্যই এক প্রকার অন্তঃস্থ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ। ২৪ বছর পর্যন্ত ইথিলিন সম্পর্কে শারীরতত্ত্ববিদদের তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। এর কারণ হলো কোষস্থ অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় ইথিলিন গ্যাসের বিশ্লেষণের কোনো পদ্ধতি লভ্য ছিল না। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী এস.পি. বার্গ (S.P. Burg), এইচ. কে. প্রাট (H.K. Prat) এবং অন্যরা ইথিলিন বিশ্লেষণের জন্য নতুন আবিষ্কৃত ফ্লেম আয়োনাইজেশন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহারের পর থেকে ইথিলিন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এতদসত্ত্বেও, হরমোন হিসেবে সাধারণভাবে ইথিলিনের গ্রহণযোগ্যতা অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে হয়। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রাট এবং গোয়েসচল (Goeschl) বলেন যে, অতি সংবেদনশীল যন্ত্রের সাহায্যে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে, ইথিলিন হলো উদ্ভিদের অন্তঃস্থ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য। বর্তমানে এটি দেখা গেছে যে, উদ্ভিদে বিপাকক্রিয়ার ফলে সুস্থ, বার্ধক্যপ্রাপ্ত এবং অসুস্থ কলায় ইথিলিন তৈরি হয়। বিশেষ করে পাকা ফলের কোষমধ্যবর্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন জমা থাকে। পাতা, কাণ্ড, মূল এবং ফুলেও কিছু পরিমাণ ইথিলিন তৈরি হয়। তবে এসব অঙ্গে ইথিলিনের পরিমাণ খুবই কম, ০.১ পিপিএম এরও কম। অন্যান্য হরমোনের সাথে ইথিলিনের প্রতিক্রিয়া অসংখ্য এবং বেশ জটিল।

ইথিলিনের জৈব-সংশ্লেষণ

ইথিলিন অণুর গঠন খুব সাধারণ হলেও এবং অনেক প্রকার উদ্ভিদের কলা ও অঙ্গে অতি দ্রুত ইথিলিন তৈরি হলেও, এর সংশ্লেষণের ধারণা এখনো অস্পষ্ট। লেবেলকৃত গ্লুকোজ থেকে লেবেলকৃত ইথিলিন তৈরি হয়, তবে এর পরিমাণ খুব কম। তাই গ্লুকোজ থেকে সরাসরি ইথিলিন তৈরি সম্ভাবনাহীন বলেই মনে হয়। মিথিওনিন (methionine) নামক এক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনো কোনো উদ্ভিদ অঙ্গে ইথিলিন তৈরি ত্বরান্বিত করে এবং উদ্ভিদ থেকে কতগুলো এনজাইম পৃথক করা সম্ভব হয়েছে যা টেস্টটিউবে মিথিওনিন থেকে ইথিলিন তৈরিকে ত্বরান্বিত করে। মিথিওনিন থেকে এস-অ্যাডিনোসিল মিথিওনিন মাধ্যমে ইথিলিন সংশ্লেষিত হয়। আপেলের কলায় সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলে এটি প্রমাণিত হয়েছে। ATP দ্বারা মিথিওনিনের সক্রিয় হয়ে এস-অ্যাডিনোসিল মিথিওনিনের তৈরি হয়, যা বিশ্লেষিত হয়ে ইথিলিন (কার্বন পরমাণু ৩ এবং ৪ থেকে), ফরমেট (কার্বন পরমাণু-২ থেকে), কার্বন ডাই-অক্সাইড (কার্বন পরমাণু ১ থেকে), অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং ৫-এস-মিথাইল-৫-থায়োঅ্যাডিনোসিন তৈরি হয়।পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে এস-অ্যাডিনোসিলমিথিওনিন ভেঙে প্রথমে ৫-এস-মিথাইল-৫-থায়োঅ্যাডিনোসিন এবং একটি সাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, ১-অ্যামাইনো-সাইক্লোপ্রোপেন-১-কার্বোঅক্সালিক অ্যাসিড তৈরি হয়। শেষোক্ত মধ্যবর্তী পদার্থ থেকে ইথিলিন, ফরমেট, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি হয়। এই চক্র সম্পূর্ণ করার জন্য নিউক্লিওসাইডের মিথাইলথায়ো গ্রুপ একটি ৪-কার্বন গ্রহিতাকে (হোমোসেরিন) দিয়ে মিথিওনিন পুনরায় তৈরি হতে পারে।

এটিও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, কতিপয় ফ্যাটি অ্যাসিডও ইথিলিনের অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে কাজ করতে পারে। লাইনোলেনিক নামক ১৮ কার্বনবিশিষ্ট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড টেস্টটিউবে ইথিলিনে রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে।

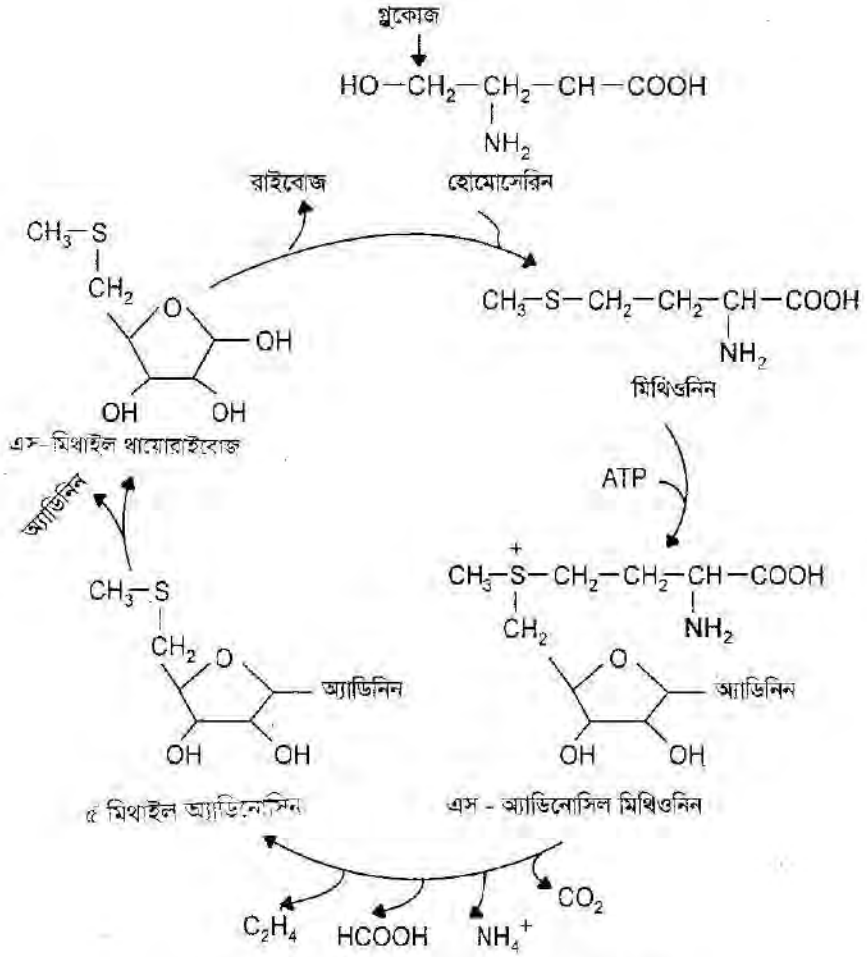

চিত্র : ৫.৯ : অ্যাপেলের ইথিলিন সংশ্লেষণের প্রস্তাবিত পথ

ইথিলিনের বায়োঅ্যাসে

ইথিলিনের খুব সামান্য সংখ্যক বায়োঅ্যাসে আছে। এদের মধ্যে পাণ্ডুর মটরশুঁটির ট্রিপল রেসপন্স (triple response of etiolated peas) বায়োঅ্যাসে বহুল প্রচারিত। বিভিন্ন ঘনত্বের ইথিলিনের তিনটি রেসপন্স হলো দীর্ঘীকরণ রোধ, কাণ্ডের ব্যাস বৃদ্ধি এবং অনুপ্রস্থ জিওট্রপিজম (transverse geotropism)। তিনদিন ধরে মটরশুঁটি বীজের অন্ধকারে অঙ্কুরোদ্গম করা হয় এবং তারপর একটি চেম্বারে রাখা হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ সিসি হারে ইথিলিন ঐ চেম্বারে প্রবেশ করানো হয়। বিভিন্ন ঘনত্বের ইথিলিন চেম্বারে প্রবেশ করিয়ে তার প্রভাব পরীক্ষা করা হয়।

ইথিলিনের ক্রিয়ার কৌশল

প্রকৃতপক্ষে ইথিলিনের ক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। ইথিলিনের কতিপয় প্রভাবের সময় – যেমন পাতার অ্যাবসিসিসন ত্বরান্বিত করার সময় কতগুলো সুনির্দিষ্ট এনজাইম (যেমন- সেলুলোজ) নতুন করে তৈরি হয়। তবে এটি এখনও অজ্ঞাত যে, ইথিলিন কিভাবে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—এনজাইম তৈরিকে উদ্দীপিত করে। উপরন্তু, ঝিল্লির উপর ইথিলিনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ। বেশ কিছু প্রমাণ নির্দেশ করে যে, ইথিলিনের যেকোনো ক্রিয়ার সময় একটি ধাতু (সম্ভবত তামা) যুক্ত হয়, কিন্তু এরকম সংযুক্তির বিপাকীয় ফলাফল বিস্তারিতভাবে এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি।

শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি

উদ্ভিদের অনেক শারীরবৃত্তীয় কার্যে ইথিলিন অংশ নেয়। প্রধান প্রধান কার্যগুলো নিম্নরূপ :

(১) রসালো ফলের পক্বতাকে উদ্দীপত করা,

(২) পাতার অ্যাবসিসিসনকে উদ্দীপিত করা,

(৩) লেগুমজাতীয় উদ্ভিদের পাণ্ডুর চারাগাছের ট্রিপল প্রতিক্রিয়া-কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ রোধ, কাণ্ডের স্ফীতিত্ব এবং কাণ্ডের অ্যাজিওট্রপিজম অথবা ডায়াজিওট্রপিজম সৃষ্টি করা,

(৪) পাণ্ডুর চারাগাছের পাতা এবং শীর্ষস্থ মুকুলের প্রসারণ রোধ,

(৫) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাণ্ডুর চারাগাছের ইপিকটাইল আঁট হওয়া অথবা হাইপোকটাইল বড়শি (hook) তৈরি,

(৬) মূলের বৃদ্ধি রোধ,

(৭) কোষ-ঝিল্লির ভেদ্যতা বৃদ্ধি,

(৮) অস্থানিক মূল তৈরিকে উদ্দীপিত করা,

(৯) আনারসের পুষ্পায়নকে উদ্দীপিত করা,

(১০) পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি রোধ,

(১১) বিভিন্ন প্রকার ফুলের দলকে বিবর্ণ করা,

(১২) অক্সিনের মেরুদেশীয় পরিবহণকে বাধাগ্রস্ত করা,

(১৩) পাতার ইপিন্যাস্টি ঘটানো এবং

(১৪) মূলের স্বাভাবিক জিওট্রপিজমে অংশ নেয়।

ইথিলিন এবং ফলের পক্বতা

অনেক বছর ধরে ফলের শারীরতত্ত্বে আগ্রহী বিজ্ঞানীদের মধ্যেই প্রধানত ইথিলিনের শারীরতত্ত্ব সীমায়িত ছিল। এই গবেষণার মাধ্যমে ইথিলিনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে ফল সংরক্ষণে 'গ্যাস সংরক্ষণ' অথবা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ' পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কিড এবং ওয়েস্ট (Kidd and West) এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এটি জানা গেছে যে, ইথিলিনের ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড এ ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। মূলত গ্যাস সংরক্ষণ পদ্ধতি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ (৫ থেকে ১০%), নিম্নমাত্রার অক্সিজেন (১ থেকে ৩%) এবং খুব সামান্য মাত্রার ইথিলিনে সংরক্ষণ করা। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সংরক্ষণ করা হয় একটি বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠে

যতোটা সম্ভব নিম্নতাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করে। স্বভাবতই এই প্রকোষ্ঠে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং শ্বসনের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফল থেকে তৈরি ইথিলিন ব্রোমিনেটেড কাঠকয়লা ফিল্টার দ্বারা শোষিত হয়।

রসালো ফলের পরিপক্কতার সময় অনেক সময় অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এগুলো হলো :

(১) নরমকরণ,
(২) সঞ্চিত পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ,
(৩) রঞ্জকদ্রব্য এবং আস্বাদনের পরিবর্তন এবং
(৪) শ্বসনের হারের পরিবর্তন।

উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় রসালো ফলের বার্ধক্যপ্রাপ্তি অধিকতর জটিল ; ফলের পক্বতাকে এক বিশেষ অঙ্গের বার্ধক্যপ্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অনেক রসালো ফল পরিণত হওয়ার (সর্বোচ্চ আকারে পৌঁছানো) পর শ্বসনের হারের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়।

ক্লাইম্যাকটেরিক (Climacteric)

কোনো কোনো প্রজাতিতে পরিণত ফলে শ্বসনের হার হ্রাস পায়, কিন্তু পক্বতার সময় শ্বসনের হার অনেক বেড়ে যায় (শ্বসনিক ক্লাইম্যাকটেরিক) এবং পরিশেষে বার্ধক্যপ্রাপ্তির সময় আবার কমে যায়। যেসব ফলে ক্লাইম্যাকটেরিক দেখা যায়, তাদের উদাহরণ হলো অ্যাভোকেডো, কলা, পেয়ারা, আপেল, আম। তবে সব রসালো ফলেই শ্বসনিক ক্লাইম্যাকটেরিক দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে দুপ্রকারের ক্লাইম্যাকটেরিক ফল আছে— এক প্রকারে পক্বতার সময় শ্বসন হার একই থাকে, যেমন- কমলা, পাতিলেবু, ডুমুর ইত্যাদি এবং অপর প্রকারে পক্বতার সময় শ্বসনের হার কমে যায়, যেমন- পেপার।

ফলের পক্বতার সময় ইথিলিনের প্রধানত দুপ্রকারের প্রাণরাসায়নিক প্রভাব আছে। পূর্বেকার ধারণা অনুযায়ী ইথিলিনের জন্য কোষ-ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তনের মাধ্যমে কম্পারটমেনটেশনের পরিবর্তন হয় এবং পক্বতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো যেমন— শ্বসন, অ্যাসিড এবং কোষাচীর উপাদানের ভাঙ্গন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলো মুক্ত হয়। পক্বতার পূর্বে অথবা সময়ে, কোষঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তন হয়; এটি দেখা যায় যখন কোষ থেকে দ্রব বের হয়ে আসে এবং এর সাথে মুক্ত স্থান (free space) বৃদ্ধি পায় এবং আন্তঃকোষীয় ফাঁকা স্থানগুলো রসে পূর্ণ হয়। অপর ধারণাটি হলো ইথিলিনের জন্য ক্লাইম্যাকটেরিকের সময় প্রোটিন সংশ্লেষণ (এনজাইম) বেড়ে যায়।

অক্সিন এবং ইথিলিনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া

IAA এবং অন্যান্য অক্সিন উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলে ইথিলিন তৈরিকে উদ্দীপিত করে।

মূলের বৃদ্ধি রোধ এবং মূলের জিওট্রপিজমে ভূমিকা

মূল অক্সিনে খুবই সংবেদনশীল ; অক্সিনের যে মাত্রায় কাণ্ডের বৃদ্ধি হয়, সেই মাত্রায় মূলের বৃদ্ধি রোধ হয় এবং মূলের বৃদ্ধি রোধে অক্সিন প্রভাবের সাথে অক্সিন প্ররোচিত ইথিলিন তৈরি সারাসরি সম্পর্কিত। উপরন্তু, ইথিলিন সরাসরি মূলের জিওট্রপিজম ঘটায়।

জিওট্রপিজমের কোলোডনি ওয়েন্ট (Cholodney-Went) মতবাদ অনুসারে এটি হয় অভিকর্ষের ফলে অন্তঃস্থ অক্সিনের অপ্রতিসম বিস্তারের জন্য; এ সময় অভিকর্ষ-উদ্দীপিত

অঞ্চলের উপর ও নিচের অংশে অন্তঃস্থ অক্সিনের অনুপাত ৩০ ঃ ৭০। কাণ্ডের তুলনায় মূল অক্সিনে বেশি সংবেদনশীল, তাই নিচের অংশে অক্সিনের অতিরিক্ত ঘনমাত্রার জন্য উপরের অংশের তুলনায় নিচের অংশে বৃদ্ধি কম হয়। এজন্যে অভিকর্ষ-উদ্দীপিত মূল নিচের দিকে বেঁকে যায়।

মূলের জিওট্রপিজমে ইথিলিনের অংশগ্রহণের জন্য মূলের কোলোডনি ওয়েন্ট মতবাদের কিছু কিছু আপত্তি দূর হয়েছে। দুদশকেরও আগে অডাস এবং ব্রাউন (Audus and Brown) বলেছেন যে, মূলের জিওট্রপিজমের সময় প্রকৃতপক্ষে উপরের অংশের বৃদ্ধি প্রথমে বেশি হয় এবং তারপর কমে যায়। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, অক্সিন সক্রিয় রোধক নয়, এক প্রকার রোধক মূলের নিচের অংশ থেকে উপরের অংশে চলে যায়। এই ধারণার সাথে ইথিলিনের অংশগ্রহণ ভালভাবে মিলে যায়, কেননা অক্সিনের অসম বিস্তারের জন্য নিচের অংশে যে ইথিলিন তৈরি হয়, তা আবার কিছুটা উপরের অংশে ব্যাপিত হয় এবং বৃদ্ধিকে রোধ করে। উপরন্তু, ইথিলিনের পরিবহণ সম্পর্কে বার্গ (Burg) এবং সহকর্মীদের গবেষণার ফলাফল কোলোডনি-ওয়েন্ট মতবাদের দ্বিতীয় একটি আপত্তি বর্জনের সহায়তা করে। এটি হলো যে, অনুভূমিকভাবে স্থাপিত মূলে অক্সিনের ৩০ ঃ ৭০ বিস্তার মূলের নিচের অংশের বৃদ্ধি রোধ করতে অপর্যাপ্ত। কেননা নিম্ন মাত্রার IAA প্রয়োগে প্রারম্ভিক রোধ খুব বেশি হয়, এরপর বৃদ্ধি কিছুটা ফিরে পায় এবং উপর ও নিচের অংশে অক্সিনের বিস্তার ৩০ ঃ ৭০ পরিবর্তে ১০ ঃ ৯০ হয়। তবে এটি বর্তমানে মন্তব্য করা যাবে না যে, মূলের জিওট্রপিজমে অক্সিনপ্ররোচিত ইথিলিনই একমাত্র বৃদ্ধি রোধক পদার্থ। কারণ দুটো বিষয়ে কোলোডনি ওয়েন্ট মতবাদ ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে : (১) কতিপয় গবেষক অভিকর্ষ-প্ররোচিত মূলের উপর ও নিচের অংশে IAA এর মাত্রার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পার্থক্য পাননি, এবং (২) এক বা একাধিক বৃদ্ধিরোধক পদার্থ। এর একটি হলো ABA এটি অংশ নেয় বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। মূলত্র অঞ্চলে ABA থাকে, এবং এটি অগ্রভাগ থেকে মূলের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। তাই IAA এবং IAA প্ররোচিত ইথিলিনের ভূমিকা বর্তমানে অনিশ্চিত।

দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের চারা নির্গমনে (seedling emergence) ভূমিকা

বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং চারা নির্গমনের সময় কচি বিটপের অগ্রভাগকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করা সব সজীব উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেসব প্রজাতিতে মৃৎগত অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাদের বীজপত্র মৃত্তিকার নিচে থাকে (হাইপোকটাইল-এর দীর্ঘীকরণ হয় না) এবং নির্গত ভ্রূণমুকুলের শীর্ষদেশ বাঁকা হয়ে যায়, এর জন্য মৃত্তিকা পৃষ্ঠের দিকে বিটপের অগ্রভাগ ঠেলে দিলেও এর কোনো ক্ষতি হয় না। মৃৎভেদী অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষেত্রে হাইপোকটাইল বর্ধিত হয় এবং বড়শির মতো হয় এবং বিটপের অগ্রভাগ রক্ষা পায়। উভয়ক্ষেত্রে চারাগাছ মৃত্তিকা ভেদ করে উপরে উঠার পর বর্ধনশীল বিটপের প্রতিসাম্য বৃদ্ধির জন্য এপিকটাইল অথবা হাইপোকটাইল এর বড়শি সোজা হয়ে যায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপরিণতিতে এটি হলো ইথিলিনের একটি ভূমিকা।

কোষের প্রসারণের তলের উপর ইথিলিনের প্রভাব

ইথিলিনের জন্য কোষের বৃদ্ধির স্বাভাবিক তলের পরিবর্তন হয়। বাধাপ্রাপ্ত দীর্ঘীকরণ এবং প্রতিটি কোষের পার্শ্বীয় প্রসারণের জন্য কাণ্ডের স্ফীতিত্ব এবং পাতার ইপিন্যাস্টি হয়। কখনো কখনো কোষ থেকে মূলরোমের মতো উপাঙ্গ এবং এমনকি অস্থানিক মূল তৈরি হয়। কোষের পার্শ্বীয় (radial) প্রসারণের সাথে ইথিলিন কর্তৃক কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিলের নির্দিষ্ট অবস্থান (orientation) সম্পর্কিত যা প্রধানত দীর্ঘীকরণের জন্য হয়। কোষ-প্রাচীরের

ভিতরের পৃষ্ঠে নতুন করে জমাকৃত মাইক্রোফাইব্রিলগুলো স্বাভাবিকের তুলনায় অধিকতর দৈর্ঘ্য বরাবর তলে অবস্থান করে। এর জন্য কোষের দীর্ঘীকরণ সীমায়িত হয়। কিন্তু পার্শ্বীয় প্রসারণ হয়।

ইথিলিনের অন্যান্য প্রভাব

ইথিলিনের আরো কতিপয় প্রভাব আছে যা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো। এদের একটি হলো আম এবং আনারসের পুষ্পায়নকে উদ্দীপিত করা। অনেক বছর ধরে আনারসের পুষ্পায়নকে উদ্দীপিত করার জন্য আনারসের মাঠে কৃত্রিম অক্সিন NAA স্প্রে করা হতো। এটি দেখা গেছে যে, NAA-উদ্দীপিত ইথিলিন হলো এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত সক্রিয় হরমোন।

পাতার অ্যাবসসিসন হলো অপর একটি প্রক্রিয়া যা ইথিলিন দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং কতিপয় অক্সিনের মতো আগাছানাশকসহ অনেক রাসায়নিক পদার্থ যা পত্র বিমোচনের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন- ২,৪-ডি, ইথিলিন তৈরি মাধ্যমে কাজ করে। পাতার অ্যাবসসিসন ঘটানোর জন্য বহিঃস্থ ইথিলিন যতোটা সক্রিয়, সেরকম প্রাকৃতিক অ্যাবসসিসন প্রক্রিয়ার জন্য ইথিলিনকে প্রধান হরমোন হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অন্যান্য হরমোন, যেমন- অক্সিন, জিব্বারেলিন এবং সাইটোকাইনিন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

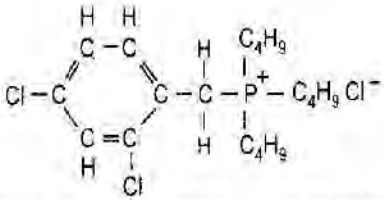

ফসফোন-ডি (২, ৪ -ডাইক্লোরোবেনজাইল - ট্রাইবিউটাইল ফসফোনিয়াম ক্লোরাইড)

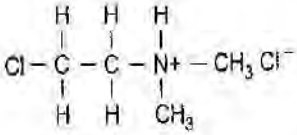

সাইকোসিল [(২- ক্লোরাইথাইল) ট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড)]

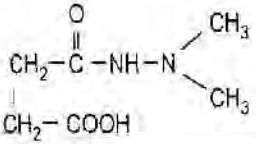

বি-নাইন (এন-ডাইমিথাইল অ্যামাইনো সাকসিনামিক এসিড)

চিত্র ৫.১০ : কতিপয় বৃদ্ধিরোধক রাসায়নিক পদার্থের গাঠনিক সংকেত

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইথিলিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এসময় একটি নতুন, পানিতে দ্রবণীয় এবং ধীরে ধীরে ইথিলিন মুক্ত করে এমন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর সাধারণ নাম হলো এথরিল (ethrel) এবং রাসায়নিক নাম ২-ক্লোরোইথাইল ফসফোরিক অ্যাসিড। জলীয় দ্রবণে এবং কলায় এথরিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে ইথিলিন তৈরি করে। এর প্রবর্তনের কয়েক বছরের মধ্যেই কতগুলো ফলজ শস্যে এই কৃত্রিম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৃদ্ধিরোধক রাসায়নিক পদার্থ (Growth retarding chemical)

অনেকগুলো বৃদ্ধিরোধক রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের রাসায়নিক গঠন ভিন্ন প্রকৃতির। অ্যামো ১৬১৮ (Amo 1618) এবং সাইকোসিল (cycocel)-এ একটি কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম গ্রুপ থাকে, অপরদিকে ফসফোন-ডি (phosfon-D) তে একটি ফসফোনিয়াম গ্রুপ থাকে। এ জাতীয় পদার্থ কাণ্ডের দীর্ঘীকরণে বাধা প্রদান করে। তামাক উৎপাদনকারীরা অগ্রস্থ বিটপ অপসারণ করে পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করার জন্য ম্যালিক হাইড্রাজাইড (maleic hydrazide) ব্যবহার করে। কাণ্ডের দীর্ঘীকরণে বাধা প্রাদান করা ছাড়াও বৃদ্ধি-রোধক রাসায়নিক পদার্থের আরো কিছু প্রভাবে আছে। এদের প্রভাবে পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় এবং কোনো কোনো উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।

অ্যামো ১৬১৮, ফসফোন-ডি, সাইকোসিল প্রভৃতি বৃদ্ধি-রোধক পদার্থ প্রয়োগে গাছের উচ্চতা কমে গেলে, জিব্বারেলিন প্রয়োগ করে তা দূর করা যায়। ধারণা করা হয় যে, বৃদ্ধি-রোধক পদার্থ জিব্বারেলিন সংশ্লেষণের কোনো ধাপে বাধা প্রদান করে।

ভিটামিন (Vitamin)

ভিটামিন হলো জৈব-রাসায়নিক পদার্থ যা খুব সামান্য মাত্রায় উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকাংশ উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ তাদের প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন সংশ্লেষণ করতে পারে। অপরদিকে, প্রাণীরা ভিটামিন সংশ্লেষণ করতে পারে না বলে ভিটামিনের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ ভিটামিন কোএনজাইম হিসেবে কাজ করে। জৈব খাদ্যবস্তু থেকে ভিটামিন এজন্য পৃথক যে, এটি কলার গঠনে অংশগ্রহণ করে না এবং এটি ভেঙে শক্তিও নির্গত হয় না। যেহেতু ভিটামিন স্থানান্তরিত হতে পারে না অর্থাৎ যে কোষে তৈরি হয় সে কোষেই কাজ করে, সেহেতু এটি হরমোন থেকে পৃথক। তবে কতিপয় ভিটামিন, যেমন- থায়ামিন (thiamine) আংশিকভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে। তাই পূর্বে এদেরকে হরমোন বলা হতো।

পানিতে অথবা স্নেহপদার্থে দ্রবণীয়তা এবং বর্ণানুক্রমে (alphabatically) সাধারণত ভিটামিনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো ভিটামিন A, D, E, K, Q ও F এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো ভিটামিন C এবং ভিটামিন B-কমপ্লেক্স। ভিটামিন B_1 (থায়ামিন), B_2 (রাইবোফ্ল্যাভিন), B_6 (পাইরিডোক্সিন), ফলিক অ্যাসিড, নিকোটিনিক অ্যাসিড (নায়াসিন), প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, B_{12} (কোবালামিন) এবং বায়োটিন নিয়ে ভিটামিন B-কমপ্লেক্স গঠিত।

ভিটামিন A

উদ্ভিদে ভিটামিন A এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে এর অগ্রবর্তী পদার্থ ক্যারোটিনয়েড উদ্ভিদের সব অঙ্গেই পাওয়া যায়। এক অনু বিটা-ক্যারোটিন ভেঙে দুই অণু ভিটামিন A তৈরি হয়। কেবল প্রাণিদেহে ভিটামিন A তৈরি হয়।

$C_{40}H_{56} + 2H_2O \longrightarrow 2C_{19}H_{27}CH_2OH$
বিটা-ক্যারোটিন ভিটামিন A

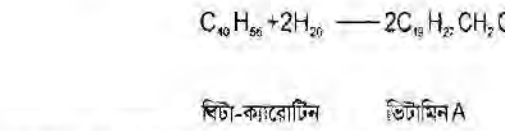

বিটা-ক্যারোটিন ভিটামিন A

থায়ামিন (ভিটামিন B_1)

আলফা-কিটো অ্যাসিডের (যেমন- পাইরুভিক অ্যাসিড, আলফা-কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড) ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়ায় কোএনজাইম হিসেবে থায়ামিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত দুই অবস্থায় B_1 পাওয়া যায় – মুক্ত অবস্থা, একে থায়ামিন বলে এবং সংযুক্ত অবস্থা (bound form), যাকে থায়ামিন পাইরোফসফেট বলে। থায়ামিন পাইরোফসফেট B_1 এর সক্রিয় অবস্থা এবং ATP থেকে থায়ামিনে পাইরোফসফেট স্থানান্তরের মাধ্যমে এটি সংশ্লেষিত হয়। উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে থায়ামিন পাওয়া যায়।

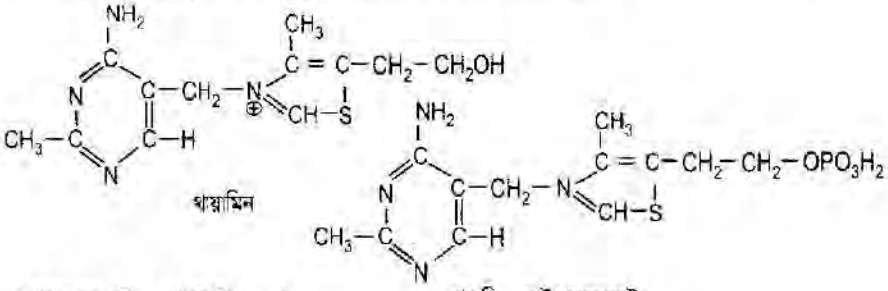

থায়ামিন থায়ামিন পাইরোফসফেট

রাইবোফ্ল্যাভিন (ভিটামিন B_2)

উদ্ভিদে সংযুক্ত রাইবোফ্ল্যাভিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফ্ল্যাভিন মনোনিউক্লিওটাইড (FMN) এবং ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিটাইড (FAD) কোএনজাইম দুটির গাঠনিক উপাদান হিসেবে রাইবোফ্ল্যাভিন কাজ করে। এটি জৈব জারণে অংশগ্রহণ করে। উদ্ভিদের সব অংশেই প্রচুর পরিমাণে রাইবোফ্ল্যাভিন সংশ্লেষিত হয়।

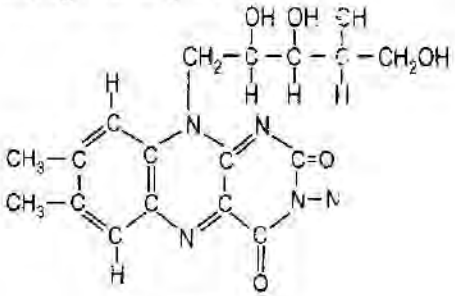

রাইবোফ্ল্যাভিন

নিকোটিনিক অ্যাসিড (নায়াসিন)

এটি NAD^+ এবং $NADP^+$ নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ কোনো এনজাইমের গাঠনিক উপাদান। অনেক হাইড্রোজেন স্থানান্তর বিক্রিয়ায় এরা অংশগ্রহণ করে।

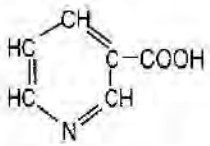

নিকোটিনিক অ্যাসিড

পাইরিডক্সিন, পাইরিডক্সাল এবং পাইরিডক্সিঅ্যামিন (ভিটামিন B_6- কমপ্লেক্স)

পাইরিডক্সিন প্রথমে পাইরিডক্সাল এবং পাইরিডক্সিঅ্যামিনে পরিণত হয় এবং এদের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে যথাক্রমে পাইরিডক্সাল ফসফেট এবং পাইরিডক্সাঅ্যামিন ফসফেটে পরিণত হয়। পাইরিডক্সাল ফসফেট পাইরিডক্সিনের কার্যকর অবস্থা। অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকে পাইরিডক্সাল ফসফেট কোএনজাইম হিসেবে কাজ করে।

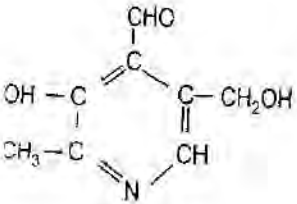

পাইরিডক্সাল

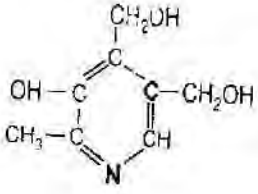

পাইরিডক্সিন

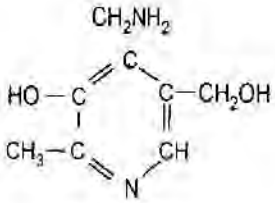

পাইরিডক্সামিন

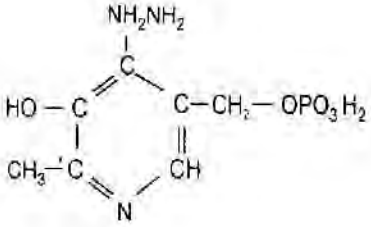

পাইরিডক্সামিন ফসফেট

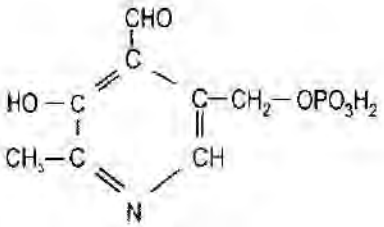

পাইরিডক্সাল ফসফেট

প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড

উদ্ভিদের প্রায় সব অংশেই প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। তবে গমের দানার অ্যালিউরোন স্তরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড কদাচিত মুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রায় সবটুকু প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড কোএনজাইম A তে থাকে। ট্রান্সঅ্যাসাইলেশন বিক্রিয়ার কোএনজাইম A অংশগ্রহণ করে।

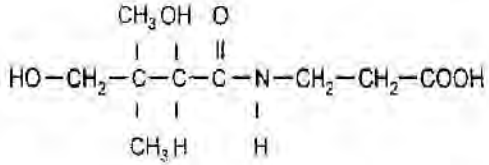

প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড

বায়োটিন

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের সব অংশেই বায়োটিন থাকে। অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের বিপাকে, ক্রেবস চক্রের ডিকার্বোঅক্সিলেশন বিক্রিয়ায় ও অলিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে বায়োটিনের ভূমিকা আছে।

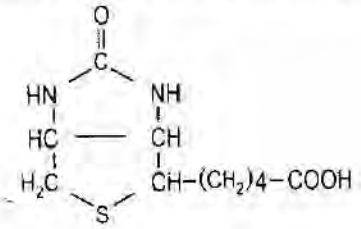

বায়োটিন

অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (ভিটামিন C)

উদ্ভিদের সব অংশেই অ্যাসকরবিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, তবে সবুজ পাতায় এবং কতিপয় ফলের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

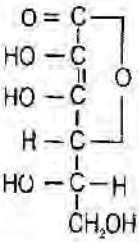

অ্যাসকরবিক অ্যাসিড

ভিটামিন D

উদ্ভিদে ভিটামিন D খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিন E (টোকোফেরল)

সাতটি প্রাকৃতিক টোকোফেরল শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, এদের মধ্যে আলফা-টোকোফেরল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধারণা করা হয় যে, ক্লোরোপ্লাস্টের ইলেক্ট্রন পরিবহণে এটি অংশগ্রহণ করে।

ভিটামিন K

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ভিটামিন K আছে। ক্লোরোপ্লাস্টে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এটি পাওয়া যায়। সালোকসংশ্লেষণের চক্রীয় ইলেক্ট্রন প্রবাহে ভিটামিন K অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফটোপিরিয়ডিজম

উদ্ভিদের জীবনচক্রে পুষ্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেননা অঙ্গজ দশা থেকে জনন দশায় রূপান্তরণের জন্য উদ্ভিদে বেশ কয়েক প্রকার শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। পুষ্পায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অঙ্গজ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদে এ সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন– বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদে কয়েক বছর অঙ্গজ বৃদ্ধির পর পুষ্পায়ন হয়, কিন্তু বর্ষজীবী উদ্ভিদে কয়েক মাসের মধ্যেই পুষ্পায়ন হয়। উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য আলোর আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য (ফটোপিরিয়ডিজম) এবং তাপমাত্রা (ভার্নালাইজেশন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দিবা-রাত্রির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে ফুল ধারণের জন্য সাড়া দেয়াকে ফটোপিরিয়ডিজম বলে। দিবাকালীন সময়কে সংক্ষেপে ফটোপিরিয়ড বলে।

ফটোপিরিয়ডিজমের আবিষ্কার

যদিও ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে হ্যানস্ট্রে বলেছিলেন যে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিস্তারের জন্য আলোর সময়সীমা অংশত দায়ী। তবে প্রত্যহিক আলোর সময়সীমা নিয়ন্ত্রিত করে সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন সুমেরু বৃত্ত (arctic circle) জেলম্যান (Kellman) ১৮৭৮ এবং ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। প্রাত্যহিক আলোর দীর্ঘ সময়সীমার জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়, কিন্তু এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সম্ভাব্য ফটোপিরিয়ডিক প্রভাবের সাথে সালোকসংশ্লেষণের পার্থক্যও নির্ণীত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনক্যানডেসেন্ট বাল্বের আবিষ্কার হয় এবং এই বাল্ব ব্যবহার করে আলোককালের সময়সীমা বাড়িয়ে শীতকালে অনেক উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত করার কয়েকটি প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফলতা লাভ করে। তবে যেহেতু দিবাদৈর্ঘ্যকে দীর্ঘায়িত করার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সেহেতু সালোকসংশ্লেষণের প্রভাব একেবারে বাদ দেয়া যায় না এবং প্রাত্যহিক আলোর সময়সীমার গুরুত্ব সম্ভব হয়নি।

উদ্ভিদের পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণে দিবাদৈর্ঘ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে সম্ভবত প্রথম অনুধাবন করেন জুলিয়েন টুরনয়িস (Julien Tournois, 1912, 1914)। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য *Humulus* এবং *Cannabis* উদ্ভিদ দুটি নির্বাচন ছিল একটি সৌভাগ্যসূচক ঘটনা। শীতকালে এই উদ্ভিদ দুটিকে গ্রিনহাউজে বপন করলে এদের অসময়ে পুষ্পায়ন হয়। টুরনয়িস তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং বীজের উৎসের প্রভাব বর্জন করে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে দিবাদৈর্ঘ্যের উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, যদিও এই উদ্ভিদগুলোর বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল, তথাপিও প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা আলো প্রদানের জন্য এদের খুব দ্রুত পুষ্পায়ন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় টুরনয়িস বিশ্বাস করতেন যে, আলোর পরিমাণ হ্রাস হলো পুষ্পায়নের নির্ধারক প্রভাবক কিন্তু *Humulus*-এর যৌনতা সংক্রান্ত তাঁর সব শেষ গবেষণাপত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে, এর প্রভাব খুব সামান্যই ছিল। তিনি মন্তব্য করেন যে, তিনি স্বল্পকাল

BAKSDOC Library Dhaka

স্থায়ী প্রাত্যহিক আলোয় এই অসময়ে পুষ্পায়ন হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং উপরন্তু এটি ঘটেছিল দিবাদৈর্ঘ্যের হ্রাসের তুলনায় রাতের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বেশি হওয়া কারণে। টুরনয়িস আরো গবেষণার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শেষ গবেষণাপত্রটি প্রকাশের পর তিনি নিহত হন।

প্রায় একই সময়ে জার্মানিতে হ্যান্স ক্লেবস (Hans Klebs) *Sempervivum funkii*-এর পুষ্পায়নের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব হতে কয়েকদিন অবিচ্ছিন্ন (continuous) আলো প্রদান করে শীতকালের মাঝামাঝিতে রোজেট অবস্থা থেকে পুষ্পায়ন ঘটাতে কৃতকার্য হয়েছিলেন ; যেসব রোজেটে আলো প্রদান করা হয়নি, সেগুলো সবসময়ই অঙ্গজ ছিল। তিনি মন্তব্য করেন যে, পুষ্পায়নে সম্ভবত আলো পুষ্টিগত অপেক্ষা অনুঘটক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ক্লেবস বুঝতে পেরেছিলেন যে, দীর্ঘ দিবালোকের মাধ্যমে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত করা যায়। গার্নার এবং অ্যালার্ড (Garner and Allard) প্রথম সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে পুষ্পায়ন এবং আরো অন্যান্য উদ্দীপনাকে ত্বরান্বিত করা যায়। সেটা সম্ভব হয় দীর্ঘ দিবালোক না হয় হ্রস্ব দিবালোকের মাধ্যমে। তাঁরা ফটোপিরিয়ডিজমের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস করেন এবং ফটোপিরিয়ড এবং ফটোপিরিয়ডিজম শব্দ দুটি ব্যবহার করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের বেল্টসভিলিতে (Beltsville) অবস্থিত ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার স্টেশনে তামাকের *(Nicotiana tabcum)* উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় গার্নার এবং অ্যালার্ড পুষ্পায়নে আলোর প্রভাবের কথা জানতে পারেন। 'মেরিল্যান্ড ম্যামোথ' নামক তামাকের একটি বহুল প্রচলিত জাতকে (variety) বসন্তকালে বপন করলে গ্রীষ্মকালে এদের পুষ্পায়ন হয়। কখনো কখনো মাঠে এ জাতের তামাক গাছের মধ্যে কতিপয় মিউট্যান্ট গাছ জন্মে যা এদের তুলনায় বেশি লম্বা এবং বৃহদাকার পাতা উৎপাদন করে। এ মিউট্যান্ট গাছকে 'মেরিল্যান্ড ম্যামথ' নাম দেয়া হয়। 'মরিল্যান্ড ম্যামথ' জাতের তামাক গাছে অবশ্য গ্রীষ্মে ও হেমন্তকালে পুষ্পায়ন হয় না এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাছগুলো মারা যায়। শীতকালে তুষারপাতের আগেই এদেরকে মাঠ থেকে তুলে গ্রিনহাউজে রাখলে অবশ্য শীতকালে এদের পুষ্পায়ন হয় এবং ফল ধারণ করে। পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এ বীজ শীতকালে গ্রিনহাউজে অঙ্কুরোদ্গম করালে বসন্তের প্রারম্ভেই এসকল ক্ষুদ্রাকার গাছেই পুষ্পায়ন হয় এবং প্রচুর পরিমাণ বীজ উৎপাদন হয়। কিন্তু বসন্তকালে বীজ অঙ্কুরোদ্গম হলে গ্রীষ্মকালে গাছগুলোর অঙ্গজ বৃদ্ধি খুবই বেশি হয় কিন্তু ফুল ফোটে না।

উপরোক্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গার্নার এবং অ্যালার্ড 'মেরিল্যান্ড ম্যামথ' জাতের তামাক, পিকিং জাতের সয়াবিন *(Glycine max* CV. Peking) এবং অন্যান্য উদ্ভিদের পুষ্পায়নের উপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তাঁরা অন্ধকার প্রকোষ্ঠ (dark chamber) তৈরি করেন যা মাঠে অবস্থিত গাছের উপর রাখা যেতো এবং গ্রিনহাউজে এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে আলোককালের সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পুষ্পায়নে তাপমাত্রাও একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই বদ্ধ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাতে তাপমাত্রা খুব বেড়ে না যায়, সে বিষয়েও তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গার্নার এবং অ্যালার্ড তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, দিন-রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আলোক এবং অন্ধকারের সময়সীমা উদ্ভিদের পুষ্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে আলোক সময়সীমাতে 'মেরিল্যান্ড ম্যামথ' তামাকের

পুষ্পায়ন হয়েছিল তাকে তাঁরা স্বল্প-দিবালোক সময়সীমা বলেন এবং তামাকের 'মেরিল্যান্ড ম্যামথ' এবং সয়াবিনের 'পিকিং' জাতকে স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ নামে অভিহিত করেন। তাঁরা আরো কতিপয় উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদ্ভিদকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা– স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (short day plant), দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (long day plant) এবং দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (day neutral plant)।

গার্নার এবং অ্যালার্ডের গবেষণার ফলাফল অনুধাবন করতে হলে মেরিল্যান্ডের বেল্টসভিলি-এর স্বাভাবিক দিবাদৈর্ঘ্য এবং সারা বছরে এ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে জানা দরকার। বেল্টসভিলি ৩৯ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত এবং সারা বছরের দিবালোকের পরিবর্তন চিত্র ৬.১-এ দেখানো হয়েছে। মার্চের ২১ এবং সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান (১২ ঘণ্টা), কিন্তু বছরের অন্যান্য সময় দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য অসমান। ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে জুনের ২১ তারিখে সর্বোচ্চ ১৫ ঘণ্টা হয় এবং তারপর দিনের দৈর্ঘ্য কমতে কমতে ডিসেম্বরের ২১ তারিখে ৯ ঘণ্টায় দাঁড়ায়।

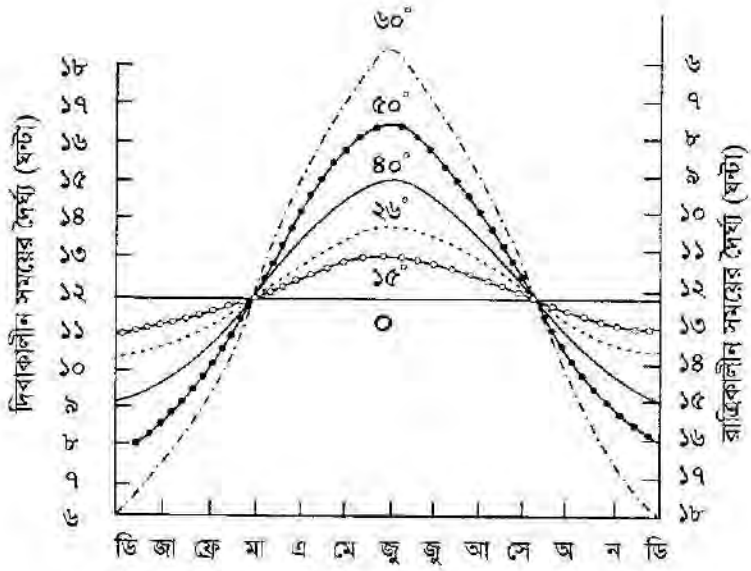

চিত্র ৬.১ : বিষুবরেখার উত্তরে বিভিন্ন অক্ষাংশে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য

ফেব্রুয়ারির শেষে এবং মার্চের প্রথমে তামাকের বীজ বীজতলায় বপন করা হয়। এপ্রিল এবং মে মাসে যখন তাপমাত্রা বেশি থাকে, তখন চারা মাঠে রোপন করা হয়। রোপনের সময় দিবাদৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ঘণ্টা থাকে এবং তা বেড়ে জুনের ২১ তারিখে ১৫ ঘণ্টা হয়, তারপর দিবাদৈর্ঘ্য কমতে থাকে। গার্নার এবং অ্যালার্ড লক্ষ্য করেছিলেন যে, দিবাদৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার কম না হলে 'মেরিল্যান্ড ম্যামথ' তামাকের পুষ্পায়ন হয় না। চিত্র ৬.১-এ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখ অতিক্রান্ত না হলে এরকম দিবাদৈর্ঘ্য হবে না। যদিও ১২ ঘণ্টা দিবাদৈর্ঘ্য পুষ্পারম্ভ হবে, তবুও পুষ্প দৃশ্যত হতে আরও কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে এবং বীজ

পরিপক্ব হতে আরো বেশি সময় লাগবে। তাই মাঠে জন্মানো 'মেরিল্যান্ড ম্যামথ' তামাকের পুষ্পারম্ভ সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখের দিকে হলেও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা তুষারপাতের জন্য বীজ উৎপাদনের পূর্বেই গাছ মারা যাবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ব্যাখ্যা করতে চিত্র ৬.১-এ দিবালোকের দৈর্ঘ্যের উপাত্ত খুব উপযোগী। যেমন— বিষুবরেখা বরাবর সারাবছরই দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ঘণ্টা থাকে। অনেক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ ও স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে উপযুক্ত তাপমাত্রা এবং পর্যাপ্ত পানি পেলে সবসময়ই এদের পুষ্পায়ন হয়।

দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া

পুষ্পায়ন ছাড়াও দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতি উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন— স্বল্প-দিবালোক কসমসের পুষ্পারম্ভের পর দীর্ঘ-দিবালোকে স্থানান্তরিত করলে পরাগরেণু বন্ধ্যা হয়। পুষ্পের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হতে পারে, যেমন— স্বল্প-দিবালোকে ডালিয়ার রে পুষ্পক ডিস্ক তৈরি হওয়ায় পুষ্প অধিকতর ছড়িয়ে থাকে।

দিবাদৈর্ঘ্যের জন্য অঙ্গজ বৃদ্ধিও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। একটি অধিকতর দৃশ্যত প্রভাব হলো কাষ্ঠল প্রজাতিতে শীতকালীন সুপ্তাবস্থার প্রারম্ভ। যদিও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের মুকুলের সুপ্তাবস্থা নির্ভর করে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ উভয় প্রকার প্রভাবকের উপর, তথাপিও দিবাদৈর্ঘ্যের প্রভাবও যথেষ্ট ; দীর্ঘ-দিবাদৈর্ঘ্য সুপ্তাবস্থা বিলম্বকরণে অথবা বন্ধকরণে খুবই কার্যকর। দীর্ঘ-দিবাদৈর্ঘ্যের জন্য পত্রপতনও বিলম্বিত হয়। বিভিন্ন দিবাদৈর্ঘ্য বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ; উচ্চতা, শাখা-প্রশাখা তৈরি, পাতার আকার ও আকৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

অঙ্গজ যৌনাঙ্গ তৈরি হওয়াও দিবাদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে। পিঁয়াজের কন্দ (bulb) তৈরির জন্য দীর্ঘ-দিবালোক এবং ডালিয়ার টিউবার তৈরির জন্য স্বল্প-দিবালোকের প্রয়োজন হয়। স্ট্রবেরির (strawberry) পুষ্পায়ন স্বল্প দিবালোকে এবং ধাবক (runner) তৈরি দীর্ঘ-দিবালোকে হয়। পাতা থেকে জন্মানো উদ্ভিদের শিকড় গজানোও কখনো কখনো দিবাদৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ফটোপিরিয়ডিজমের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস

গার্নার এবং অ্যালার্ডের প্রাথমিক গবেষণার পর থেকেই দিবা-রাত্রির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের সাথে বিভিন্ন উদ্ভিদের পুষ্পায়নের সম্পর্ক বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ফটোপিরিয়ডিজমের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে :

১. **স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ** (SDP) : পুষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিবাকালীন সময়ের দৈর্ঘ্যকে সংকট দিবাকালীন সময় (critical photoperiod) বলে। সংকট দিবাকালীন সময়ের চেয়ে কম দিবাকালীন সময় হলে যেসব উদ্ভিদের পুষ্পায়ন হয়, তাদেরকে স্বল্প দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ বলে। যেমন— ওকরা গাছের (*Xanthium strumarium*) সংকট দিবাকালীন সময় হলো ১৫.৫ ঘণ্টা অর্থাৎ দিবাকালীন সময়ের দৈর্ঘ্য ১৫.৫ ঘণ্টার কম না হলে ওকরা গাছে ফুল ফুটবে না। এজাতীয় উদ্ভিদের আলোক পর্যায়ের তুলনায় অন্ধকার পর্যায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই একে দীর্ঘ রাত্রিকালীন উদ্ভিদও বলে। অন্ধকার পর্যায় অবশ্য অবিচ্ছিন্ন হতে হবে অর্থাৎ একটি আলোর ঝলকানি দিয়ে ছিন্ন করলেই এ জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পায়ন হবে না। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, যদি সুক্রোজ সরবরাহ করা হয়, তাহলে স্বল্প-দিবালোক

প্রাপ্ত উদ্ভিদকে সবসময় অন্ধকারে রাখলেও তাদের পুষ্পায়ন হয়। এটি প্রমাণ করে যে, কেবল সালোকসংশ্লেষণের জন্য এ জাতীয় উদ্ভিদের আলোর প্রয়োজন হয়। সারণি ৬.১-এ স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

২. **দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ** (LDP) : যেসব উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য সংকট দিবাকালীন সময়ের চেয়ে দীর্ঘ দিবালোকের প্রয়োজন হয়, তাদেরকে দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ বলে। যেমন- হেনবেনের *(Hyoscyamus niger)* সংকট দিবাকালীন সময় হলো ১১ ঘণ্টা অর্থাৎ ১১ ঘণ্টার বেশি দিবাকালীন সময় হলেই হেনবেনের ফুল ফুটবে। বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্য সংকট দিবাকালীন সময় ভিন্ন ভিন্ন। সারণি ৬.১-এ দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

৩. **দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ** (DNA) : যেসব উদ্ভিদের পুষ্পায়ন দিবালোকের দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাদেরকে দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ বলে (সারণি ৬.১)। সাধারণত উপরোক্ত শ্রেণিগুলোকে আবার নিম্নলিখিত উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

(ক) অবিমিশ্র (absolute) ফটোপিরিয়ডিক উপশ্রেণি, যেখানে পুষ্পায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিবাদৈর্ঘ্য অত্যাবশ্যক, এবং

(খ) পরিমাণগত (quantitative) ফটোপিরিয়ডিক উপশ্রেণি, যেখানে একটি সুনির্দিষ্ট দিবাদৈর্ঘ্য পুষ্পায়নকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু তা অত্যাবশ্যক নয়;

এ দুটি উপশ্রেণিকে সবসময় শনাক্ত করা সহজ নয়, কারণ কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর সুস্পষ্ট হতে পারে। যেমন- একটি তাপমাত্রায় কোনো উদ্ভিদের অবিমিশ্র দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন আছে কিন্তু অন্য তাপমাত্রায় কেবল পরিমাণগত প্রতিক্রিয়া আছে। সম্ভবত এটি বিবেচনা করা অধিকতর সুবিধাজনক যে, এই দুপ্রকার উপশ্রেণি কোনো সুস্পষ্ট গ্রুপ নয় ; কিন্তু একদিকে উপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্যের জন্য পুষ্পায়ন সামান্য ত্বরান্বিত হওয়া থেকে অন্যদিকে অনুপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্যের জন্য অনির্দিষ্টকাল পুষ্পায়ন বিলম্বিত হওয়া।

কিছু উদ্ভিদের দ্বৈত (dual) দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। যেমন- *Cestrum nocturnum*-এ স্বল্প দিবালোকে পুষ্পায়ন হয় কেবল যদি এগুলো পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণ দীর্ঘ-দিবালোক গ্রহণ করে থাকে (দীর্ঘ-স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ) এবং *Scabiosa succisa*-এ কেবল পূর্বে গৃহীত স্বল্প-দিবালোক হলেই দীর্ঘ-দিবালোকে পুষ্পায়ন হয় (স্বল্প-দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ)। কোনো কোনো উদ্ভিদের বিশেষ দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এদের কিছু কিছু পুষ্পায়ন হয়, যখন দিবাদৈর্ঘ্য খুব দীর্ঘও হয় না অথবা খুব স্বল্পও হয় না। এরকম মধ্যবর্তী দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (intermediate day plant) হলো স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের একটি প্রকরণ, কেননা স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য প্রত্যহ কিছু আলোর প্রয়োজন হয়। তবে, অধিকাংশ স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের দিবাদৈর্ঘ্যের পরিসর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত (যেমন- *Xanthium strumarium* এর পুষ্পায়নের জন্য ২৪ ঘণ্টা চক্রে দিবাদৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা থেকে ৩ থেকে ১৫.৫ ঘণ্টার মধ্যে পুষ্পায়ন হয়)। অপরদিকে, প্রকৃত মধ্যবর্তী-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পরিসর সঙ্কীর্ণ (যেমন- *Mikania scandens*-এ পুষ্পায়ন হয় যখন ২৪ ঘণ্টা চক্রে দিবাদৈর্ঘ্য মাত্র ১২.৫ ঘণ্টা এবং ১৬ ঘণ্টার কমের মধ্যে থাকে)। আরেকটি সম্ভাবনা হলো যে, মধ্যবর্তী-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের প্রকৃতপক্ষে দ্বৈত দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন আছে, কেননা কিছু দীর্ঘ-স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ এবং স্বল্প-দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে ফটোপিরিয়ডিক আবেশের দীর্ঘ-দিবালোক ও স্বল্প-দিবালোক অংশের পারস্পরিক সান্নিধ্য ঘটে। তখন একটি নির্দিষ্ট মধ্যবর্তী দিবাদৈর্ঘ্য দীর্ঘ-দিবালোক ও স্বল্প-

সারণি ৬.১ : ফটোপিরিয়ডিজমের ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস

১. ক. অবিমিশ্র স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Amaranthus caudatus, Ambrosia elatior, Andropogon gerardii, Bryophyllum pinnatum, Chenopodium album, C. rubrum, Chrysanthemum indicum, C. morifolium, Coffea arabica, Cosmos sulphureus, Glycine max cv. Biloxi, *Impatiens balsamina, Ipomoea batatas, Kalanchoe blossfeldiana, Lemna perpusilla, Oryza sativa, Perilla crispa, Phaseolus vulgaris, Xanthium strumarium, Zea mays.*

১.খ. পরিমাণগত স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Amaranthus graecizans, Andropogon virginicus, Cannabis sativa cv. Kentucky, *Capsicum frutescens, Chenopodium rubrum, Cosmos bipinnatus, Datura stramonium, Glycine max* Cv. Mandell, *Gossypium hirsutum, Helianthus annuus, Helianthus tuberosus, Ipomoea batatas, Oryza sativa, Saccharum spontaneum, Solanum tuberosum, Zinnia × hybrida*

২.ক. অবিমিশ্র দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Agropyron smithi, Agrostis nebulosa, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Avena sativa, Spring strains, Chrysanthemum maximum, Dianthus superbus, Festuca elatior, Hyoscyamus niger, Lolium temulentum cv. ceres, *Melilotus alba, Nicotiana sylvestris, Phalaris arundinacea, phleum nodosum, Raphanus sativus, Scabiosa ukranica, Sedum spectabile, Sinapis alba, Spinacia oleracea.*

২.খ. পরিমাণগত দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Brassica campestris, Brassica rapa, Camellia japonica, Dianthus barbatus, Hordeum vulgare, Spring strains, Nicotiana tabacum cv Havana, *Nigella arvensis, Oenothera rosea, Secale cereale, Trifolium pratense* cv American Medium, *Triticum aestivum,* Spring strains.

৩. দ্বৈত-দিবাদৈর্ঘ্য উদ্ভিদ

ক. দীর্ঘ-স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Aloe bulbitifera, Bryophyllum crenatum, Cestrum aurantiacum,

খ. স্বল্প-দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Echeveria harmsii, succisa, Trifolium repens

৪. মধ্যবর্তী-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Chenopodium album, Coleus hybrida cv. Autumn, *Mikania scandens, Ocimum basilicum, Phaseolus polystachs, Saccharum spontaneum, Tephrosia candida.*

৫. অ্যাম্ফিফটোপিরিয়ডিক উদ্ভিদ

Chenopodium rubrum, Madia elegans, Setaria verticillata,

৬. দিবালোক-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ

Browallia speciosa major, Calendula officinalis, capsicum frutecens, Cestrus elegans, Cucumis sativus, Euphorbia peplus, Fagopyrum esculentum, Gossypium hirsutum, Helianthus annuus, Impatiens balsamina, Lunaria annua, Lycopersicon esculentum, Nicotiana tabacum, Oryza sativa, phaseolus vulgaris, Pisum stivum, Solanum tuberosum, Zea mays.

দিবালোক উভয়েরই চাহিদা পূরণ করে। অপর একটি বিশেষ প্রকার উদ্ভিদ আছে যাদের স্বল্প দিবালোক কিংবা দীর্ঘ-দিবালোক উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত পুষ্পায়ন হয় কিন্তু মধ্যবর্তী দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পায়ন বিলম্বিত হয়। এই প্রকার আচরণকে বলা হয় অ্যাম্ফিফটোপিরিয়ডিজম (amphiphoperiodism) এবং *Madia elegans*-এ এটি দেখা যায় ৮ এবং ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা দিবাদৈর্ঘ্যে এর পুষ্পায়ন হয় কিন্তু ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা দিবাদৈর্ঘ্যে হয় না।

দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা

দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতি কোনো একটি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া পারিবেশিক প্রভাবক অথবা অন্য কোনো প্রভাবক, যেমন- বয়স দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। এক পরিবেশে একটি উদ্ভিদের পুষ্পায়নে ফটোপিরিয়ডিজমের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু অপর পরিবেশে এটি দিবালোক-নিরপেক্ষ উদ্ভিদের মতো আচরণ করতে পারে।

পুষ্পারম্ভের পূর্বে উদ্ভিদের কিছুটা অঙ্গজ বৃদ্ধি অবশ্যই হতে হবে। কমপক্ষে বীজে অবস্থিত পাতার প্রাইমরডিয়ার সংখ্যার চেয়ে বেশি না হলেও চলে এবং ভুট্টার (*Zea mays*) একটি স্ট্রেইনে অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বেই পুষ্প প্রাইমরডিয়া শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তবে, সাধারণত পুষ্পারম্ভের পূর্বে অতিরিক্ত পাতা প্রাইমরডিয়া অবশ্যই তৈরি হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ফটোপিরিয়ডিজমে সংবেদনশীল একটি ভুট্টার স্ট্রেইনে দেখা গেছে যে, ভ্রূণে যদি সাতটি পাতা-প্রাইমরডিয়া থাকে, পুষ্পায়নের পূর্বে কমপক্ষে এগারটি পাতা তৈরি হয়। *Triticum Hordeum, Pisum, Hyoscyamus* এবং *xanthium* সহ অনেক উদ্ভিদের সর্বনিম্ন পাতার সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই ভ্রূণের পাতা-প্রাইমরডিয়ামের সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পাতার সংখ্যা প্রায় একই। সর্বনিম্ন পাতার সংখ্যার বিভিন্নতা হয় কিন্তু পুষ্পায়নের পূর্বে কিছু কলারপাতা থাকতে হবে এবং ফটোপিরিয়ডিক আবেশ হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে একটি পাতা (অথবা কখনো কখনো বীজপত্র) অবশ্যই প্রসারিত হতে হবে।

সর্বনিম্ন পাতার সংখ্যার ধারণা এবং জুভেনিলিটির (juvenility) ধারণা সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু পুরোপুরি এক নয়। সর্বনিম্ন পাতার সংখ্যা হলো পুষ্পারম্ভের পূর্বে কমপক্ষে সেই সংখ্যার পাতা থাকতে হবে। আর জুভেনিলিটি হলো বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর প্রাথমিক বৃদ্ধি দশা, যে সময়ে পুষ্পায়নকে কোনোভাবেই প্ররোচিত করা যাবে না। অনেক উদ্ভিদে জুভেনাইল দশা শেষ হওয়ার পর কোনো নির্দিষ্ট পররিবেশীয় উদ্দীপনা ছাড়াই পুষ্পায়ন হয় কিন্তু অন্য উদ্ভিদে উপযুক্ত পরিবেশীয় ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয়। জুভেনাইল দশার সময়সীমার যথেষ্ট ভিন্নতা হয়। *Xanthium strumarium*-এ অঙ্কুরোদ্গমের পর প্রথম সপ্তাহে ফটোপিরিয়ডিক আবেশ প্রদান করা যায় না, *Perilla ocymoides* পনের দিনের আগে সংবেদনশীল হয় না এবং *Perilla nankinensis* -এর আরো পাঁচদিন বেশি দরকার হয়। সময়ের এই প্রয়োজন কেবল পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নয়, কেননা একটি পাতা রেখে বাকি পাতা কেটে ফেলে দেয়া কোনো উদ্ভিদের এবং সবগুলো পাতাযুক্ত সেই উদ্ভিদের সাধারণত একই সংখ্যায় আবেশীয় ফটোপিরিয়ডের দরকার হয়। প্রত্যেকটি পাতার ফটোপিরিয়ডিক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উদ্ভিদের গোড়া থেকে অগ্রভাগের পাতার ক্রমানুসারে এই সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথমে তৈরি হওয়া পাতাগুলো ফটোপিরিয়ডিক আবেশে সম্পূর্ণরূপে অসংবেদনশীল হতে পারে। তাই, উদ্ভিদের বয়স বেশি হলে ফটোপিরিয়ডিক আবেশে বেশি সংবেদনশীল হয়। স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ যেমন- *Glycine, Perilla, Kalanchoe* ও *Cheopodium* এবং দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Lolium temulentum*-এ এই সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা

হয়েছে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে *Anagallis arvensis*-এর সংবেদনশীলতা কমতে থাকে এবং গোড়া থেকে অগ্রভাগের পাতার দক্ষতা ক্রমাগত হ্রাস পায়। নবীন উদ্ভিদের ফটোপিরিয়ডিক আবেশের প্রতিক্রিয়ায় পুষ্পায়নের ব্যর্থতা নির্ভর করে। কাণ্ড-শীর্ষের পুষ্পীয় হরমোনের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতার অভাব না-কি-পাতায় হরমোন তৈরি না হওয়ার জন্য, সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়।

পুষ্পীয় হরমোন

বিটপের অগ্রভাগে অথবা এর সন্নিকটের পার্শ্বীয় মুকুলের পরিবর্তনের মাধ্যমে পুষ্পায়ন ঘটে। উদ্ভিদের পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণে একটি সুনির্দিষ্ট পুষ্পীয় হরমোনের অংশগ্রহণের ধারণা পাওয়া যায় জুলিয়াস স্যাকস (Julius Sachs)-এর সময় থেকে। তিনি আঠারো শত আশির দশকে মন্তব্য করেন যে, আলোর উপস্থিতিতে পাতা কিছু পদার্থ তৈরি করে যা অ্যাসিমিলেটকে পুষ্প তৈরিতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে ফিসচার (Fischer, 1903) ও লোয়ি (Loew, 1905) এই ধারণার বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা মনে করতেন যে, পুষ্পায়ন হবে কি হবে না তা কেবল চিনি নির্ধারণ করে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ এম. কে. চাইলাকিয়ান (M.K. Chailakyan) পুষ্প উৎপাদনকারী পদার্থকে ফ্লোরোজেন নাম দেন। উপযুক্ত দিবা-দৈর্ঘ্যে এই হরমোনের সংশ্লেষণ হয়। কোনো কোনো গবেষক উদ্ভিদ থেকে কতিপয় পদার্থ নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন যা উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ঘটাতে সক্ষম। তবে এদের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব হয়নি। তাই ফ্লোরোজেনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ কারণে পুষ্পায়নে বাধাদানকারী পদার্থ পুষ্পায়ন ঘটাতে পারে এই ধারণাটি পরীক্ষা করে দেখার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভন ডেনফার (Von Denffer) প্রস্তাব করেন যে, একটি উদ্ভিদে সবসময়ই পুষ্পায়ন হতে পারে, যদি না কোনো প্রভাবক দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়। তাই উপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্য পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরি না করে পুষ্পায়ন রোধককে দূর করে।

দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ

পাতা যে দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করে তা আবিষ্কারের পরেই পুষ্প-উৎপাদনকারী হরমোনের অস্তিত্বের প্রথম পরীক্ষণীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ পালং (Spinach)এর কেবল পাতাগুলোকে দীর্ঘ দিবালোকে রেখে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নট (Knott) সর্বপ্রথম দেখান যে, পাতায় তৈরি হওয়া কোনো পদার্থ কাণ্ডের শীর্ষে পুষ্পারম্ভের সূচনা করে। দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণের স্থান সম্পর্কে কতিপয় প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায় অঙ্গজ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। *Helianthus tuberosus* র কন্দ তৈরি হয় যদি কাণ্ডের শীর্ষ ঢেকে ৫ সেন্টিমিটারের অধিক দীর্ঘ পাতাসহ গাছটিকে দিবালোকে রাখা হয়। স্পষ্টতই স্বল্প দিবালোকে পাতায় তৈরি হওয়া কোনো পদার্থ ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হ্যামনার এবং বনার (Hamner and Bonner) দেখান যে, *Xanthium strumarium*-এর একটি পাতায় স্বল্প দিবালোক প্রদান করলেই এবং অবশিষ্ট পাতাগুলো দীর্ঘ দিবালোকে থাকলেও পুষ্পায়ন হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটি স্পষ্টভাবেই জানা গেছে যে, দিবাদৈর্ঘ্য পাতাই গ্রহণ করে। *Chrysanthemum morifolium* নিয়ে চাইলাকানের প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল থেকেও একই তথ্য পাওয়া যায়।

আবেশিত উদ্ভিদ থেকে পাতা কেটে নিয়ে অজগজ গ্রহীতায় (receptor) জোড়কলম করে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জিভার্ট (Zeevaart) দেখান যে, স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Perilla crispa* এবং *Xanthium strumarium*-এর এরকম পাতা (দাতা) দীর্ঘ দিবালোকে রাখা গ্রহীতার সাথে জোড়কলম করলে, এদেরও পুষ্পায়ন হয়। *Perilla*-র পাতা অনেকদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং এটি কেটে সহজেই গ্রহীতা উদ্ভিদে পুনরায় জোড়কলম করা যায়। এমনকি শেষ স্বল্প-দিবালোক চক্রের তিন মাসের অধিককালের মধ্যেও এরা পুষ্পায়ন ঘটাতে পারে। উদ্ভিদ থেকে অতি যত্নসহকারে পার্শ্বীয় মুকুল সরিয়ে নিলেও সেই উদ্ভিদে পুষ্পায়ন হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, পাতা স্বাধীনভাবেই দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করতে পারে এবং পুষ্পীয় উদ্দীপনা তৈরি করতে সক্ষম। এই ধারণার জোরালো সমর্থন পাওয়া যায় সেসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে যেখানে একটি অজগজ উদ্ভিদ থেকে পাতা কেটে নিয়ে, সেই পাতাকে উপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্যে রাখার পর অ আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যে রাখা অজগজ গ্রহীতার সাথে জোড়কলম করা হয়। *Perilla*-র এরকম পাতা দ্রুত পুষ্পায়ন ঘটিয়েছিল। কমপক্ষে, অপর দুটি প্রজাতিতে, *Hyoscyamus niger* এবং *Xanthium strumarium*-র ক্ষেত্রে এরকম ফলাফল পাওয়া গেছে। তবে এসব উদ্ভিদের কর্তিত পাতার দ্রুত বার্ধক্য প্রাপ্তির জন্য প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম। তাই কর্তিত পাতার দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ ও পুষ্পীয় উদ্দীপনা তৈরি সম্ভব এবং এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় পাতাই দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করে। তবে পাতায় এর সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বুনিং এবং মসার (Bunning and Moser) বলেন যে, *Kalanchoe*-এর পাতার নিম্ন পৃষ্ঠের তুলনায় উর্ধ্ব পৃষ্ঠ দীর্ঘ-দিবালোক দ্বারা পুষ্পায়নে বাধা প্রদানে বেশি সংবেদনশীল। স্কাব (Schwabe) ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তাব করেন যে, পাতার উপস্তরক, কমপক্ষে আংশিক হলেও ফটোপিরিয়ডিক প্রভাব গ্রহণের স্থান।

কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গও দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করতে পারে। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো *Chenopodium amaranticolor*, যার সম্পূর্ণ পত্রহীন উদ্ভিদকে স্বল্প-দিবালোক প্রদান করে পুষ্পায়ন ঘটানো যায় ; এক্ষেত্রে হয় কাণ্ড না হয় শীর্ষমুকুলের খুবই কচি পাতা দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ ও হরমোন তৈরি করতে সক্ষম। কলা কালচার এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। যেমন- ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নিচ এবং নিচ (Nitsch and Nitsch) দেখিয়েছেন যে, *Plumbago indica*-র মুকুলবিহীন পর্বমধ্যের অংশ পুষ্পীয় মুকুল তৈরি করে যদি চার সপ্তাহ ধরে স্বল্পদিবালোকে রাখা হয় ; এসময় অস্থানিক মুকুল দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ অক্ষত উদ্ভিদের জন্য ৪ থেকে ৭টি স্বল্প-দিবালোকের প্রয়োজন হয়, তাই কলা কালচারে হয় কাণ্ডকলা না হয় রিজেনারেটিং মুকুল দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে বলদেব (Baldev) দেখান যে, কালচার মাধ্যমে *Cuscuta reflexa*-র কাণ্ডের শীর্ষে পুষ্পায়ন ঘটানো যায়, এক্ষেত্রে মুকুল উপস্থিত ছিল এবং এটিকে দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণের স্থান হিসেবে মনে করা হয়। যেহেতু পরজীবী উদ্ভিদটি প্রায় পত্রহীন, তাই কাণ্ড, শল্কপত্র অথবা মুকুল দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করে। অপর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো মটরের কালটিভার গ্রিনফাস্টের (green-fast) এর মৃৎগত বীজপত্র যা বীজ কর্তৃক পানি শোষণের প্রায় পাঁচ দিন পরেই দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করতে পারে ; অবশ্য সাধারণত এটি মৃত্তিকার নিচে থাকে, তাই দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসারিত পাতা ছাড়াও কাণ্ডের কলা দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণে সক্ষম, যদিও স্বাভাবিক অক্ষত উদ্ভিদে পাতাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এটি জানা গেছে যে, রঞ্জকপদার্থ, ফাইটোক্রোম, যা দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণ করে তা মূলসহ উদ্ভিদের সব অঙ্গেই থাকে। অবশ্য মূল কর্তৃক দিবাদৈর্ঘ্য গ্রহণের কোনো উদাহরণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

পাতার সংবেদনশীলতার বিভিন্নতা

উদ্ভিদের বয়স বাড়ার সাথে সাথেই দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রায়ই বিভিন্নতা দেখা যায় ; অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর দ্রুত আবেশিত হয়। এটি অংশত হতে পারে যে, অধিকতর পত্রক্ষেত্রফলের জন্য বেশি পরিমাণে হরমোন তৈরি হয় ; তবে এটিই একমাত্র কারণ নয়। যেমন– অক্ষত উদ্ভিদ এবং একটি পাতাসহ উদ্ভিদের আবেশের জন্য একই সংখ্যক ফটোপিরিয়ডিক চক্রের প্রয়োজন হয়। যেসব পরীক্ষায় কেবল একটি পাতাকে আবেশিত করা হয়েছে তার ফলাফল দেখায় যে, সব পাতা দিবাদৈর্ঘ্য একইরকম সংবেদনশীল নয়। ল্যাম (Lam. 1965) দেখিয়েছেন যে, পাঁচটি পাতাসহ *Xanthium strumarium*–এর তৃতীয় ও চতুর্থ পাতা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল কিন্তু সবচেয়ে পরিণত প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা এবং সবচেয়ে উপরে অবস্থিত পঞ্চম পাতা, কম সংবেদনশীল এবং তখন এর দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২ সেন্টিমিটার। *Xanthium*–এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অঙ্কুরোদ্গমের পর প্রথম সপ্তাহে দিবাদৈর্ঘ্য সংবেদনশীল হয় না ; পূর্ণপ্রসারিত বীজপত্র (৯.২ বর্গসেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল) সংবেদনশীল নয়, যদিও একটি ফলিয়োজ পাতার মাত্র ৭ থেকে ৮ বর্গসেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলেই পুষ্পায়ন আবেশিত করা যায়। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, একটি পাতার আকার নয়, এর শারীরতাত্ত্বিক বয়স সংবেদনশীলতা নির্ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই পাতার পূর্ণ প্রসারণের সময় দিবাদৈর্ঘ্যে সংবেদনশীলতা সর্বোচ্চ হয় এবং এরপর এটি কমতে থাকে এবং সর্বপরিণত পাতাটির সংবেদনশীলতা সর্বনিম্ন হয়। *Chrysanthemum, Perilla, Glycine* এবং *Xanthium* এর সর্বকনিষ্ঠ পূর্ণপ্রসারিত পাতা সবচেয়ে বেশি সংবেদনসীল। পরবর্তী সময়ে *Xanthium* নিয়ে আরো গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পাতার সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক অবস্থায় পৌঁছালে, পাতার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ হয় এবং সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল হয়। স্বল্পদিবালোক প্রাপ্ত ঘাস *Rothoellia exaltata*-এর সবচেয়ে দ্রুত প্রসারণশীল পাতা– দিবাদৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। তবে *Lolium temulentum*-এ পূর্ণ প্রসারিত পাতা অনেক সময় ধরে সর্বোচ্চ সংবেদনশীল থাকে।

যদি পুষ্পায়নের উদ্দীপনার বেশির ভাগ অংশ কার্বোহাইড্রেটের প্রবাহের সাথে পরিবাহিত হয়, তাহলে সংবেদনশীলতার বিভিন্নতার আংশিক ব্যাখ্যা কার্বোহাইড্রেট পরিবহণের প্যাটার্নের মাধ্যমে করা যেতে পারে। খুব কচি পাতার সংবেদনশীলতার অভাবের কারণ হলো যে, সর্বকনিষ্ঠ পাতাগুলো কার্বোহাইড্রেট প্রেরণ করে না। পাতার বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয় যখন এর আকার পূর্ণ আকারের শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ হয়। এসময় কার্বোহাইড্রেট প্রেরণ বেশি হয়। পাতার ক্ষেত্রফল সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের শতকরা ৫০ ভাগ হলে প্রকৃতপক্ষে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে সর্বকনিষ্ঠ পাতা, প্রায়–পূর্ণ প্রসারিত পাতা নয়। তাই উদ্ভিদের সবচেয়ে উপরে অবস্থিত প্রসারিত পাতা থেকে শীর্ষদেশে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ হয় এবং এসব পাতার দিবাদৈর্ঘ্যে অধিকতর সংবেদনশীলতার কারণ এটি আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করে। সয়াবিনের পূর্ণপ্রসারিত ত্রিপত্রক পাতার মধ্যস্থ পত্রকে এবং সম্পূর্ণ উদ্ভিদে স্বল্প দিবালোক প্রদান করলে প্রায় একইরকম ফলাফল পাওয়া যায়।

পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণ

আবেশিত পাতা থেকে কাণ্ডের শীর্ষে পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণের পরীক্ষা–নিরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে এই পরিবহণ হয় এবং কার্বোহাইড্রেট পরিবহণের সাথে এই উদ্দীপনার পরিবহণও হতে পারে। ফ্লোয়েম হলো এই পরিবহণের প্রধান পথ তা প্রমাণিত হয়েছে এই কলার মধ্য দিয়ে পদার্থের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, (যেমন–

গার্ডলিং (ফ্লোয়েম কলার বলয় সম্পূর্ণ অপসারিত করে), ফ্লোয়েম কলা উত্তপ্ত বা শীতল করে কাণ্ড অথবা পত্রবৃন্তে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে পুষ্পায়নকে বিলম্বিত বা বাধাপ্রদান সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে। এ জাতীয় অধিকাংশ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (যেমন– *Chrysanthemum, Perilla, Xanthium, Kalanchoe*) নিয়ে, তবে কমপক্ষে একটি দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (*Hyoscyamus niger*) একইরকম আচরণ করেছে। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জিভার্ট (Zeevaart) দেখিয়েছেন যে, যখন কেবল কার্যকর ফ্লোয়েম সংযোগ স্থাপিত হয়েছে তখন *Perilla*-র জোড়কলম করা কলায় পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণ হয়েছে। অন্যান্য গবেষকরা দেখেছেন যে, একটি জোড়কলম বরাবর উদ্দীপনার পরিবহণ হয় না যতোক্ষণ পর্যন্ত কলায় সংযোগ স্থাপন না হয়। যদিও ফ্লোয়েম সংযোগ সম্পূর্ণরূপে সীমায়িত প্রভাবক নয়। দাতা উদ্ভিদ *Xanthium strumarium* থেকে গ্রহীতা উদ্ভিদ *Silene armeria*-তে ফ্লোয়েম সংযোগ ছাড়াই পুষ্পায়নের উদ্দীপনার স্থানান্তর হয়েছে ; এই আন্তঃগণের জোড়কলমে ফ্লোয়েম তৈরি হয়নি। তবে এই জোড়কলমে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে কিছু কলার সংযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, *Silene* গ্রহীতায় পুষ্পায়নের জন্য এসময়ের প্রয়োজন হয়। *Helianthus* এবং গোল আলুর স্ফীত কন্দ তৈরির উদ্দীপনাও কেবল জীবিত কোষের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। পত্রফলকে যা আশা করা যায়, মেসোফিল কলার মধ্য দিয়ে অথবা উপস্তক বরাবর ফ্লোরিজেন পরিবাহিত হয় এবং একটি আবেশিত পাতার গোড়ার দিকের শিরাগুলো কেটে দিলেই *Perilla*-এর পুষ্পায়ন বাধা পায় না।

তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে, পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণ প্রধানত ফ্লোয়েমের মধ্যদিয়ে ঘটে কিন্তু এটিই একমাত্র পথ নয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে চাইলাকান এবং বুটেনকো (Chailakyan and Butenko) ^{14}C লেবেলযুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, *Perilla*-তে উচ্চ পুষ্পায়ন প্রতিক্রিয়ার সাথে একটি আবেশিত পাতা থেকে মুকুলে প্রচুর পরিমাণে লেবেল সম্পর্কযুক্ত ; নিম্ন পুষ্পায়নের প্রতিক্রিয়ার সাথে একটি অ-আবেশিত পাতা থেকে মুকুলে স্থানান্তরিত লেবেল সম্পর্কযুক্ত। ^{14}C পরিবহণ এবং পুষ্পায়নের মধ্যে ভালো সম্পর্কের জন্য তাঁরা মন্তব্য করেন যে, পুষ্পায়নের উদ্দীপনা ফটোসিনথেটের সাথে পরিবাহিত হয়। জোড়কলমে C_{14} লেবেলযুক্ত সুক্রোজ প্রয়োগ করে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জিভার্ট দেখতে পান যে, পুষ্পায়নের উদ্দীপনা এবং লেবেল সুক্রোজ একই সাথে চলাচল করে। যদি দাতা ও গ্রহীতার সংযোগের সময় লেবেলযুক্ত সুক্রোজের চলাচলের প্রয়োজনীয় সময়ে তুলনায় কম হয়, তাহলে পুষ্পায়ন কখনোই হয় না। ^{14}C ব্যবহার করে পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, পুষ্পায়নের উদ্দীপনা এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিবহণ একই সাথে হয়। অপরদিকে, ইভান্স এবং ওয়ার্ডলো (Evans and Wardlaw, 1966) দেখান যে, পাতার চূড়ান্ত ক্ষেত্রফলের শতকরা ১৪ থেকে ২০ ভাগ হলেই তা পুষ্পায়নে সক্ষম ; যদিও এ পাতা খুব সামান্য কার্বোহাইড্রেট প্রেরণ করতে পারে। *Anagallis arvensis* এর একটি স্ট্রেইনের পাতা দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতি সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতায় পৌঁছায় যখন তাদের চূড়ান্ত ক্ষেত্রফলের কুড়ি ভাগের একভাগ ক্ষেত্রফল হয়, এমনকি ২ থেকে ৩ বর্গমিলিমিটার ক্ষেত্রফলের পাতাকেও আবেশিত করা যায়, এক্ষেত্রেই অবশ্যই এরা প্রধানত অন্য পাতা থেকে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে।

পুষ্পীয় হরমোন যে চিনির সাথে পরিবাহিত হয় তার আংশিক সমর্থন পাওয়া যায় সেসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে যেখানে অন্ধকারের তুলনায় উচ্চ আলোয় পরিবহণ দ্রুত হয়। স্কক এবং স্কুলি (Skok and Scully, 1954) একটি পাতাসহ কতগুলো *Xanthium* গাছে ১৪ ঘণ্টা আবেশীয় অন্ধকার প্রদানের পর বিভিন্ন সময়ে পাতাগুলো অপসারিত করেন। আলোতে রাখার মাত্র ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পর পাতা অপসারিত করলে পুষ্পায়ন হয়েছে ; অপরপক্ষে, অন্ধকারে

পাতাকে ১০ থেকে ২০ ঘণ্টা রাখার পর অপসারিত করলে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। এরকম আরো পত্র কর্তন পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, সাধারণত আলোক পর্যায়ের কয়েক ঘণ্টা পরে স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে অন্ধকার পর্যায়ে তৈরি হওয়া দ্রব্য পরের দিন পাতা থেকে বের হয়ে আসে।

কার (Carr, 1957) কর্তৃক পরিচালিত আরো বিস্তারিত পরীক্ষা এই ফলাফলকে সমর্থন করেছে। একটি আবেশিত অন্ধকার পর্যায়ের পর *Xanthium* গাছকে বিভিন্ন মাত্রার আলো প্রদান করা হয় এবং আলোর মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুষ্পায়নের প্রতিক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়। আবেশিত পাতায় সুক্রোজ প্রদানের মাধ্যমে আলোর প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছিল। তবে, পূর্বে উল্লিখিত স্কক এবং স্কুলি (১৯৫৪) এর পরীক্ষা এবং *Rotboellia*-র ক্ষেত্রে অন্ধকারে স্বল্প দিবালোক উদ্দীপনা দ্রুত পাতা থেকে বেরিয়ে আসে। ফলাফল থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, পুষ্পীয় উদ্দীপনার চলাচলে আলো অত্যাবশ্যক নয়। *Xanthium* এবং *Pharbitis* নিয়ে অন্যান্য গবেষণার ফলাফলও নির্দেশ করে যে, আলো এবং অন্ধকার উভয় পর্যায়েই পরিবহণ হয়। উপরন্তু, যখন *Pharbitis*-এর পাতা অন্ধকারে রাখা হয়েছিল, তখন পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণ আলোতে রাখা পাতার মতো একই গতিতে হয়েছে, যদিও অন্ধকারে রাখা পাতা থেকে কোনো লেবেল অ্যাসিমিলেট চলাচল শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন উদ্ভিদের পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণের হার নির্ণয় করা হয়েছে। *Pharbitis*-এ এই হার ঘণ্টায় ২ থেকে ৩ মিলিমিটার এবং *Perilla* তে ০,৮ মিলিমিটার। দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Lolium temulentum*-এ এই পরিবহণের হার ঘণ্টায় ১ থেকে ২,৪ মিলিমিটার, যা এই গাছের সুক্রোজ পরিবহণ হারের (ঘণ্টায় ৭৭ থেকে ১০৫ সেন্টিমিটার) তুলনায় অনেক কম।

তবে, কমপক্ষে একটি উদ্ভিদে পুষ্পায়নের উদ্দীপনার উচ্চ পরিবহণের হার পাওয়া গেছে। স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Pharbitis nil*-এ এই পরিবহণের হার ঘণ্টায় ২৪ থেকে ৩৭ সেন্টিমিটার এবং লেবেল অ্যাসিমিলেটের পরিবহণের হার ঘণ্টায় ৩৩ থেকে ৩৭ সেন্টিমিটার। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে টাকেবা এবং টাকিমোটো (Takeba and Takimoto) *Pharbitis*-এর আবেশিত পাতা এবং গ্রহীতা মুকুলের মধ্যে কাণ্ডের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে দেখতে পান যে, ১৪ ঘণ্টা অন্ধকার পর্যায়ের পর পাতা অপসারণ করা হলে দাতা পাতার অক্ষে অবস্থিত মুকুলগুলো অক্ষত অবস্থায় ছিল, কিন্তু যখন ১৬ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখার পর পাতা অপসারণ করা হয়, তখন কাণ্ডের ১০২ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের যে কোনো দৈর্ঘ্যেই সব মুকুল প্রস্ফুটিত হয়। অক্ষত গাছগুলোর ১০ ঘণ্টা অন্ধকারে পুষ্পায়ন হয়। এ থেকে মন্তব্য করা হয়েছে যে, অন্ধকারে তৈরি হওয়া দ্রব্যের পাতা থেকে অক্ষীয় মুকুলে পৌঁছতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লেগেছিল ; কিন্তু হাবো ২ ঘণ্টার মধ্যে এই উদ্দীপনা ১০২ সেন্টিমিটার দূরবর্তী একটি মুকুলে পৌঁছে, কাণ্ড দিয়ে এই পরিবহণের হার কমপক্ষে ঘণ্টায় ৫০ সেন্টিমিটার। *Pharbitis* নিয়ে পত্রকর্তন পরীক্ষার ফলাফল থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে জিভার্ট মন্তব্য করেন যে, পাতা থেকে কাণ্ডে পৌঁছতে এই উদ্দীপনার চার ঘণ্টা লাগে। তবে সাধারণভাবে মন্তব্য করার পূর্বে পাতা ও কাণ্ডে পৃথকভাবে এ হার নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে।

পুষ্পায়নের প্রতিক্রিয়াকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত না করা পর্যন্ত এর পরিবহণের কৌশল সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ইভান্স (Evans) উল্লেখ করেছেন যে, দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Lolium temulentum* এর অ্যাসিমিলেট পরিবহণ হারের তুলনায় পুষ্পায়নের উদ্দীপনার হার অনেক কম, কিন্তু স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Pharbitis nil* এ অ্যাসিমিলেট এবং পুষ্পায়নের উদ্দীপনার পরিবহণের হার একইরকম। উপরন্তু, *Lolium*-এ

কার্বোহাইড্রেট প্রেরণের পক্ষে খুবই ক্ষুদ্র পাতাও পুষ্পায়নের উদ্দীপনা প্রেরণ করে, অপরদিকে *Pharbitis*-এ উদ্দীপনা এবং অ্যাসিমিলেট উভয়ের প্রেরণেই পাতার আকারের একইরকম প্রভাব আছে। ইভান্স মন্তব্য করেন যে, পরিবহণের ক্ষেত্রে এই সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্ভবত নির্দেশ করে যে, এই দুপ্রকার উদ্ভিদের পাতা থেকে যে পুষ্পায়নের উদ্দীপনা প্রেরিত হয় তা এক নয় এবং পরিবহণের কৌশলও ভিন্ন পুষ্পায়নের উদ্দীপন এবং কার্বোহাইড্রেটের চলাচল প্রায় ক্ষেত্রে একই সাথে হয় ; এটি নির্দেশ করে যে, ফ্লোয়েমে চিনির মাস প্রবাহের সাথে ফ্লোরিজেন পরিবাহিত হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিনির তুলনায় পুষ্পায়নের উদ্দীপনা খুব মন্থর গতিতে চলাচল করে এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, কার্বোহাইড্রেটের পরিবহণ ছাড়াই পুষ্পায়নের উদ্দীপনা পরিবাহিত হতে পারে।

ফটোপিরিয়ডিক আবেশ

স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদকে দীর্ঘ-দিবালোকে এবং দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদকে স্বল্প-দিবালোকে জন্মালে উভয় শ্রেণির উদ্ভিদেরই পুষ্পায়ন হয় না, কেবল অঙ্গজ বৃদ্ধি চলে। যেমন- ১৬ ঘণ্টা দিবালোক বা ৮ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখলে ওকরা গাছ অনির্দিষ্টকালের জন্য অঙ্গজ অবস্থায় থাকে, ফুল ধারণ করে না। এক দিনের জন্যও ওকরা গাছকে ১৫ ঘণ্টা দিবালোক বা ৯ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখার পর পুনরায় ১৬ ঘণ্টা দিবালোক বা ৮ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখা হয়, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ গাছে ফুল ফুটবে। এই একটি স্বল্প দিবালোক অবস্থাকে আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্য বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদে আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যের সংখ্যা বিভিন্ন (সারণি ৬.২)।

সারণি ৬.২ : পুষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যের সর্বনিম্ন সংখ্যা

ক. স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Chenopodium polyspermum, C. rubrum, Lemna paucicostata, L. perpusilla strain 6746, *Oryza sativa* Cv. Zuiho, *Pharbitis nil* cv violet, *Wolffia microscopia, Xanthium strumarium*, প্রত্যেকটি উদ্ভিদের কমপক্ষে একটি স্বল্প দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। *Kalanchoe blossfeldiana*-তে ২টি, *Glycine max* cv. Biloxi-তে ২ থেকে ৩টি, *Cannabis sativa*-তে ৪টি, *Perilla crispa*-তে ৭ থেকে ৯টি, *Fragaria X ananassa* cv Blackmore-এ ৬টি এবং *Chrysanthemum morifolium*-এ ১২টি স্বল্প দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন।

খ. দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Anagallis arvensis, Anthriscus cerefolium, Brassica campestris, Lemna gibba, Lolium temulentum, Sinapis alba, Spinacia oleracea তে কমপক্ষে ১টি দীর্ঘ দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। *Hyoscyamus niger*-এ ২ থেকে ৩টি, *Arabidopsis thaliana*-তে ৪টি এবং *Silene armeria*-তে ৬টি দীর্ঘ দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন।

গ. দীর্ঘ-স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ	**সর্বনিম্ন আবেশীয় ট্রিটমেন্ট**
Cestrum nocturnum	৫ দীর্ঘ দিবালোক : ২ স্বল্প দিবালোক
Bryophyllum daigremontianum	৬০ দীর্ঘ দিবালোক : ১৫ স্বল্প দিবালোক
Bryophyllum crenatum	২০ দীর্ঘ দিবালোক : ৯ থেকে ১২ স্বল্প দিবালোক
ঘ. স্বল্প-দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ	
Echeveria harmsii	২০ স্বল্প দিবালোক : ১০ দীর্ঘ দিবালোক

Pharbitis nil সহ উদ্ভিদের আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যের সংখ্যা এক এবং এক্ষেত্রে আবেশের পর অগ্রভাগে কোনো অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন দেখা যাবে না। যেসব প্রজাতিতে আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যের সংখ্যা বেশি (যেমন- সুগারবিটে ২০), সেক্ষেত্রে দৃশ্যত পুষ্পায়নের লক্ষ্যে অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

ফটোপিরিয়ডিক আবেশ গ্রহণের স্থান

প্রাথমিক অবস্থায় পাতা ফটোপিরিয়ডিক আবেশ গ্রহণ করে। *Pharbitis nil* নামক উদ্ভিদের প্রসারিত বীজপত্র এ আবেশ গ্রহণ করে। পাতার বৃদ্ধির সাথে সাথে আবেশ গ্রহণের ক্ষমতা পাতার বৃদ্ধি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থকে এবং পাতার বার্ধক্য প্রাপ্তির সাথে সাথে এ ক্ষমতা কমতে থাকে।

ফটোপিরিয়ডিক আবেশের স্থানান্তর

পাতা ফটোপিরিয়ডিক আবেশ গ্রহণ করে কিন্তু শীর্ষস্থ কিংবা পার্শ্বীয় ভাজক কলায় পুষ্প উৎপন্ন হয়। তাই এ আবেশ পাতা থেকে পুষ্প-উৎপাদনকারী অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, এ স্থানান্তর ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে হয়, তবে সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থের স্থানান্তরের সাথে এর সম্পর্ক নেই। এ স্থানান্তরের হার স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২.৪ সেন্টিমিটার এবং দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার ; তবে বিভিন্ন উদ্ভিদে এর হার বিভিন্ন।

অ-আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পারম্ভের বাধা প্রদান

উদ্ভিদ থেকে একটি পুষ্প উৎপাদনকারী হরমোনের নিষ্কাশন এবং শনাক্তকরণে বারংবার ব্যর্থতার কারণে আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিতকারী পদার্থের পরিবর্তে অ-আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পায়ন রোধক পদার্থ তৈরির মাধ্যমে দিবাদৈর্ঘ্য পুষ্পায়নকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়। রোধক প্রকল্পের মাধ্যমে পুষ্প উৎপাদনকারী হরমোনের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন- আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যে পাতায় কেবল রোধকমুক্ত কার্বোহাইড্রেটের সরবরাহের প্রয়োজন হতে পারে। তবে, বর্তমানে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিতকারী পদার্থের পক্ষেই অধিক যুক্তি আছে এবং খুব স্বল্প সংখ্যক গবেষকই সরল রোধক তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তবে, অ-আবেশিত অবস্থায় পুষ্পায়নে পাতায় যে ধনাত্মক রোধকের প্রভাব আছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে—

ক. অ-আবেশিত অবস্থায় পাতা দ্রব তথা ফ্লোরিজেনের পরিবহণ প্যাটার্নের পরিবর্তন ঘটায়। এটি নির্দেশ করে যে, পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণে কেবল ত্বরান্বিতকারী প্রক্রিয়া সরাসরি অংশগ্রহণ করে।

খ. অ-আবেশিত অবস্থা পাতায় পুষ্প-উৎপাদনকারী হরমোন সংশ্লেষণে বিঘ্ন ঘটায়। এক্ষেত্রে ফটোপিরিয়ডিক রোধক পাতায় ক্রিয়াশীল এবং পাতা থেকে কি পরিমাণ হরমোন প্রেরিত হয় তার উপর পুষ্পায়ন নির্ভরশীল।

গ. অ-আবেশিত অবস্থায় একটি স্থানান্তরযোগ্য রোধক তৈরি হয় যা পাতা থেকে প্রেরিত হয় এবং কাণ্ডের অগ্রভাগে কার্যকর হয়। গ্রহীতা অংশে পৌঁছানো রোধক ও হরমোনের আপেক্ষিক মাত্রার উপর পুষ্পায়ন নির্ভরশীল।

একটি পরিণত পাতার এই রোধকের প্রভাব অধিক। অপরিণত পাতা, যা কার্বোহাইড্রেট প্রেরণের পরিবর্তে গ্রহণ করে, পুষ্পায়নের রোধক পদার্থ কম তৈরি করে এবং কখনো কখনো

এরা পুষ্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। একটি পাতা ফটোপিরিয়ডিক আবেশে আর সংবেদনশীল না হলেও এর অক্ষে অবস্থিত মুকুলের পুষ্পায়নে বাধা দিতে পারে। যেসব প্রক্রিয়া, যেমন– আলোর কম প্রখরতা, অন্ধকার অথবা পত্রবৃন্তের কিছু অংশ মেরে ফেলা, একটি পাতা থেকে সুক্রোজের প্রবাহ কমিয়ে দেয় অথবা বাধা দেয়, তা আবার পুষ্পায়নের রোধক প্রভাবকে হ্রাস করে। ফ্লোরোজেন প্রবাহে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে পুষ্পায়ন রোধকের সরাসরি প্রমাণ হলো যে, *Perilla*–এর একটি আবেশিত পাতার ঠিক উপরে অবস্থিত অন্ধকারে রাখা একটি পাতাকে চিনি প্রদান করলে পুষ্পায়ন রোধ হয়। অবশ্য *Rudbeckia*–তে চিনি প্রদান করেও এরকম রোধক প্রভাব পাওয়া যায়নি।

সুতরাং দেখা গেছে যে, অ–আবেশিত পাতা গ্রহীতা মুকুলে ফ্লোরিজেনবিহীন কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে বলে পুষ্পায়ন হয় না। কিন্তু ফ্লোরোজেন এবং কার্বোহাইড্রেট চলাচলের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সালোকসংশ্লেষণরত পাতা এবং অন্ধকারে রাখা পাতা থেকে একই গতিতে ফ্লোরোজেন বের হয়ে আসে। তাই, যদিও অ–আবেশিত দিবাদৈর্ঘ্যের জন্য পাতার রোধক ক্রিয়া অংশত চললেও, কার্বোহাইড্রেট প্রবাহকে প্রভাবিত করে যা আবার ফ্লোরোজেনের চলাচলকে প্রভাবিত করে, এটি প্রতীয়মান হয় যে, বাধাসৃষ্টিকারী ফটোপিরিয়ডিক প্রক্রিয়া পাতায় সংঘটিত হয়।

অন্ধকার পর্যায়ের ভূমিকা এবং আলোর সাথে এর প্রতিক্রিয়া

প্রাকৃতিক আবাসে উদ্ভিদ বিভিন্ন দিবাদৈর্ঘ্যে জন্মে ; যেমন– নিরক্ষরেখা বরাবর দিবাদৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ঘণ্টা এবং সুমেরুবৃত্তে এই পরিসর ০ থেকে ২৪ ঘণ্টা। যখন উদ্ভিদকে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রকার অপরিবর্তনীয় প্রাত্যহিক দিবাদৈর্ঘ্য প্রদান করা হয় তখন স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের অধিকতর মন্থর গতিতে পুষ্পায়ন হয় অথবা অজগজ অবস্থায় থাকতে পারে যদি দিবাদৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়। অপরদিকে, দিবাদৈর্ঘ্য হ্রাস করলে দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়ন বিলম্বিত হয় অথবা একেবারেই পুষ্পায়ন হয় না। দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত এবং স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত উভয় প্রকার বাধ্যতামূলক (obligate) উদ্ভিদে অজগজ বৃদ্ধি ও জনন বৃদ্ধির অবস্থান্তর প্রাপ্তির (transition) মধ্যে সাধারণত একটি সুস্পষ্ট সংকটকালীন দিবাদৈর্ঘ্য (critical photoperiod) থাকে। যদিও এর মান উদ্ভিদের বয়স এবং পরিবেশীয় প্রভাবক দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Pharbitis nil*–এ চারাগাছের তুলনায় পরিণত গাছে অধিকতর দীর্ঘ দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পায়ন হয় এবং দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Hyoscyamus niger*–এ রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে সংকটকালীন দিবাদৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। কোনো কোনো উদ্ভিদে পুষ্পায়ন হওয়া এবং না হওয়ার মধ্যে পরিবর্তন আকস্মিক। *Xanthium strumarium* ১৫.৭৫ ঘণ্টা দিবাদৈর্ঘ্যে জন্মালে সকল গাছ অজগজ অবস্থায় থাকে এবং দিবাদৈর্ঘ্য ১৫ ঘণ্টা হলে সবগুলো গাছেই পুষ্পায়ন হয়। কতিপয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্বল্প–দিবাদৈর্ঘ্যপ্রাপ্ত উদ্ভিদে মাত্র ১৫ মিনিটের দিবাদৈর্ঘ্যের পার্থক্যের উপর ফুল ফোটা না ফোটা নির্ভর করে। তবে এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি ধীর গতিতেও চলতে পারে। যেমন– দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Sinapis alba* ১২ ঘণ্টা দিবাদৈর্ঘ্যে সব গাছ অজগজ অবস্থায় থাকে, কিন্তু সব অথবা অধিকাংশ গাছের পুষ্পায়নের জন্য ১৮ ঘণ্টা দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। সুবিধাবাদী (facultative) দীর্ঘ এবং স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের প্রতিকূল দিবাদৈর্ঘ্যেরও পুষ্পায়ন হয় এবং এদের কোনো সংকটকালীন দিবাদৈর্ঘ্য নেই। তাই বাধ্যতামূলক ফটোপিরিয়ডিক উদ্ভিদের তুলনায় সুবিধাবাদী উদ্ভিদ দিবাদৈর্ঘ্যের সামান্য পার্থক্যে কম সংবেদনশীল, তবে দিবাদৈর্ঘ্যের পার্থক্য বেশি হলে এদের পুষ্পায়নের হারের যথেষ্ট পার্থক্য হয়।

অন্ধকার পর্যায়ের তাপমাত্রাও *Xanthium strumarium*–এর পুষ্পায়নকে প্রভাবিত করে। যেমন- ২১ থেকে ৩২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি দীর্ঘ রাত্রি পুষ্পায়ন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট কিন্তু ৪০° সেলসিয়াসে সাতটি দীর্ঘ রাত্রির প্রয়োজন হয়। দিনের তাপমাত্রার তুলনায় রাতের তাপমাত্রা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ৬.৩ : কয়েকটি স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত এবং দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য ২৪ ঘণ্টা চক্রে সংকটকালীন দিবাদৈর্ঘ্য (ঘণ্টা)

ক. স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Chrysanthemum morifolium cv white wonder ১৬, *Coleus frederici* ১৩ থেকে ১৪, *Euphorbia pulcherrima* ১২.৫, *Fragaria vesca semperflorens* ১০.৫ থেকে ১১.৫, *Glycine max cv Biloxi* ১৩.৫ থেকে ১৪, *Kalanchoe blossfeldiana* ১২ *Nicotiana tabacum* cv Maryland Mammoth. ১৪, *Perilla crispa* ১৪, *Pharbitis nil* cv Violet পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ ১৫ থেকে ১৬, চারাগাছ ১৪ থেকে ১৫ এবং শীর্ষ মুকুল ১৩, *Xanthium strumarium*. ১৫.৫।

খ. দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ

Anagallis arvensis ১২ থেকে ১২.৫ *Anethum graveolens* ১১, *Dactylis glomerata* ১২, *Lolium italicum* ১১, *Lolium temulentum* cv Ceres ১ চক্রের জন্য ১৪ থেকে ১৬ এবং বহুচক্রের জন্য ৯, *Hyoscyamus niger* ২৮.৫° সেলসিয়াসে ১১.৫ এবং ১৫.৫° সেলসিয়াসে ৮.৫, *Rudbeckia bicolor* ১০, *Sedum spectabile* ১৩, *Silene armeria* স্ট্রেইন N ১২ থেকে ১৩, *Sinapis alba* 14.*Spinacia oleracea* ১৩, *Trifolium pratense* ১২।

* পরিবেশ, বিশেষ করে তাপমাত্রার জন্য সংকটকালীন দিবাদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়।

অন্ধকার পর্যায়ের প্রতিবন্ধকতা

দীর্ঘ রাত্রিকালীন সময়ে একটি আলোর ঝলকানিতে পুষ্পায়নে অন্ধকার পর্যায়ের প্রভাব লোপ পায়। এই তথ্যের আবিষ্কার ছিল ফটোপিরিয়ডিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আবিষ্কার পুষ্পায়নে অন্ধকার পর্যায়ের গুরুত্বই শুধু যে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাই নয়, আলোগ্রহণকারী কৌশল উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীদেরকে উৎসাহিত করেছে। এর মাধ্যমে অর্থকরী উদ্ভিদের, *Chrysanthemum* এবং *Poinsettia*, পুষ্পায়নের সময় নিয়ন্ত্রণ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুষ্প উৎপাদনের সম্ভাবনাকেও উন্মোচিত করেছে।

একটি আবেশীয় রাত্রিকালীন সময়ের মাঝামাঝিতে নিম্ন প্রখরতার আলোর একটি ঝলকানি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হলে অধিকাংশ স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়ন হয় না। মাত্র কয়েক মিনিটের আলোর উপস্থিতিতে পুষ্পায়ন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এর উদাহরণ হলো *Perilla*, *Glycine max cv Biloxi*, *Kalanchoe* এবং *Xanthium*। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্বল্প দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Chrysanthemum* হলো একটি ব্যতিক্রম। এর পুষ্পায়ন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে কয়েক ঘণ্টার জন্য টাংস্টেন–ফিলামেন্ট বাল্বের আলোর প্রয়োজন হয় কিন্তু উচ্চ প্রখরতার ফ্লোরোসেন্ট আলোর প্রয়োজন হয় মাত্র কয়েক মিনিট। অনেক দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য রাত্রিকালীন সময়কে বিচ্ছিন্নকরণে সংবেদনশীল এবং দীর্ঘ রাত্রিকালীন সময়কে ৩০ মিনিট অথবা এর চেয়েও কম সময় স্থায়ী আলো দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলে

পুষ্পায়ন হয়। উদাহরণ হলো *Hordeum vulgare* এবং *Hyoscyamus niger* (১২ থেকে ১২.৫ ঘণ্টা অন্ধকার পর্যায়), *Anagallis arvensis* (প্যারিস স্টেইনে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে ০.৭ জুল আলো দিয়ে ০.৫ ঘণ্টার জন্য অন্ধকার পর্যায়কে বিচ্ছিন্ন করলে এবং লোহিত পুষ্পজাতে ২৭ লাক্স আলো দিয়ে কয়েক দিন বিচ্ছিন্ন করলে) এবং *Lolium temulentum* Ba 3081 (চার দিন ০.৫ ঘণ্টা করে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে ০.৪৫ জুল আলো দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলে)।

যেসময়ে আলো প্রদান করা হয় তার উপর ভিত্তি করে রাত্রিকালীন সময়কে বিচ্ছিন্ন করার প্রভাবের পার্থক্য হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা রাত্রিকালীন সময়ের মাঝামাঝিতে বিচ্ছিন্ন করলে সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রভাব পাওয়া যায়। তাই অনুমান করা হয় যে, রাত্রিকালীন সময়কে আলো দুটি অন্ধকার পর্যায়ে ভাগ করে, যার প্রত্যেকটি সংকটকালীন অন্ধকার পর্যায়ের তুলনায় কম।

অন্ধকারের গাঢ়ত্বের মাত্রা

একটি নির্দিষ্ট রাত্রিকালীন দৈর্ঘ্যের প্রতিক্রিয়ায় ঋতুগতভাবে ফটোপিরিয়ডিজমে সংবেদশীল উদ্ভিদের পুষ্পায়ন হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং আলো থেকে অন্ধকারে অবস্থান্তর প্রাপ্তি হঠাৎ করে ঘটে না, কিন্তু গোধূলিবেলায় এবং প্রত্যুষে ধীরে ধীরে আলোর প্রখরতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটে।

অন্ধকারের কোন অবস্থায় উদ্ভিদে অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় অথবা প্রত্যুষে আলোর কোন প্রখরতার উদ্ভিদে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, সকালে এবং বিকেলে মেঘের আস্তরণ কার্যকর দিবাদৈর্ঘ্যকে প্রভাবিত করে কি-না এসব প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম। জাপানে পরিচালিত একটি গবেষণায় *Pharbitis nil*-কে প্রাকৃতিক আলোতে রাখার পর সন্ধ্যার দিকে আলোর প্রখরতা যখন ২০০, ১০০, ৫০, ১০ এবং ১ লাক্সে হয় তখন এদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়। সকল গাছেই একই সময়ে পুষ্পায়ন হয় এবং এটি নির্দেশ করে যে, *Pharbitis*-এ অন্ধকারে পুষ্প উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন প্রাকৃতিক আলোর প্রখরতা প্রায় ২০০ লাক্সে নেমে আসে। তবে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত হয় যখন গাছগুলোকে ৫০০ লাক্স আলো থেকে অন্ধকারে স্থানান্তরিত করা হয় ; সুতরাং আলোর এই মাত্রা *Pharbitis*-এর অন্ধকারের তুল্য নয়। প্রত্যুষে আলোতে গাছগুলো অধিকতর সংবেদনশীল ছিল এবং মাত্র ১ লাক্স মাত্রার আলোতে স্থানান্তরের জন্য অন্ধকার পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সুতরাং *Pharbitis*-এ জীবজ (biological) রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের পর পরই এবং শেষ হয় উষাকালের (civil twilight) শুরুতে। *Perilla* এবং *Glycine* একই রকম আচরণ করে, তবে *Xanthium* প্রত্যুষের তুলনায় রাতের আলোতে বেশি সংবেদনশীল। *Xanthium*-এ সন্ধ্যায় যতোক্ষণ পর্যন্ত আলোর প্রখরতা কমে ১১ এবং ১ লাক্সের মধ্যে না হয়েছিল, ততোক্ষণ পর্যন্ত রাত্রিকালীন প্রক্রিয়া শুরু হয় নাই এবং সকালে এটি শেষ হয়েছিল যখন আলোর মাত্রা ১১ থেকে ৫৫ লাক্স হয়। *Oryza sativa* অবশ্য এ দুই সময়ের আলোতে সংবেদনশীল নয় এবং আবেশীয় রাত প্রারম্ভ এবং শেষ হয় প্রায় সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময়ে। কোনো দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ নিয়ে এখন পর্যন্ত এরকম পরীক্ষা করা হয়নি।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, গোধূলিবেলায় এবং প্রত্যুষ মেঘের উপস্থিতি অন্ধকার বিক্রিয়াকে যথাক্রমে আগে শুরু করে অথবা দেরিতে শেষ করে ফটোপিরিয়ডিক প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। এরফলে এক বছর থেকে অন্য বছরে পুষ্পায়নের সময়ের সামান্য পরিবর্তন

হতে পারে। যেমন– দেখা যায় *Chrysanthemum*–এর ক্ষেত্রে ; শরৎকালে মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এর পুষ্পায়ন আগে হয়। তবে মেঘের প্রভাব সরল নয়। নিম্নমানের থ্রেসহোল্ডে (threshold), যেমন– প্রায় ১০ লাক্স, পৌঁছতে মেঘের কদাচিৎ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু একটি মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় উচ্চ থ্রেসহোল্ড মান, যেমন– ২০০ লাক্স, ৩০ মিনিট আগে পৌঁছতে পারে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির আলোর প্রতি সংবেদনশীলতার উপর মেঘের প্রভাব নির্ভর করবে। *Pharbitis nil*–এ, এক্ষেত্রে অন্ধকার প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০ লাক্সে, মেঘাচ্ছন্ন দিনের তুলনায় মেঘমুক্ত দিনে কার্যকর দিবাদৈর্ঘ্য ২০ থেকে ৩০ মিনিট বেশি।

প্রাত্যহিক পাতার চলন অপর একটি জটিল প্রভাবক। পাতার চলনের জন্য অনেক উদ্ভিদে কার্যকর অন্ধকার পর্যায়ে অবস্থান্তর প্রাপ্তি খুব সুস্পষ্ট। শায়িত অবস্থা থেকে খাড়া অবস্থা অথবা বিপরীত অবস্থার দিবা–রাত্রিগত (diurnal) পরিবর্তনের ফলে প্রত্যূষে এবং গোধূলীবেলায় পাতায় পতিত ফটোপিরিয়ডিজমের পরিসরের আলোর (১ থেকে ১০ লাক্স) বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়। পাতার এরূপ চলনের জন্য *Glycine*, *Arachis* এবং *Trifolium* থেকে এর পাতার উপর পৃষ্ঠে পতিত আলো শতকরা ৮০ থেকে ৯৫ ভাগ কমে যায়।

আরেকটি প্রশ্ন প্রায়ই করা হয় যে, চন্দ্রালোক কিংবা রাস্তার আলো পুষ্পায়নকে প্রভাবিত করে কি–না এর উত্তর বেশ জটিল, কেননা অন্ধকার পর্যায়ে আলোয় সংবেদনশীলতা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম। একটি সহজ সমস্যা হলো যে, আলোর এমন সর্বনিম্ন মাত্রা নিরূপণ করা, যা সারা রাত্রিকালীন সময়ে প্রদান করলে স্বল্প থেকে দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নে বাধা দেয় অথবা দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। কতিপয় প্রজাতিতে এরকম থ্রেসহোল্ড আলোর মান নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন– আশা করা যায়, *Xanthium* এ বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল এবং টাংসটেন–ফিলামেন্ট বাল্বের ০.১ থেকে ০.২ লাক্স আলোতেই এর পুষ্পায়ন সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুষ্পায়ন বন্ধ করতে পারে এমন লাল আলোর (৬৪১ এবং ৬৬৯ ন্যানোমিটারের মধ্যে পরিমাপ করা) মাত্রা ছিল 8×10^{-6} জুল প্রতি বর্গমিটারে প্রতি সেকেন্ডে। যেহেতু চন্দ্রালোকের লাল আলোর পরিমাণ–এর চেয়ে কম, তাই পূর্ণিমায় সম্ভবত *Xanthium* এর খুব সামান্য প্রতিক্রিয়া হয়। রাত্রিকালীন পাতার চলন এবং পারস্পরিক ছায়া প্রদানের জন্য সামান্য পরিমাণে চন্দ্রালোক পাতায় পৌঁছায়। তাই এটি প্রায় নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায় যে, অতিরিক্ত সংবেদনশীল উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও পূর্ণিমার আলো সাধারণত পুষ্পায়নকে প্রভাবিত করে না। যদিও *Glycine*–এ দেখা গেছে যে, পূর্ণিমার জন্য পুষ্পায়ন বিলম্বিত হয়। কতিপয় উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা *Xanthium* এর মতো, কিন্তু অনেক দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত এবং স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে টাংসটেন–ফিলামেন্ট বাল্বের ১ থেকে ৫০ লাক্স আলো যখন বেশি সময় ধরে অথবা সারারাত্রি প্রদান করা হয়, তখন অন্ধকার পর্যায়ের প্রভাবকে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং এরকম মাত্রার রাস্তার আলো যা প্রায় সারারাত ধরেই থাকে, কতিপয় উদ্ভিদের পুষ্পায়নকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। এটি বিশেষ করে সত্য যে, টাংসটেন–ফিলামেন্ট এবং সোডিয়াম–ভেপার বাল্বে অধিক পরিমাণে ফটোপিরিয়ডিজম ঘটানোর সক্রিয় আলো আছে। কিন্তু মারকারি–ভেপার বাল্বে কম পরিমাণে লাল আলো থাকায় ফটোপিরিয়ডিক প্রক্রিয়াকে কম প্রভাবিত করে।

তাপমাত্রার প্রভাব

দীর্ঘ রাত্রিকালীন সময়ে প্রতিকূল তাপমাত্রা থাকলে স্বল্প–দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নের আবেশ বাতিল হয়ে যায়। হ্যামনার এবং বনার (Hamner and Bonner, 1969) এর প্রাথমিক

পর্যবেক্ষণ নির্দেশ করে যে, রাতের তাপমাত্রা কম হলে *Xanthium strumarium*-এর পুষ্পায়ন অনেকাংশে কমে যায় এবং পরবর্তীতে এই প্রভাব অন্যান্য স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদেও প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণভাবে এটি দেখা গেছে যে, প্রতিকূল তাপমাত্রা, উচ্চ অথবা নিম্ন যাই হোক না কেন, দীর্ঘ রাত্রিকালীন সময়ের আবেশীয় প্রভাবকে হ্রাস করে। অপরদিকে, ৪ থেকে ৪০° সেলসিয়াস পরিসরের দিনের তাপমাত্রার *Xanthium*-এর পুষ্পায়নে খুব সামান্য প্রভাব আছে, যদিও পুষ্পের বৃদ্ধির হার প্রভাবিত হয়।

রাতের তাপমাত্রা কম থাকলে দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়ন প্রায়ই ত্বরান্বিত হয় এবং কতিপয় প্রজাতির (যেমন- *Spinacia, Hyoscyamus, Blitum*) স্বল্প দিবালোকে পুষ্পায়ন হয়। অপরদিকে, রাতের তাপমাত্রা বেশি হলে, এমনকি দীর্ঘ দিবালোক হলেও কতিপয় দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ অজগজ থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যাবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে, রোধক পুষ্পায়নের অন্ধকার বিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কম তাপমাত্রায় এদের প্রভাব হ্রাস পায় ও বেশি তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়, এরকম উদ্ভিদ কদাচিৎ দেখা যায় এবং কতকগুলো প্রজাতি আছে যা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিসরে সম্পূর্ণরূপে ফটোপিরিয়ডিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। এই পরিসরের বাইরে কতিপয় স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়ন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে পারে অথবা পুষ্পায়নের খুব বিলম্ব হতে পারে; যেমন- দেখা যায় কয়েকটি *Chrysanthemum* কালটিভারে যদি রাতের তাপমাত্রা ১৬° সেলসিয়াসের খুব নিচে অথবা উপরে থাকে। স্ট্রবেরির সাধারণ কালটিভারগুলো উচ্চ তাপমাত্রায় বাধ্যতামূলক স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ কিন্তু তাপমাত্রা ১৬° সেলসিয়াসের কম হলে যে কোনো দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পায়ন হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় কতিপয় দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের যে কোনো দিবাদৈর্ঘ্যে পুষ্পায়ন হয়।

আলোর প্রয়োজনীয়তা

যদিও স্বল্প দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় অন্ধকারের প্রয়োজন, তবে সাধারণত আবেশিত অন্ধকারের পূর্বে যদি কিছু সময় আলো না পায়, তাহলে অন্ধকার পর্যায় কার্যকর হয় না। একটি আবেশিত অন্ধকার পর্যায়ের পূর্বে যে আলোর প্রয়োজন হয় তা প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন হ্যামনার ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। কয়েকবার ৩ মিনিট আলো/৩ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখার পর দেখা গেছে যে, একবার মাত্র ১২ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখার পরও *Xanthium* গাছ ফুল ফুটাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, যদি না এর আগে অপেক্ষাকৃত প্রখর আলো কয়েক ঘণ্টা প্রদান করা না হয়। এই প্রদত্ত আলোর সময়সীমা এবং প্রখরতা উভয়ের বৃদ্ধির জন্য পুষ্প উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যে সমস্ত স্বল্প দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের একাধিক বার আবেশের প্রয়োজন হয়, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত আলোক পর্যায়ের পর আবেশীয় অন্ধকার পর্যায়ের দরকার হয় এবং অবিরাম অন্ধকারে পুষ্পায়ন হয় না অথবা হলেও খুব সামান্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, অবিরাম অন্ধকারে *Perilla* এর পুষ্পায়ন হয় যদি এই গাছ একটি নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয় কিন্তু এ অবস্থায় এদের কমপক্ষে ১৩০ ঘণ্টা অন্ধকারের প্রয়োজন হয় ; স্বল্প দিবালোক চক্রে মাত্র তিনটি ১২ ঘণ্টার রাত্রি হলে এর পুষ্পায়ন হয়।

যদি কম প্রখর আলো প্রদান করা হয় অথবা দিবাদৈর্ঘ্য যদি খুব কম হয়, তাহলে কতিপয় স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ অজগজ অবস্থায় থাকে। *Glycine max* cv Biloxi-তে ৫ ঘণ্টা দিনে ১০০০ লাক্স পুষ্পায়নের থ্রেসহোল্ড মানের নিচে এবং ১০ ঘণ্টা দিনের জন্য ৫০০ লাক্সের

বেশি প্রয়োজন হয়। সুক্রোজের দ্রবণে পাতা ডোবানোর জন্য প্রখর আলো ছাড়াই কতিপয় স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের (যেমন- *Chenopodium, Xanthium, Pharbitis*) পুষ্পায়ন হয়। কিন্তু আলোক পর্যায়ে পাতাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে বঞ্চিত করলে এই কার্যকারিতা লোপ পায়। উভয় ফলাফলই এই সম্ভাবনা নির্দেশ করে যে, অন্ধকার প্রক্রিয়ার জন্য সালোকসংশ্লেষণে তৈরি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। বিজারিত গ্লুটাথায়োন, সিস্টেইন এবং অ্যাসকরবিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে কিছু প্রভাব পাওয়া গেছে এবং এটি নির্দেশ করে যে, আলোতে তৈরি হওয়া বিজারিত যৌগ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যেহেতু উদ্ভিদের সব প্রকার শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার জন্য সালোকসংশ্লেষণ সাবস্ট্রেট সরবরাহ করে, আবেশিত অন্ধকার পর্যায়সহ, তাই সালোকসংশ্লেষণের সাথে ফটোপিরিয়ডিজমের একটি সম্পর্ক আশা করা যায়। তবে পূর্বে উল্লেখিত কতিপয় ফলাফল নির্দেশ করে যে, সালোকসংশ্লেষণের উপর ফটোপিরিয়ডিজমের নির্ভরশীলতা শুধু কার্বোহাইড্রেট সরবরাহের উপর নয়, আরো কিছু থাকতে পারে। এটি সম্ভব যে, ফটোপিরিয়ডিক আবেশের জন্য সালোকসংশ্লেষণের আরো কিছু মধ্যবর্তী যৌগ গুরুত্বপূর্ণ।

রাত্রিকালীন সময়কে বিচ্ছিন্ন করতে আলোর প্রকৃতির প্রভাব

উদ্ভিদের পুষ্পায়নের সময় রাত্রিকালীন সময়কে বিচ্ছিন্ন করতে আলোর সুনির্দিষ্ট প্রভাব আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি পরীক্ষার জন্য চারটি অথবা পাঁচটি পরিণত পাতা না হওয়া পর্যন্ত *Xanthium* গাছ ১৬ ঘণ্টা দিবালোক বা ৮ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখা হয়। তারপর অতি সম্প্রতি পরিণত একটি পাতা ছাড়া অন্যান্য পাতা কেটে ফেলা হয়। এ অবস্থায় এই গাছকে একটিমাত্র আবেশীয় ফটোপিরিয়ডে (১৫ ঘণ্টা দিবালোক বা ৯ ঘণ্টা অন্ধকার) রাখা হয়। এই গাছে পুষ্পায়ন হবে যদি না আবেশীয় অন্ধকার পর্যায় একটি আলোর ঝলকানি দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা না হয়। এ বিচ্ছিন্নকরণে আলোর প্রকৃতির কি প্রভাব আছে তা নির্ণয়ের জন্য *Xanthium* গাছের একটি পাতায় বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করা হয়। উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য লাল (৬৬০ ন্যানোমিটার) এবং অতি লাল (৭৩০ ন্যানোমিটার) আলোর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

লাল এবং অতি লাল আলোর প্রভাব চিত্র ৬.২-এ দেখানো হয়েছে। মাত্র একদিন ৯ ঘণ্টা আলো এবং ১৫ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখলেই *Xanthium* গাছে পুষ্পায়ন হবে (ক)। যদি সাদা আলো (খ কিংবা লাল আলো গ) দিয়ে দীর্ঘ রাত্রিকালীন সময়কে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে পুষ্পায়ন হবে না ; গাছ অজগজ অবস্থায় থাকবে। রাত্রিকালীন সময় বিচ্ছিন্নকরণে অতি লাল আলোর কোনোই প্রভাব (ঘ) নেই। এক ঝলক লাল আলো প্রদানের সাথে সাথেই যদি এক ঝলক অতি লাল আলো প্রদান করা হয়, তবে লাল আলোর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ পুষ্পায়ন হয় (ঙ)। যদি অতি লাল আলো প্রদানের পর লাল আলো প্রদান করা হয়, তাহলে পুষ্পায়ন হয় না, অজগজ অবস্থায় থাকে (চ)।

দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নে লাল এবং অতি লাল আলোর প্রভাবও চিত্র ৬.২-এ দেখানো হয়েছে। দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য সংকট দিবাকালীন সময়ের চেয়ে দীর্ঘ দিবালোকের প্রয়োজন হয় এবং অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ অন্ধকারে পুষ্পায়ন হয় না। ৯ ঘণ্টা আলো এবং ১৫ ঘণ্টা অন্ধকারে *Hyoscyamus* (সংকট দিবাকালীন সময় ১১ ঘণ্টা) অজগজ অবস্থায় থাকে (ক)। যদি দীর্ঘ রাত্রিকালীন সময়কে সাদা অথবা লাল আলো দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয় (খ) এবং (ঙ), তাহলে পুষ্পায়ন হবে। *Hyoscyamus*-এর পুষ্পায়নে লাল আলোর

কোনো প্রভাব নেই (ঘ) এবং গাছ অঙ্গজ অবস্থায় থাকে। রাত্রিকালীন সময়ে প্রথমে লাল আলো এবং তারপরে অতি লাল আলো প্রদান করলে কোনো পুষ্পায়ন হবে না (ঙ)। অপরদিকে, প্রথমে অতি লাল এবং তারপর লাল আলো প্রদান করলে পুষ্পায়ন হবে (চ)।

উদ্ভিদের পুষ্পায়নে লাল এবং অতি লাল আলোর উভমুখী ক্রিয়া প্রমাণ করে যে, ফাইটোক্রোম এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে।

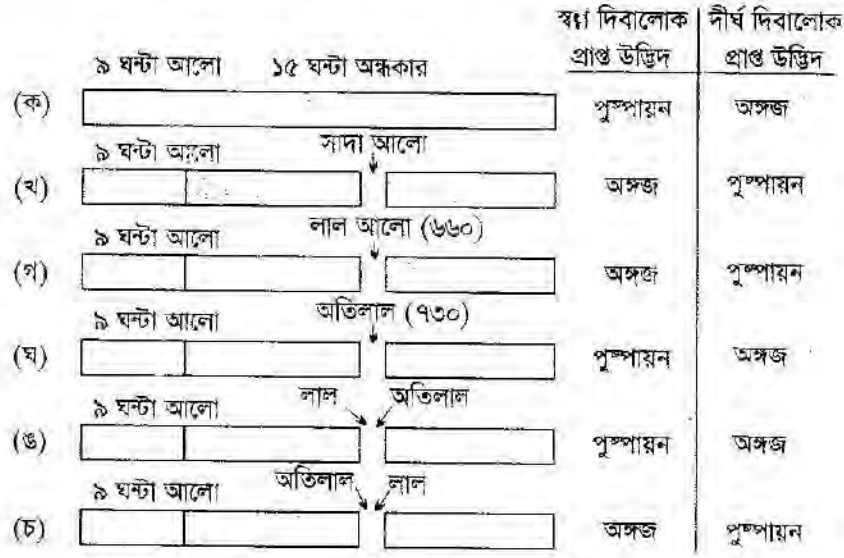

চিত্র ৮.২ : স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত এবং দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের রাত্রিকালীন সময়কে বিচ্ছিন্নকরণে লাল এবং অতিলাল আলোর প্রভাব

পুষ্পায়নে ফাইটোক্রোমের ভূমিকা

ফাইটোক্রোম পানিতে দ্রবণীয় এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ। এর রাসায়নিক সংগঠন বেশ জটিল। রৈখিকভাবে সজ্জিত চারটি পাইরোল বলয় দ্বারা ফাইটোক্রোম ক্রোমোফোর গঠিত। ক্রোমোফোর খুব শক্তভাবে ফাইটোক্রোম-প্রোটিনের সাথে যুক্ত থাকে। ফাইটোক্রোম দুটি অবস্থায় থাকে—লাল আলো শোষণকারী অবস্থা (Pr, ৬৬০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ শোষণ হয়) এবং অতি লাল আলো শোষণকারী অবস্থা (Pfr, ৭৩০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ শোষণ হয়)।

মেরিল্যান্ডের বেল্টসভিলিতে অবস্থিত ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারের গবেষণাগারে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্থউইক, বার্টলার, হেন্ড্রিকস, নরিস এবং সিগেলম্যান (Borthwick, Butler, Hendricks, Norris and Siegelman) কর্তৃক ফাইটোক্রোম আবিষ্কার উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী ঘটনা। একটি সাযুজ্যপূর্ণ বিষয় হলো যে, গার্নার এবং অ্যালার্ড কর্তৃক যে গবেষণাগারে ফটোপিরিয়ডিজম আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই গবেষণাগারেই ৩৯ বছর পর ফাইটোক্রোম আবিষ্কার হয়।

উদ্ভিদ কলা থেকে ফাইটোক্রোম পৃথক করার প্রচেষ্টা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে শুরু হয়। কতকগুলো কারণে এই পৃথকীকরণ বেশ জটিল ছিল। যেমন- উদ্ভিদ কলায় এটি খুব কম মাত্রায় থাকে। একটি নমুনার ভিতর দিয়ে লাল অথবা অতি লাল আলো প্রবেশ করিয়ে ফাইটোক্রোমের এক অবস্থার পরিমাণ নির্ণয়ের সময় অপর অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সবুজ কলায় ক্লোরোফিলের উপস্থিতি এবং আলোতে পাণ্ডুর কলায় প্রোটোক্লোরোফিল থেকে ক্লোরোফিলে রূপান্তরের সমস্যার সৃষ্টি করে। অবশ্য ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এর গঠন সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়।

ফাইটোক্রোমের Pfr অবস্থা অন্ধকারে আস্তে আস্তে Pr অবস্থায় পরিণত হয়। অতি লাল আলোর (৭৩০ ন্যানোমিটার) প্রভাবে Pfr অতি দ্রুত Pr অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে অন্ধকারে Pfr অতি ধীরে ধীরে Pr অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ ভাঙনের সময় কিছু পরিমাণ Pfr নষ্ট হয়ে যায়।

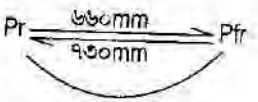

যেহেতু এই আলোক বিক্রিয়ার জন্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম (যেমন- সালোকসংশ্লেষণের তুলনায়), তাই প্রতীয়মান হয় যে, কার্যকর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কেবল ফাইটোক্রোমের আণবিক সংগঠনের পরিবর্তন ঘটায় এবং এতে অপর কোনো সিস্টেমে শক্তির স্থানান্তর হয় না। উপরন্তু, যেহেতু লাল আলো প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং অতি লাল আলো আবার লাল আলোর প্রভাবকে লোপ করে, তাই ফাইটোক্রোমের কেবল একটি অবস্থা (Pfr) সক্রিয়, অপরটি (Pr) নিষ্ক্রিয়। তাই এটি সহজেই অনুমেয় যে, লাল আলোতে কোনো উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া (অর্থাৎ লাল, অতি লাল আলোর বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া) ঘটে উৎপাদিত Pfr এর মাধ্যমে। অতিলাল আলোর প্রতিক্রিয়া হয় Pfr এর অনুপস্থিতির কারণে।

অতি সম্প্রতি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, Pr থেকে Pfr অথবা Pfr থেকে Pr অবস্থা প্রাপ্তি পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির চেয়ে বেশ জটিল। কিছু মধ্যবর্তী পদার্থ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তবে তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা এখনও অজ্ঞাত। অধিকন্তু, জৈবভাবে সক্রিয় Pfr অপর একটি পদার্থের (X) সাথে যুক্ত হয়ে Pfr.X যৌগ গঠন করে এবং এটিই বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। উল্লেখ্য যে, উদ্ভিদের পুষ্পায়নে ফাইটোক্রোমের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। ফাইটোক্রোম পুষ্পায়নের উদ্দীপনা নয়, তবে এটি উদ্দীপনা তৈরির (সংশ্লেষণ অথবা সক্রিয়ণ) সূচনা করে।

ফাইটোক্রোমের ক্রিয়ার কৌশল

উদ্ভিদের সকল প্রকার লাল, অতিলাল আলোর বিপরীতমুখী আলোক বিক্রিয়ার আলোগ্রহিতা হিসেবে ফাইটোক্রোম কাজ করে। উদ্ভিদের আলোক বিক্রিয়া বা প্রক্রিয়াগুলোকে তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা যায়। যথা, (১) ফটোপিরিয়ডিক-ফটোমরফোজেনটিক প্রতিক্রিয়া, যেমন- ফটোপিরিয়ডে সংবেদনশীল উদ্ভিদের পুষ্পায়ন, শীতকালীন মুকুলের সুপ্তাবস্থা আরম্ভ, কন্দ তৈরি ইত্যাদি, (২) ননফটোপিরিয়ডিক-ফটোমরফোজেনেটিক প্রতিক্রিয়া, যেমন- পাণ্ডুর

চারাগাছ সবুজ হওয়া, কতিপয় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ইত্যাদি এবং (৩) ননমরফোজেনেটিক প্রতিক্রিয়া, যেমন— অ্যান্থোসায়ানিন সংশ্লেষণ, ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন প্রকার এনজাইম তৈরি ইত্যাদি।

ফাইটোক্রোমের নন-ফটোপিরিয়ডিক প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, ঝিল্লির (membrane) ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটানো হলো ফাইটোক্রোমের প্রধান কাজ। *Mimosa, Albizzia* এবং লেগুমোনেসি গোত্রের অন্যান্য উদ্ভিদের পাতার ফাইটোক্রোম নিয়ন্ত্রিত দ্রুত নিকটিন্যাসটিক চলন থেকে এই প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পত্রবৃন্তের পালভিনাসের কোষ-ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তন হয়, কোষের রসস্ফীতিত্ব দ্রুত হ্রাস পায় এবং সেই সাথে কোষ থেকে ইলেক্ট্রোলাইট দ্রুত বের হয়ে আসে। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, পটাশিয়াম আয়নের চলাচলের জন্য পত্রক বন্ধ হয়ে যায় এবং পালভিনাসের ভেন্ট্রাল মটর (motor) কোষ হতে পটাশিয়াম বের হওয়াকে ফাইটোক্রোম নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হয় ফাইটোক্রোম কর্তৃক ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তনের মাধ্যমে। পত্রক বন্ধ হওয়ার সময় উপরের কোষ পটাশিয়াম আয়ন হারায় এবং সেই সাথে পানিও বের হয়ে আসে। উপরের কোষ থেকে বের হয়ে আসা পটাশিয়াম আয়ন অবশ্য নিচের কোষ গ্রহণ করে না, কিন্তু নিচের কোষের ঋণাত্মক পানির পটেনশিয়াল থাকায় উপরের কোষ থেকে পানি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ফাইটোক্রোম হয় কোষ-ঝিল্লির বৈষম্যমূলক ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে, না হয় একটি ঝিল্লিতে সংযুক্ত ATPase-কে সক্রিয় করে।

ফাইটোক্রোম জেনমের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া করে এবং কতিপয় এনজাইমের সংশ্লেষণকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে মরফোজেনেসিসের পরিবর্তন হয়। প্রোটিন অথবা RNA সংশ্লেষণের রোধক, যেমন- পিউরোমাইসিন এবং অ্যাকটিনোমাইসিন ডি, কতিপয় ফাইটোক্রোম-প্ররোচিত প্রতিক্রিয়াকে বাধা দেয়। তবে সাধারণত নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রভাব অপেক্ষাকৃত মন্থর গতির। উপরন্তু, *Albizzia*-এর পত্রকের ফাইটোক্রোম-নিয়ন্ত্রিত পত্রকের দ্রুত চলন অ্যাকটিনোমাইসিন ডি-তে সংবেদনশীল নয়। মরফোজেনটিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে জিব্বারেলিন প্রায়ই ফাইটোক্রোমের সাথে ক্রিয়া করে।

ফাইটোক্রোমের ফটোরিয়ডিক প্রতিক্রিয়া

স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ : স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নে ফাইটোক্রোমের ভূমিকা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। দিনের শেষে Pfr এর পরিমাণ খুব বেশি থাকে; Pfr এবং Pr এর অনুপাত এমন থাকে যাতে পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। দীর্ঘ অন্ধকার পর্যায়ে Pfr অবস্থা Pr অবস্থায় পরিণত হয় অথবা Pfr নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিশেষে Pfr এবং Pr এর অনুপাত এমনভাবে কমে যায়, যারফলে একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া শুরু হয় যা পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরি করে। যদি অন্ধকার পর্যায় লাল আলো দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে Pr অবস্থা Pfr অবস্থায় পরিণত হয় এবং Pfr, Pr-এর অনুপাত এমন হয়, যার জন্য পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরি হয় না।

দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ : পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরির জন্য দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের জন্য Pfr এবং Pr এর বেশি অনুপাতের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিনের শেষে Pfr/Pr অনুপাত বেশি হয়। যদি অন্ধকার পর্যায় বেশি দীর্ঘ হয়, তাহলে Pfr অবস্থা Pr অবস্থায়

পরিণত হয় অথবা Pfr নষ্ট হয়ে যায়, ফলে পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরি হতে পারে না। যদি একটি লাল আলোর ঝলকানী দ্বারা অন্ধকার পর্যায় বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে Pr, Pfr অবস্থায় পরিণত হয়। ফলে Pfr/Pr এর অনুপাত বেড়ে এমন পর্যায়ে দাঁড়ায়, যার জন্য পুষ্পায়নের উদ্দীপনা তৈরি হয়।

পুষ্পায়নে হরমোনের ভূমিকা

ফটোপিরিয়ডিজম আবিষ্কারের দুই দশকের কম সময়ের মধ্যেই প্রস্তাব করা হয় যে, এক বা একাধিক পুষ্প-উৎপাদনকারী হরমোন পুষ্পয়ানের জন্য দায়ী। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চাইলাকান এই কাল্পনিক পুষ্প-উৎপাদনকারী হরমোনকে ফ্লোরিজেন নামে অভিহিত করেন। এর কিছুকাল পর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মেলচারস (melchers) যেসব উদ্ভিদে শৈত্যের প্রয়োজন হয়, তাদের ভারনালাইজেশনের সময় যে উদ্দীপনা তৈরি হয় তাকে ভারনালিন নামকরণ করেন। এর অনেকদিন পর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে চাইলাকান কাল্পনিক পুষ্প-উৎপাদনকারী হরমোনকে 'অ্যান্থেসিন' নামে অভিহিত করেন এবং অনেক উদ্ভিদের পুষ্পায়নে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

উনিশত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Xanthium strumarium* নিয়ে, এর একটিমাত্র আবেশীয় দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়, পরিচালিত প্রাথমিক পরীক্ষার যে ফলাফল পাওয়া যায় তা ফ্লোরোজেন (অ্যান্থেসিন) ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। *Xanthium strumarium* এর ক্ষেত্রে, কিন্তু সব স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের নয়। দেখা গেছে যে, কেবল একটি পাতা আবেশিত হলেই উদ্ভিদটির পুষ্পায়ন হয়। উপরন্তু, একটি আবেশিত পাতা অথবা সম্পূর্ণ উদ্ভিদকে একটি অ-আবেশিত দীর্ঘ দিবালোকে রাখা উদ্ভিদের সাথে জোড়কলম করা যায় এবং এজন্য পরের উদ্ভিদটির পুষ্পায়ন হয়। এই পরীক্ষা এবং ফটোপিরিয়ডিজমে সংবেদনশীল অন্যান্য অনেক উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল জোরালোভাবে নির্দেশ করে যে, পাতা হলো একমাত্র অঙ্গ যা ফটোপিরিয়ডিক উদ্দীপনা গ্রহণ করে। ফাইটোক্রোম হলো আলোগ্রহিতা এবং স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পাতায় এক বা একাধিক পদার্থ তৈরি হয় যা অগ্রজ মেরিস্টেমে পরিবাহিত হয় এবং মরফোজেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে এটি পুষ্পীয় মেরিস্টেমে পরিণত হয়। উপরন্তু, অনেক জোড়কলমের পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কেবল একটি ফ্লোরিজেন আছে। যদি দুটি বা ততোধিক পদার্থ থাকে, তাহলে অনেক উদ্ভিদের মধ্যে এগুলো শারীরতাত্ত্বিকভাবে তুল্য। বিভিন্ন প্রকার ফটোপিরিয়ডিক গ্রুপের মধ্যে ফ্লোরিজেনের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয় না, কিন্তু ফ্লোরিজেন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের তারতম্য হয়। যেমন- দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Sedum spectabile*-এর পুষ্পায়নে উপযুক্ত অগ্রজ উপজোড়কে (scion) স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Kalanchoe blossfeldiana* এর আদিজোড়ের (stock) সাথে জোড়কলম করে স্বল্প দিবালোকে এই জোড়কলমকে রাখলে *Sedum spectabile*-এর পুষ্পায়ন হয়। বিপরীতভাবে করা জোড়কলম দীর্ঘ দিবালোকে রাখলে এই রকম ফলাফল পাওয়া যায়। এই ফলাফলের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা হলো যে, আবেশিত দিবাদৈর্ঘ্যে আদিজোড়ের পাতায় ফ্লোরিজেন তৈরি হয়েছিল যা জোড়কলমের মধ্য দিয়ে অ-আবেশিত অবস্থায় রাখা উপজোড়ে এসে পুষ্পায়ন ঘটিয়েছিল। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই প্রায় ২৫টি এরকম জোড়কলমে পুষ্পায়ন হয়েছিল।

উপরের প্রমাণাদি ফ্লোরিজেন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হলো পুষ্পায়নের উদ্দীপনাকে পৃথক করা এবং এর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় করা। প্রকৃতপক্ষে, এরকম অনেক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কিন্তু সাধারণভাবে এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কদাচিৎ কিছুটা সফলতা এসেছে। এদের মধ্যে ১৯৬১ এবং ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে লং বিচ স্টেট কলেজের লিংকন ও তাঁর সহকর্মীদের এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে লস এঞ্জেলেসে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামনার ও তাঁর সহকর্মীদের কথা উল্লেখ করা যায়। এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রদানের জন্য পুষ্পিত *Xanthium strumarium*-এর পাতা ও মুকুলের নির্যাস অ-আবেশিত অবস্থায় স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Lemna perpusilla*-এর পুষ্পায়ন এবং অজগজ *Xanthium strumarium*-এ সামান্য পুষ্পায়ন ঘটিয়েছিল। এই নির্যাসের অজ্ঞাত সক্রিয় পদার্থগুলোকে ফ্লোরিজেনিক (florigenic) অ্যাসিড নাম দেয়া হয়। দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ *Helianthus annuus* এবং একটি ছত্রাক *Calonectria rigidiuscula* থেকে এই সক্রিয় নির্যাস তৈরি করা হয়েছে কিন্তু অজগজ *Xanthium strumarium* থেকে পাওয়া যায়নি।

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সেলিসবারি এবং রস (Salisbury and Ross) উল্লেখ্য করেন পুষ্পারম্ভ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক বা একাধিক ঋণাত্মকভাবে ক্রিয়াশীল ফ্লোরোজন এবং এক বা একাধিক ঋণাত্মকভাবে ক্রিয়াশীল রোধক- এই পদার্থগুলো শনাক্ত করতে হবে।

সুনির্দিষ্টভাবে জানা কিছু কিছু হরমোন পুষ্পায়নে অংশগ্রহণ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ল্যাং (Lang) ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বলেন যে, অ-আবেশিত পরিবেশে অনেকগুলো দীর্ঘ-দিবালোকে প্রাপ্ত উদ্ভিদে এবং ভারনালাইজেশনে সংবেদনশীল উদ্ভিদে বহিঃস্থভাবে প্রয়োগকৃত জিব্বারেলিক অ্যাসিড পুষ্পায়ন ঘটায়। স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে অ-আবেশীয় পরিবেশে এবং এমনকি সব দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে জিব্বারেলিক অ্যাসিড পুষ্পায়ন ঘটায় না। উপরন্তু, সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পুষ্পায়ন এবং পুষ্প-ধারণকারী কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ (বোলটিং) এক প্রক্রিয়া নয় এবং যেমন— *Silena armeria* তে জিব্বারেলিক অ্যাসিড কেবল কাণ্ডের দীর্ঘকরণ করে। শেষোক্ত মন্তব্যটি নিম্নলিখিত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : (১) *Silene armeria*-তে দীর্ঘ দিবালোক অ্যামো-১৬১৮, জিব্বারেলিক অ্যাসিডের জৈবসংশ্লেষণের রোধক, প্রয়োগে কেবল কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু পুষ্পায়ন হয়েছিল ; এবং (২) স্বল্প দিবালোকে জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে পুষ্পায়ন হয়নি কিন্তু কখনো কখনো কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ হয়েছিল। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট বলেই মনে হয় যে, যদিও স্বাভাবিক পরিবেশে রোজেট প্রকারের দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে পুষ্পায়ন এবং কাণ্ড দীর্ঘীকরণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দুটি প্রক্রিয়াকে পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক করা যেতে পারে এবং তাই দুটি পৃথক বিকাশশীল প্রক্রিয়া।

জিব্বারেলিন পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করলেও পুষ্প-উৎপাদনকারী পদার্থের মতো জোড়কলমের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ থেকে স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হতে পারে না, কারণ এটি সাধারণত স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে পুষ্পায়ন ঘটাতে পারে না। *Cosmos bipinnatus*-এর পুষ্পায়নকে জিব্বারেলিন ত্বরান্বিত করে এবং *Cannabis sativa* এর পাতার আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে যা স্বল্প দিবালোকের প্রভাবের মতো মনে হয়। সম্প্রতি জানা গেছে যে, *Impatiens balsamina* নামক বাধ্যতামূলক স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে জিব্বারেলিন পুষ্পায়ন ঘটায়।

BARDOC Library Dhaka

অ্যাবসসিসিক অ্যাসিড নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে, এই বৃদ্ধিরোধক হরমোন কিছু স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের (যেমন– *Chenopodum rubrum, pharbitis nil*) দীর্ঘ দিবালোক অবস্থায় পুষ্পায়ন ঘটাতে পারে। কিন্তু অ্যাবসসিসিক অ্যাসিড ফ্লোরিজেন নয়, কেননা বহিঃস্থভাবে প্রয়োগকৃত অ্যাবসসিসিক অ্যাসিড কতগুলো স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত এবং দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পুষ্পায়নের উপর কোনো প্রভাব নেই। এটি এক প্রকার পুষ্পায়ন রোধক হতে পারে। যাকে অনেক আগে থেকেই মনে করা হতো যে, অ-আবেশিত স্বল্প-দিবালোক অবস্থায় দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের পাতায় তৈরি হয়।

উদ্ভিদে অক্সিন প্রয়োগে এদের পুষ্পায়নের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন হতে পারে, যদিও এই প্রভাব সাধারণত তেমন সুস্পষ্ট নয়। স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে অক্সিন পুষ্পায়ন-রোধক হিসেবে কাজ করে। যেমন– একটি আবেশীয় অন্ধকার পর্যায়ের পূর্বে অথবা সময়ে অক্সিন প্রয়োগ করা হলে *Pharbitis* এবং *Xanthium*-এর পুষ্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অন্ধকার পর্যায়ের প্রথম অর্ধেক সময়ে অক্সিন প্রয়োগ করা হলে *Pharbitis* এর পুষ্পায়ন বাধা পায় এবং এই প্রভাব মূলত দেখা যায় বীজপত্রে। কিন্তু অন্ধকার পর্যায়ের শেষ অর্ধাংশের সময় অথবা পরবর্তী আলোক দশার শুরুতে অক্সিন প্রয়োগ করা হলে *Xanthium*-এর এই প্রভাব দেখা যায় এবং পাতায় হয়। থ্রেসহোল্ড মানের নিচের দিবাদৈর্ঘ্যে অক্সিন প্রয়োগে দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Silene armeria* এবং *Hyoscyamus niger* এর পুষ্পায়ন হয় কিন্তু এই ক্রিয়ার কৌশল অজ্ঞাত।

সাম্প্রতিককালে জানা গেছে যে, উচ্চ মাত্রার বহিঃস্থ অক্সিন প্রয়োগে ইথিলিন মুক্ত হয়। তাই ইথিলিন অথবা ইথিলিন মুক্তকারী যৌগের পুষ্পায়নের উপর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাবেলিস (Abeles) পর্যবেক্ষণ করেন যে, একটি ১৬ ঘণ্টা অন্ধকার পর্যায়ে প্রতি লিটারে ১৬ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম ইথিলিন গ্যাস *Xanthium*-এর পুষ্পায়নে বাধা দেয়। স্বল্পদিবাদৈর্ঘ্যে *Perilla* এবং *Chrysanthemun* -এর পুষ্পায়নকে ইথিলিন বাধা দেয়। দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ আনারস এবং ব্রোমেলিয়েসি গোত্রের অন্যান্য উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ইথিলিনের জন্য ত্বরান্বিত হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে সাইটোকাইনিন পুষ্পায়নকে প্রভাবিত করে। কাইনেটিন প্রয়োগে *Perilla* তে কম সংখ্যক আবেশিত স্বল্প দিবালোকেই পুষ্পায়ন হয়েছে। একইরকম প্রভাব *Pharbitis* এ দেখা গেছে ; এক্ষেত্রে একটি আবেশিত অন্ধকার পর্যায়ের সময়ে অথবা পূর্বে বীজপত্রে কাইনেটিন প্রয়োগ করলে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।

ফটোপিরিয়ডিজমের গুরুত্ব

ফটোপিরিয়ডিজমের গুরুত্ব অপরসীম। নিচে কয়েকটি গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হলো—

(১) আলু, মুলা, পিঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুল বা ফলের প্রয়োজন নেই। তাই দিবালোকের সময়সীমাকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে পুষ্পায়নকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলে এদের অঙ্গজ বৃদ্ধি দ্রুত হয়, ফলে এদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

(২) পুষ্প-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ থেকে সারা বছরই ফুল পাওয়া সম্ভব।

(৩) ইক্ষু স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ। তাই রাত্রে কৃত্রিম আলো প্রয়োগ করে যদি আলোককালের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যায়, তবে এর পুষ্পায়ন স্থগিত রাখা যায়।

এমতাবস্থায় ইক্ষুর কাণ্ড অপেক্ষাকৃত লম্বা ও মোটা হয়। এর ফলে চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৪) সংকরায়নের সময় (hybridization) যে জাতগুলোর মধ্যে সংকরায়ন করা হবে তাদের ফুল একই সময়ে ফুটলে সংকরায়নের সুবিধা হয়। আলোককালের সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ করে এটি করা সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

ভার্নালাইজেশন

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পুষ্পায়নের জন্য অঙ্কুরিত বীজকে অথবা কচি চারাগাছকে শৈত্য প্রদান করার পদ্ধতিকে ভার্নালাইজেশন বলে। কতিপয় বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙনের জন্যও নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় এবং এটি ভার্নালাইজেশন সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। এছাড়াও, কোনো কোনো উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য নিম্ন তাপমাত্রার সরাসরি প্রভাব আছে ; যেমন ব্রাসেলস স্প্রাউট *Brassica oleracea)* এবং কতিপয় কন্দাকৃতির উদ্ভিদ, যেমন *Iris* cv Wedgewood ও *Allium cepa*। তবে পুষ্পায়নের উপর তাপমাত্রার এই সরাসরি প্রভাব ভার্নালাইজেশন থেকে পৃথক, কেননা ভার্নালাইজেশন হলো একটি আবেশীয় প্রক্রিয়া এবং এটি নিজেই পুষ্পকে আবির্ভূত করে না। ভার্নালাইজেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরই পুষ্পমুকুল তৈরি হয় না, কেবল পরবর্তী সময়ে উচ্চ তাপমাত্রায় রাখার পর এবং অনেক ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট দিবাদৈর্ঘ্যে রাখার পর পুষ্পমুকুল তৈরি হয়। ভার্নালাইজেশনে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা সব উদ্ভিদে নেই। এটি প্রধানত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়, দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এগুলো বহুবর্ষজীবী (যেমন ক্লোরেজ ঘাস), দ্বি-বর্ষজীবী (যেমন *Daucus carota. Lunaria annua)* অথবা শীতকালীন বর্ষজীবী (যেমন শীতকালীন দানাশস্য) উদ্ভিদ হতে পারে; একই প্রজাতির বর্ষজীবী জাতে উপস্থিত বংশগতীয় ফ্যাক্টর এদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যখন কেবল একটি জিন অংশগ্রহণ করে, তখন শীতকালীন ও বসন্তকালীন জাতের মধ্যে (যেমন- *Secale)* অথবা দ্বি-বর্ষজীবী এবং বর্ষজীবীর (যেমন *Hyoscyamus niger)* মধ্যে পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট, কিন্তু যখন বংশগতীয় ফ্যাক্টর অধিকতর জটিল হয়, তখন নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তার যথেষ্ট পার্থক্য হয় (যেমন গম এবং *Lolium*)। তবে ভার্নালাইজেশনের প্রয়োজন এবং একটি নির্দিষ্ট দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় সম্পর্ক নেই। অনেক উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য নিম্ন তাপমাত্রার ভার্নালাইজেশন এবং সেই সাথে পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিবালোকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এটি দেখা যায় না। কতিপয় দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদে ভার্নালাইজেশনের প্রয়োজন হয় এবং কমপক্ষে একটি উদ্ভিদ জানা গেছে *(Chrysanthemum morifolium)* যার পুষ্পায়নের জন্য নিম্ন তাপমাত্রার পর স্বল্প দিবালোকের প্রয়োজন হয়। শৈত্যের প্রয়োজন হয় এমন অনেক উদ্ভিদে শৈত্য প্রদান না করলে রোজেট আকারে থাকে এবং এদেরকে শৈত্য প্রদান করলে পুষ্পীয় কাণ্ডের দীর্ঘকরণ এবং পুষ্প প্রাইমোরডিয়া তৈরি উভয়েই হয়। পুষ্পায়নের জন্য নিম্নতাপমাত্রার প্রয়োজন হয় এমন কিছু উদ্ভিদের উদাহরণ সারণি ১৮.১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভার্নালাইজেশনের আবিষ্কার

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্লিপার্ট (Klippart) পুষ্পায়নের উপর শৈত্যের প্রভাব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। তিনি শীতকালীন জাতের গমের (এ গম শীতকালে বপন করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে এদের পুষ্পায়ন হয়) অঙ্কুরিত বীজকে হিমাঙ্কের কাছাকাছি শৈত্য (০ থেকে ৫° সেলসিয়াস) প্রদান করে তা

সারণি ১৮.১: পুষ্পায়নের জন্য নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় এমন কতিপয় উদ্ভিদের উদাহরণ

১. বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ (মনোকার্পিক উদ্ভিদ)

ক. বীজকে ভার্নালাইজ করা যায়।

i. নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন অবিমিশ্র (absolute) *Arabidopsis thaliana, Beta maritima, Beta vulgaris, Cichrium intybus, Daucus carota.*

ii. পরিমাণগত (quantitative) নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন

Avena sativa, Hordeum vulgare, Secale cereale, Triticum aestivum, Brassica juncea, Brassica rapa, Lactuca sativa, Lolium temulentum, Pisum sativum, Sinapis alba, Spinacia oleraceae.

খ. বীজকে ভার্নালাইজ করা যায় না। নিম্ন তাপমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ার জন্য উদ্ভিদের কিছুটা বৃদ্ধির প্রয়োজন ।।

i. অবিমিশ্র নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন

Apium graveolens, Brassica napus, Campanula medium, Crepis biennis, Digitalis purpurea, Euphorbia lathyris, Hyoscyamus niger, Oenothera biennis, Scrophularia vernalis, Senecio jacobaea.

iii. পরিমাণগত নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন

Oenothera longiflora, Oenothera Suaveolens, Oenothera stricta.

২. বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ

ক. অবিমিশ্র নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন

Anagallis tenella, Bromus spp. *Cardamine amara, Chrysanthemum morifolium, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Dianthus barbatus, Dianthus deltoides, Draba hispanica, Festuca* spp. *Geum urbanum, Lolium perenne, Lychnis coronaria, Saxifraga rotundifolia, Scrophularia alata, Teucrium scorodonia.*

খ. পরিমাণগত নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন

Chrysanthemum morifolium, Dianthus arenarius, Dianthus gallicus.

৩. নিম্ন তাপমাত্রার সরাসরি প্রভাব

Allium cepa, Brassica oleracea (Brussels Sprout), *Brassica chinensis, Iris* cv wedgewood, *Matthiola incana.*

বসন্তকালীন জাতের গমে (এ গম বসন্তকালে বপন করা হয় এবং গ্রীষ্মে এদের পুষ্পায়ন হয়) রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। রাশিয়ান বিজ্ঞানী লাইসেনকো (Lysenko) এ পদ্ধতিকে "Jarovizacija" নাম দেন, ল্যাটিন ভাষায় একে ভার্নালাইজেশন বলে। এর বুৎপত্তিগত অর্থ হলো শীতকালীন শস্যকে বসন্তকালীন শস্যে রূপান্তর।

গ্যাসনার (Gassner) নামক অপর একজন বিজ্ঞানী রাই-এর (Secale Cereale cv Petkus) উপর ভার্নালাইজেশনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন অন্যান্য দানাশস্যের মতো রাই -এরও দুটি জাত আছে যেমন-শীতকালীন ও বসন্তকালীন জাত। শীতকালীন পেটকাস রাই শীতের প্রারম্ভে মাঠে বপন করা হয় এবং তারপর এটি অঙ্কুরোদ্গমিত হয়ে কয়েকটি পাতাবিশিষ্ট চারাগাছে পরিণত হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য এদের বৃদ্ধি আর হয় না।। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চারাগাছগুলো বরফ দ্বারা ঢাকা থাকে। বসন্তকালের প্রারম্ভে যখন তাপমাত্রা বাড়তে থাকে তখন এদের বৃদ্ধি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং গ্রীষ্মকালে এটি ফুল ও ফল ধারণ করে। অপরপক্ষে, বসন্তকালীন পেটকাস রাই বসন্তকালে মাঠে বপন করা হয় এবং সাথে সাথেই এদের

অঙ্কুরোদগম হয় এবং অঙ্গজ বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এদেরও গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। যদি শীতকালীন রাইকে বসন্তকালে বপন করা হয়, তবে এদের অনেকদিন ধরে অঙ্গজ বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং শীতের প্রারম্ভে এদের পুষ্পায়ন হলেও নিম্ন তাপমাত্রার জন্য এদের দানা ভালভাবে গঠিত হয় না। গ্যাসনার লক্ষ্য করেন যে, শীতকালীন রাই-এর কিছুদিনের জন্য শৈত্যের প্রয়োজন হয়। শীতকালীন রাই-এর অঙ্কুরিত বীজকে ২° থেকে ৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ রেখে ও এ বীজ বসন্তকালে বপন করলে বসন্তকালীন জাতের মতো ফুল ও ফল ধারণ করে। বসন্তকালীন জাতের রাই গমের তুলনায় শীতকালীন জাতের রাই ও গমের কিছু কিছু ভাল গুণাবলি আছে।

উনিশশত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে উত্তর ইউরোপে দানাশস্য, বিশেষ করে রাই এবং গমে ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য উদ্ভিদ প্রজননবিদ এবং বংশগতিবিদরা দানাশস্যের এমন জাত উদ্ভাবন করেছেন যাতে শৈত্য সহ্যক্ষমতা (Cold hardiness) এবং ভাল গুণাবলি উভয়েই আছে। তাই ভার্নালাইজেশন পদ্ধতির ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি জানার পর কতিপয় গবেষক এ পদ্ধতির গুরুত্ব নিয়ে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা শুরু করেন। কেউ কেউ দাবি করেন যে, ভার্নালাইজেশনের ফলে বংশজাতীয় পদার্থের এমন পরিবর্তন হয়, যার ফলে শীতকালীন জাতের বংশধর স্থায়ীভাবে বসন্তকালীন জাতে পরিণত হয়। এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ এফ. জি. গ্রেগরি (F. G. Gregory) এবং ও.এন. পারভিস (O. N. Purvis) ১৯৩০ এর দশকের শেষের দিকে ভার্নালাইজেশনের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন। অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতায় এ গবেষণা অনেকদিন ধরে চলে। অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতায় এ গবেষণা অনেকদিন ধরে চলে। এ গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, অঙ্কুরোদগমের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ যখন দ্রুত কোষ-বিভাজন পর্যায়ে থাকে, তখনই শৈত্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি কার্যকর। আরো জানা যায় যে, নিষেকের পাঁচদিন পরেই ভ্রূণকে ভার্নালাইজ করা যায়। কাণ্ডের অগ্রস্থ কোষগুলো শৈত্যের প্রভাব গ্রহণ করে, তারপর বিপাকক্রিয়ার ফলে পুষ্পায়নের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এটি কাণ্ডের অগ্রস্থ নির্দিষ্ট অঞ্চলে পুষ্প প্রারম্ভিক কোষে স্থানান্তরিত হয়ে পুষ্পায়ন ঘটায়।

ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি

ভার্নালাইজেশনের জন্য বীজকে কিছু সময়ের জন্য অঙ্কুরোদগম করা হয় এবং তারপর এদেরকে ০ থেকে ৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে শৈত্য প্রদান করা হয়। শৈত্য প্রদানের সময়সীমা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম হয়। কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। শৈত্য প্রদানের পর অঙ্কুরিত বীজকে কিছু সময়ের জন্য শুষ্ক অবস্থায় রাখা হয় এবং তারপর বপন করা হয়। বেশি সময় ধরে উচ্চতাপে শুষ্ক করলে ভার্নালাইজেশনের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।

নিম্ন তাপমাত্রা গ্রহণের স্থান

অধিকাংশ শৈত্য-আবশ্যক উদ্ভিদে কাণ্ড শীর্ষে ভার্নালাইজেশন সংঘটিত হয়। দ্বি-বর্ষজীবী এবং বহু-বর্ষজীবী উদ্ভিদের কোনো বিশেষ অঞ্চলে শৈত্য প্রদান করে দেখা গেছে যে, উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের তাপমাত্রা যাই হোক না কেন। কেবল উদ্ভিদের বর্ধনশীল অগ্রভাগে শৈত্য প্রদান করলে পুষ্পায়ন হয়, সিলারী, সুগার বীট এবং *Chrysanthemum*-এর ক্ষেত্রে এরকম ফলাফল পাওয়া গেছে। ভার্নালাইজেশন দেয়া একটি মূলার কাণ্ড-শীর্ষকে শৈত্য প্রদানের অব্যবহিত পরেই অপসারিত করে এর পরিবর্তে ভার্নালাইজেশনবিহীন একটি কাণ্ড-শীর্ষ এখানে জোড়কলম করলে

পুষ্পায়ন হয় না। বীজের ভার্নালাইজেশনের ক্ষেত্রে বীজপত্র বিহীন ভ্রূণে (যেমন মূলায়), কর্তিত ভ্রূণে এবং বিটপঅঞ্চলসহ ভ্রূণে (যেমন- পেটকাস রাই) ভার্নালাইজেশন করা যায়। গাজরের *(Daucus carota)* এর কর্তিত বিটপ-শীর্ষকে সাফল্যের সাথে ভার্নালাইজেশন করা সম্ভব হয়েছে।

কেবল শীর্ষ মেরিস্টেম নয়, সব বিভাজনসক্ষম কোষে, পাতাসহ, ভার্নালাইজেশন করা সম্ভব। *Lunaria annua* এর পাতা নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল থেকে এর সমর্থন পাওয়া গেছে। ভার্নালাইজেশন না দেওয়া *Lunaria* গাছের কর্তিত পাতা থেকে সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা যায়, তবে পুষ্পায়নের জন্য একে অবশ্যই ভার্নালাইজেশন করতে হয়। কর্তিত পাতাকে যদি প্রথমে ৫° সেলসিয়াসে রাখা হয়, তবে নতুন সৃষ্ট গাছটিকে ভার্নালাইজেশন দেয়া হয়েছে এমন আচরণ করে। পত্রবৃন্তের গোড়ায় শৈত্য প্রয়োগের পর যদি পাতার নিচের ৫ সেন্টিমিটার অংশ অপসারণ করা হয়, তাহলে নতুন সৃষ্ট গাছটি আর ভার্নালাইজেশন অবস্থায় থাকে না। ভার্নালাইজেশনের ক্ষেত্রে পাতার বয়সের প্রভাব আছে, পরিণত পাতার ভার্নালাইজেশনের জন্য মেরেস্টিমেটিক ক্রিয়াকলাপ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তবে –২° সেলসিয়াস এবং এর চেয়েও কম তাপমাত্রায় শীতকালীন রাই এর ভার্নালাইজেশন খুব মন্থর গতিতে হয় এবং এ সময় মাইটোটিক কোষ বিভাজন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। *Cheiranthus* এর বীজে ভার্নালাইজেশনের সময় মাইটোটিক কোষ বিভাজন হয় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কেবল বিভাজন সক্ষম কোষ অথবা যাদের কোষ বিভাজন শুরু হবে এমন কোষেই ভার্নালাইজেশন সংঘটিত হয়।

কার্যকর তাপমাত্রা

নিম্ন তাপমাত্রার ভার্নালাইজেশনের প্রভাব হলো একটি পরিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘস্থায়ী শৈত্য প্রদানের জন্য এর মাত্রা বাড়তে থাকে যতোক্ষণ না পর্যন্ত একটি সম্পৃক্ত প্রতিক্রিয়ায় পৌঁছায়। সুগার বীটের কার্যকর তাপমাত্রার পরিসর হলো প্রায় + ১০° সেলসিয়াস থেকে –২০° সেলসিয়াস অথবা এর চেয়েও কম এবং সর্বোত্তম তাপমাত্রা হলো প্রায় ৭° সেলসিয়াস। পেটকাস শীতকালীন রাই –এর পরিসর হলো ৫° সেলসিয়াস থেকে + ১৫° সেলসিয়াস এবং প্রশস্ত সর্বোত্তম তাপমাত্রা হলো ১ থেকে ৭° সেলসিয়াস। তবে *Hyoscyamus niger* এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শৈত্য প্রদানের স্থায়ীত্বকালের সাথে সাথে সর্বোত্তম তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় ; স্থায়িত্ব অল্প সময় হলে সর্বোত্তম তাপমাত্রা বেশি হয়। উপরন্তু, শৈত্য প্রদানের স্থায়িত্বকাল পর্যাপ্ত হলে কার্যকর পরিসরের যে কোনো তাপমাত্রা একই রকম ঘটাতে সক্ষম।

ভার্নালাইজড অবস্থার (তাপ আবেশিত) স্থায়িত্ব

যদিও শৈত্য প্রদানের প্রাথমিক অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রার জন্য ডিভার্নালাইজেশন হতে পারে, তবে সাধারণত ভার্নালাইজেশন একবার সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হওয়ার পর এই অবস্থা খুবই স্থায়ী হয় এবং পরবর্তীকালে পুষ্পায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রভাব থাকে। একটি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, *Hyoscyamus*-এ এই তাপ আবেশিত অবস্থা ১৯০ স্বল্প দিবালোকের বেশি স্থায়ী ছিল। এ সময়ে যেসব পাতা ছিল তাদের অভ্যুদয় হয়েছিল শৈত্য প্রদানের পর।

ভার্নালাইজেশন প্রভাবের স্থানান্তর

কতকগুলো উদ্ভিদে শৈত্য প্রদানের ফলে সৃষ্ট পুষ্প উৎপাদনকারী প্রতিক্রিয়া জোড়কলমের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার এই স্থানান্তর হয় না, যেমন, স্বল্প-দিবালোক

প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Chrysanthemum morifolium* এবং দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Oenothera*. কতকগুলো সম্পর্কবিহীন গোত্র বিভিন্ন প্রজাতি ও গণের এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল প্রকারের মধ্যে এই স্থানান্তর হয়। তাই ফটোপিরিয়ডিক আবেশের মতো তাপীয় আবেশ বিভিন্ন প্রকার পুষ্প উৎপাদনকারী পদার্থ তৈরি করতে পারে। সাধারণত গ্রহীতা উদ্ভিদের পরিণত পাতা অপসারণ সুবিধাজনক এবং এটি অত্যাবশ্যকও হতে পারে। গ্রহীতা উদ্ভিদের পাতা অন্ধকারে রাখলেও একই রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। স্বভাবতই এর জন্য দাতা থেকে গ্রহীতা উদ্ভিদে সুক্রোজের চলাচলে সুবিধা হয় এবং ভার্নালাইজেশন সৃষ্টিকারী পদার্থও এর সাথে চলাচল করে। তবে এটি সুস্পষ্ট নয় যে, কোনো কলার ভিতর দিয়ে ভার্নালাইজেশনের প্রতিক্রিয়া চলাচল করে। *Hyoscyamus niger* এ দেখা গেছে যে, জোড়কলমকৃত উদ্ভিদের মধ্যে ভার্নালাইজেশনের প্রতিক্রিয়া স্থানান্তরিত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু কলার সংযোগ ঘটেছে। ফটোপিরিয়ডিক প্রতিক্রিয়ার মতো ভার্নালাইজড অথবা পুষ্পায়নে শৈত্যের প্রয়োজন হয় না এমন উদ্ভিদ থেকে কোনো পদার্থ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় নি যেখানে শৈত্যের প্রয়োজন হয়। ভার্নালাইজেশনবিহীন উদ্ভিদে প্রয়োগ করলে পুষ্পায়ন ঘটাতে পারে। যদিও একটি প্রাথমিক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, ভার্নালাইজেশন দেওয়া রাই (rye) এর বীজের নির্যাস একই উদ্ভিদে পুষ্পায়নের জন্য শৈত্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

অধিকাংশ জোড়কলমের ক্ষেত্রে স্থানান্তরযোগ্য ভার্নালাইজেশন প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি দেখা যায় দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে (পুষ্পায়নের জন্য শৈত্যের প্রয়োজন হোক বা না হোক) এবং সাধারণত এই পরীক্ষাগুলো করা হয়েছে দীর্ঘ দিবালোক অবস্থায়। এ অবস্থায় দাতা উদ্ভিদগুলো সবসময়ই পুষ্পীয় অবস্থায় থাকে এবং এটি সম্ভব যে, দাতা উদ্ভিদ থেকে ফ্লোরিজেনের স্থানান্তরের সাথে ভার্নালাইজেশনের প্রভাব স্থানান্তরিত হয়।

তাই শৈত্য প্রদানের ফলে সরাসরি কোনো স্থানান্তরযোগ্য হরমোন তৈরি হয় না, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোষের পরিবর্তন ঘটায় যা পরবর্তীকালে অনুকূল পরিবেশে এই কোষে ফ্লোরিজেন তৈরি করে। এই ধারণার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। *Chrysanthemum* এ, স্বল্প দিবালোক অবস্থায় ভার্নালাইজেশন দেওয়া গাছকে ভার্নালাইজেশন না দেওয়া গাছের সাথে জোড়কলম করলে কখনোই শেষোক্ত গাছে পুষ্পায়ন হয়নি। উপরন্তু, এই গাছের কোষের দীর্ঘকরণ, *Chrysanthemum* এবং শৈত্যের প্রয়োজন হয় এমন অনেক উদ্ভিদের শৈত্যে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শৈত্য প্রদানের সময় কেবল প্রায় ০.৫ মিলিমিটার পর্যন্ত কাণ্ডশীর্ষের কোষগুলোর স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘীকরণ হয়েছে। কাণ্ডশীর্ষ থেকে দূরবর্তী কোষগুলো সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও GA_3 প্রয়োগে এই কোষগুলো দীর্ঘকরণে সক্ষম। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে, শৈত্যের প্রতিক্রিয়ায় একটি স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ তৈরি হয় না, অথবা কমপক্ষে ভার্নালাইজেশন দেওয়া শেষ হওয়ার কিছু সময় পরেও। সুতরাং ভার্নালাইজেশন হলো একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থা যা পরবর্তীকালে অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদে একটি স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হয়। এখন প্রশ্ন হলো যে, শৈত্য প্রদানের ফলে ফ্লোরিজেন থেকে পৃথক এমন কোনো স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ তৈরি হয় কিনা। স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ মেরিল্যান্ড ম্যামথ তামাক এবং দীর্ঘদিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ *Hyoscyamus niger*-এর মধ্যে জোড়কলম থেকে এরকম পদার্থের (ভার্নালিন) অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। দাতা মেরিল্যান্ড ম্যামথ তামাক গাছ, ভার্নালাইজেশন না দেওয়া দ্বি-বর্ষজীবী *Hyoscyamus*-এ পুষ্পায়নে ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, যখন এই জোড়কলমকে দীর্ঘ দিবালোকে রাখা হয়েছে এবং মেরিল্যান্ড ম্যামথ তামাক গাছ অঙ্গজ অবস্থায় থেকেছে। সুতরাং গ্রহীতা *Hyoscyamus* এ পুষ্পায়ন ঘটেছে দাতা উদ্ভিদ থেকে ফ্লোরিজেন স্থানান্তরের জন্য নয়, এবং অন্য কোনো স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ এতে অংশ নিয়েছে।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, শৈত্যের প্রভাবে একটি স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ তৈরি হয় যা ফ্লোরোজেন থেকে পৃথক। তাপীয় আবেশের প্রভাবে নিম্নলিখিতভাবে এটি তৈরি হয় :

নিম্ন তাপমাত্রা—ভার্নালাইজড অবস্থা (তাপীয় আবেশিত)—একটি স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ তৈরি (ভার্নালিন)—ফ্লোরোজেন তৈরি

ভার্নালাইজেশনের প্রাণরসায়ন

উদ্ভিদের অনেক শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার হার নিম্ন তাপমাত্রায় হ্রাস পায়, কিন্তু ভার্নালাইজেশন ত্বরান্বিত হয়। এটি অসম্ভব বলেই মনে হয় যে, ভার্নালাইজেশনের জন্য কেবল একটি রোধক যৌগ তৈরি হওয়াই বন্ধ হয় না, কেননা পূর্ণ ভার্নালাইজেশনের জন্য কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ অত্যাবশ্যক এবং অক্সিজেনের উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। শীতকালীন দানাশস্যের কর্তিত ভ্রূণ, মুলার বীজপত্রহীন ভ্রূণ এবং গাজরের পৃথকীকৃত কাণ্ডশীর্ষের জন্য বাইরে থেকে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহের প্রয়োজন হয় এবং এর প্রয়োজন নিম্ন তাপমাত্রা প্রদানের প্রাথমিক অবস্থায়। তবে দানাশস্যের সম্পূর্ণ দানায় নিম্ন তাপমাত্রা প্রদানের প্রথম থেকেই কার্যকর। কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রা প্রদানের প্রথম ২ থেকে ৩ সপ্তাহে কর্তিত ভ্রূণে কোনো প্রভাব নেই। নিম্ন তাপমাত্রা প্রদানের প্রথম ১ থেকে ২ দিন ভ্রূণকে সংযুক্ত রাখলে এই প্রভাব বিহীন সময়সীমাকে হ্রাস করা যায়। কার্যকর ভার্নালাইজেশনের জন্য সম্ভবত সস্য অথবা অন্য কোনো সঞ্চয়ী কলা থেকে সাবস্ট্রেট সরবরাহের প্রয়োজন আছে। দানাশস্য এবং মুলায় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত। তাই, ভার্নালাইজেশনের জন্য অক্সিজেন ও কার্বোহাইড্রেট উভয়েরই দরকার হয় এবং নিম্ন তাপমাত্রায় একটি রোধক পদার্থ তৈরি বন্ধ হয় না, বরং পুষ্পায়নের একটি অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাক্টর তৈরি হয়।

জিব্বারেলিনের প্রভাব

রোজেট প্রকারের দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদে জিব্বারেলিন পুষ্পায়ন ঘটাতে পারে বলে জিব্বারেলিন এবং ভার্নালাইজেশনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আগ্রহোদ্দীপক। শৈত্যের প্রয়োজন হয় এমন কোনো উদ্ভিদে GA_3 প্রয়োগ করলে শৈত্য প্রদান ছাড়াই পুষ্পায়ন হয়। *Hyoscyamus niger*-এর বর্ষজীবী প্রকারে GA_3 প্রয়োগ করলে স্বল্প দিবালোকে পুষ্পায়ন হয় এবং দীর্ঘ দিবালোকে শৈত্য প্রদান ছাড়াই দ্বি-বর্ষজীবী প্রকারের পুষ্পায়ন হয়। তবে, স্বল্প দিবালোকে GA_3 প্রভাবে দ্বিবর্ষজীবী প্রকারে পুষ্পায়ন হয় না, যদিও কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ কিছুটা হতে পারে। তাই যদিও GA_3 দ্বারা হয় দীর্ঘ দিবালোকের না হয় ভার্নালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিস্থাপন করা যায়, কিন্তু একই উদ্ভিদে এই দুটি প্রয়োজনীয়তা একসাথে প্রতিস্থাপন করা যায় না।

যদিও অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে ভার্নালাইজেশন করা যায়, তবে বৃদ্ধির পরবর্তী দশায় কার্যকর হলেও এই সময় GA_3 প্রদান সাধারণত কার্যকর নয়। শীতকালীন পেটকাস রাই-এর ৯/১০ পাতা অবস্থায় GA_3 প্রয়োগ করলে পুষ্পায়ন যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয়, তবে এর চেয়ে আগে করলে সামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। *Arabidopsis*-এর বীজে GA_3 প্রয়োগ কার্যকর হয় না কিন্তু রোজেট চারাগাছে প্রভাব সর্বোত্তম হয়।

জিব্বারেলিন এবং কাল্পনিক পদার্থ ভার্নালিন এবং ফ্লোরিজেনের মধ্যে সম্পর্ক এখনও অজ্ঞাত। বীজে শৈত্য প্রদানে ভার্নালাইজেশন না হওয়া নির্দেশ করে যে, জিব্বারেলিন সরাসরি ভার্নালাইজেশন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না। সম্ভবত জিব্বারেলিন তাপীয় আবেশের ফলে সৃষ্ট কোনো পদার্থ নয়, যদিও ভার্নালাইজেশনের ফলে পরবর্তী সময়ে জিব্বারেলিনের সংশ্লেষণ হতে পারে। পুষ্পায়নের জন্য এটি প্রয়োজন হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী হারডা (Harada) দেখিয়েছেন যে, শৈত্যের প্রয়োজন হয় এমন *Chrysanthemum*-এর দিবালোক নিরপেক্ষ একটি

কালটিভারে GA_3 প্রয়োগে পুষ্পায়ন হয় এবং জোড়কলমের মাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়া শৈত্যের প্রয়োজনহীন এমন স্বল্প-দিবালোক প্রাপ্ত কালটিভারে স্থানান্তরিত করা যায়। শেষোক্ত কালটিভারে সরাসরি GA_3 প্রয়োগে পুষ্পায়ন হয় নি, সুতরাং GA_3 প্রয়োগকৃত দিবালোক নিরপেক্ষ কালটিভারে GA_3 একপ্রকার স্থানান্তরযোগ্য পুষ্প উৎপাদনে সক্ষম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাক

সম্ভবত ভার্নালাইজেশন সরাসরি কোনো স্থানান্তরযোগ্য পদার্থ তৈরি করে না, বরঞ্চ যে কোষগুলোকে শৈত্য প্রদান করা হয়, এগুলো বিকাশের একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে, তাতে কোষে ভার্নালাইজড অবস্থা তৈরি হয়। ভার্নালাইজড কোষগুলোর বিভাজনে সৃষ্ট সব অপত্য কোষেই এই ভার্নালাইজড অবস্থা থাকে, যদিও কোনো কোনো উদ্ভিদে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় ডিভার্নালাইজেশন হতে পারে। ভার্নালাইজড অবস্থায় অবস্থান্তরের সময় সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর প্রকৃতি অজ্ঞাত ; তবে সম্ভবত কোষ কর্তৃক বংশগতীয় পদার্থের স্থানান্তরের বাধা অপসারিত হয়। ফলে, শৈত্য প্রদানের পর সৃষ্ট নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনের পরিবর্তনের গুরুত্ব যথেষ্ট। তবে, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শৈত্য প্রদানের সময় শীতকালীন দানাশস্যের বীজের ভ্রূণের RNA এর পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্তু বসন্তকালীন দানাশস্যেও অল্প মাত্রায় হলেও RNA বেড়ে যায়। অপরদিকে, ফিন্স এবং কার (Finch and Carr, 1956) ভার্নালাইজেশন অথবা ডিভার্নালাইজেশনের সময় শীতকালীন পেটকাস রাই-এর ভ্রূণে DNA কিংবা RNA এর পরিমাণের পার্থক্য পাননি। তবে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে টেরোয়াকা (Terocka) ডিস্ক ইলেক্ট্রোফোরেসিসের সাহায্যে ভার্নালাইজেশনের সময় গমের ভ্রূণমুকুলে (plumule) নতুন প্রোটিনের সন্ধান পান। ভার্নালাইজেশন ঘটাতে পারে এমন পর্যাপ্ত মাত্রায় শৈত্য প্রদান করলে একটি শীতকালীন কালটিভারের ভ্রূণের প্রোটিনের প্যাটার্ন একটি বসন্তকালীন কালটিভারের মতোই। যখন একটি সুক্রোজ মাধ্যমে (medium) ভ্রূণকে শৈত্য প্রদান করা হয় কেবল তখনই নতুন প্রোটিন তৈরি হয়, যা কর্তিত ভ্রূণের ভার্নালাইজেশনের জন্য অত্যাবশ্যক। অ্যাজাগুয়ানিন (azaguanine) দ্বারা ভার্নালাইজেশন বাধাগ্রস্থ হয়, কিন্তু ব্রোমোইউরাসিল দ্বারা নয়, এবং যখন এসব রোধকের উপস্থিতিতে ভ্রূণে শৈত্য প্রদান করা হয়, তখন কেবল ভার্নালাইজেশন হলেই নতুন প্রোটিন তৈরি হয়।

টেরোয়াকা (১৯৭২) আরো মন্তব্য করেছেন যে, বসন্তকালীন গমের তুলনায় শীতকালীন গমের হিস্টোনের প্যাটার্ন অধিকতর জটিল ; তবে শৈত্য প্রদানের সময় এটি অপেক্ষকৃত কম জটিল হতে থাকে, এবং পরিশেষে বসন্তকালীন গমের মতো সরল প্যাটার্ন হয়। তিনি আরো বলেছেন যে, ভার্নালাইজেশনবিহীন শীতকালীন দানাশস্যের বংশগতীয় পদার্থ তৈরিতে হিস্টোন বাধা দেয়।

ভার্নালাইজেশন এবং ফটোপিরিয়ডিজমের মধ্যে সম্পর্ক

দিবাদৈর্ঘ্যের সাথে ভার্নালাইজেশন প্রক্রিয়ার কতিপয় পারস্পরিক ক্রিয়া আছে। এদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হলো দিবাদৈর্ঘ্যের দ্বারা ভার্নালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তার প্রতিস্থাপন অথবা এর মাত্রা কিছুটা কমানো এবং বিপরীতভাবে শৈত্য প্রদান করে ফটোপিরিয়ডিক প্রয়োজনীয়তাকে লুপ্ত করা অথবা সামান্য পরিবর্তন করা।

স্বল্প দিবালোক দ্বারা শৈত্যের চাহিদাকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করা যায়। যেসব উদ্ভিদের নিম্ন তাপমাত্রার চাহিদাকে স্বল্প, দিবালোক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করা যায়, সেগুলো হলো দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ। তাই এদেরকে হয় স্বল্প -দীর্ঘ -দিবালোক প্রাপ্ত

উদ্ভিদ অথবা শৈত্যআবশ্যক দীর্ঘ-দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ বলে। সবচেয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন একটি উদাহরণ হলো *Campannia medium*। একটি স্বল্প দিবালোক দীর্ঘ দিবালোক আবেশের প্রতিক্রিয়ায় অথবা নিম্ন তাপমাত্রার পর দীর্ঘ দিবালোক প্রদান করলে এই গাছের পুষ্পায়ন হয়।

অবিরত স্বল্প দিবালোকে বসন্তকালীন এবং শীতকালীন উভয় জাতের পেটকাস রাই-এর শীষ বের হয় না। শীষের পরিস্ফুরণ (differentiation) হয়, কিন্তু পাতার সাথে থেকে বের হওয়ার আগেই মারা যায়। সুতরাং স্বল্প দিবালোক পুষ্পারম্ভকে বাধা দেয় না, কিন্তু শীষের পরবর্তী বিকাশে এবং পর্বমধ্যের দীর্ঘীকরণের জন্য দীর্ঘ দিবালোক অত্যাবশ্যক। যদি ভার্নালাইজেশন-বিহীন শীতকালীন পেটকাস রাইকে স্বল্প দিবালোকের পর অবিরত আলোতে রাখা হয়, তাহলে পুষ্প প্রাইমোরডিয়া বৃদ্ধি পায় এবং শীষ নির্গত হয়। ভার্নালাইজেশনের পরে অবশ্য আবেশীয় স্বল্প দিবালোকের প্রতিক্রিয়া থাকে না।

ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব

রাশিয়ার মতো শীতপ্রধান দেশের কৃষিক্ষেত্রে ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। বসন্তকালীন গমের চেয়ে শীতকালীন গমের ফলন বেশি। এদের কতকগুলো ভাল গুণাবলি আছে। শীতকালীন গম সাধারণত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে বপন করা হয় এবং চারা কিছুটা বড় হওয়ার পর সারা শীতকাল এদের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। অনেকক্ষেত্রে প্রচণ্ড শীতে অনেক চারাগাছ মারা যায়। তাই শীতকালীন গমে ভার্নালাইজেশন প্রয়োগ করে এদেরকে বসন্তকালে বপন করলে গ্রীষ্মকালে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব তেমন নেই। বিভিন্ন খাদ্যশস্যের ভার্নালাইজেশনের উপর ভারতে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকার ও পারিজা (Sarcar and Parija) ভার্নালাইজেশন পদ্ধতিতে রূপশাইল ধানে ১৩৩ দিনের পরিবর্তে ৪৮ দিনে পুষ্প উৎপাদনে সক্ষম হন। বিজ্ঞানী কর (Kar, 1940, 1943), পাল ও মূর্তি (Pal and Murty, 1941) এবং সেন ও চক্রবর্তী (Sen and Chakravarty, 1945) লক্ষ্য করেন যে, সাধারণভাবে গম ভার্নালাইজেশন কোনো সাড়া দেয় না।

বিজ্ঞানী কর (Kar, 1943) পাটের (*Corchorus capsularis*) উপর ভার্নালাইজেশনের প্রভাব পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, বপনের পূর্বে বীজে শৈত্য প্রদান করলে অঙ্কুরোদ্গম বিলম্বিত হয়, পাতায় সবুজ রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রাথমিক অবস্থায় অঙ্গজ বৃদ্ধি খুব বেশি হয় কিন্তু পুষ্পায়নের উপর কোনোই প্রভাব নেই। বিজ্ঞানী সেনগুপ্ত এবং সেন (Sen Gupta and Sen, 1943, 1944) একই রকম ফলাফল পান। তবে সেনগুপ্ত (Sen Gupta, 1953) লক্ষ্য করেন যে, বীজে বেশি সময় ধরে শৈত্য প্রদান করলে পাটের পুষ্পায়ন কিছুটা ত্বরান্বিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী কুণ্ডু, বসাক এবং সরকার (Kundu, Basak and Sarcar 1959) এ ফলাফল নিশ্চিত করেন।

ভারতীয় গবেষণার ফলাফল দেখে আশা করা যায় যে, ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের কৃষিতেও পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অষ্টম অধ্যায়

বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও সুপ্তাবস্থা

বীজের অঙ্কুরোদ্গম

বীজের ভ্রূণের পূর্ণ বৃদ্ধিকে অঙ্কুরোদ্গম বলে। বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় নানা প্রকার বিপাকক্রিয়া খুবই মন্থর গতিতে চলে বলে ভ্রূণের বৃদ্ধি হয় না। পানি, পরিমিত তাপমাত্রা, অক্সিজেন এবং আলোর উপস্থিতিতে ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে বীজাবরণ (seed coat) বিদীর্ণ করে এবং চারাগাছের জন্ম হয়। ভ্রূণের তিনটি অংশ আছে। যথা : ভ্রূণমুকুল (plumule), ভ্রূণমূল (radicle) এবং বীজপত্র (cotyledon)। অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল বীজাবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভ্রূণমুকুল থেকে কাণ্ড ও ভ্রূণমূল থেকে মূলের উৎপত্তি হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণমূল কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর মরে যায় এবং তার গোড়া থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। সস্যহীন (non-endospermic) বীজের বীজপত্র বেশ পুরু হয় এবং এতে ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সঞ্চিত থাকে। সস্যল (endospermic) বীজের বীজপত্র পাতলা হয় কিন্তু সস্যে এসব বীজের খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং বীজপত্রের মাধ্যমে সস্য থেকে ভ্রূণ খাদ্য সংগ্রহ করে। চারাগাছের নিজস্ব খাদ্য তৈরির ক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত বীজপত্র কিংবা সস্য অঙ্কুরোদ্গমরত চারাগাছের খাদ্য সরবরাহ করে।

অঙ্কুরোদ্গমের শ্রেণিবিভাগ

অঙ্কুরোদ্গম তিন প্রকারের। যথা, মৃৎগত (hypogeal), মৃৎভেদী (epigeal) এবং জরায়ুজ (viviparous)।

মৃৎগত অঙ্কুরোদ্গম : এক্ষেত্রে বীজপত্র মৃত্তিকার নিচে বীজাবরণের ভিতরে থাকে। এতে বীজপত্রাধিকাণ্ড (epicotyl) বীজপত্রাবকাণ্ড (hypocotyl) অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণমুকুলকে মৃত্তিকার উপরে নিয়ে আসে। ছোলা, আম, গম প্রভৃতি উদ্ভিদে মৃৎগত অঙ্কুরোদ্গম হয়।

মৃৎভেদী অঙ্কুরোদ্গম : এ প্রকার অঙ্কুরোদ্গম বীজপত্র বীজাবরণ থেকে বের হয়ে মৃত্তিকার উপরে চলে আসে। বীজপত্র মৃত্তিকার উপরে আসে বলে একে মৃৎভেদী বলে। বীজপত্র সবুজ রঙের পাতার মতো হয় এবং এতে সালোকসংশ্লেষণ কার্য চলে। তেঁতুল, কুমড়া, শিম ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার অঙ্কুরোদগম হয়।

জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম : এক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতালাভের পর কোনো বিরাম পর্যায়ে না গিয়েই বৃদ্ধি লাভ শুরু করে। বীজপত্রাবকাণ্ড অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণমূলকে ফলের বাইরে নিয়ে যায়, ভ্রূণমুকুলও সামান্য বৃদ্ধি পায়, তবে বীজপত্র ফলের মধ্যেই থাকে এবং এটি ভ্রূণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। ফল মাতৃ-উদ্ভিদে লেগে থাকা অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় বলে, একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম বলে। *Rhizophora, Sonneratia, Heritiera* প্রভৃতি উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম হয়।

কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজের পরিপূর্ণতা লাভের পরপরই অঙ্কুরোদ্গম হয়। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পরিপূর্ণতা লাভের পরও কিছু সময়ের

প্রয়োজন হয়। একে পরিপূর্ণতার পরবর্তী সময় (afterripening period) বলে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য এ সময়ও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের প্রভাবক

বীজের অঙ্কুরোদ্গম নিম্নলিখিত প্রভাবক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সফল অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পরিমিত পরিমাণ প্রভাবক এবং সময় মতো এদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। প্রভাবকগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. পানি : খাদ্যশস্যের বীজ গুদামজাত করার পূর্বে ভালভাবে শুকিয়ে রাখা হয়। বীজে পানির পরিমাণ যতো কম থাকবে, বীজও বেশিদিন ভাল থাকবে এবং এসব বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজের অঙ্কুরোদ্গমে পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পানি পরিশোষণ করে বীজ ফুলে উঠে, এরফলে বীজাবরণ নরম হয় এবং বায়বীয় পদার্থের চলাচলের পথ সুগম হয়। শুষ্ক বীজে পানির পরিমাণ খুবই কম থাকায় এনজাইমসমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে। তাই পরিমিত পানি পাওয়ার পর বীজের কোষগুলো সক্রিয় হয় এবং নানা প্রকার বিপাকীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া অতি দ্রুত চলতে থাকে। অঙ্কুরোদ্গমিত বীজের শ্বসনের হার অত্যধিক। শ্বসনের ফলেই বীজপত্রে অথবা সস্যে সঞ্চিত খাদ্য ভেঙে শক্তি নির্গত হয় এবং এ শক্তি অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। পানি ছাড়াও পরিমিত তাপমাত্রা ও অক্সিজেন সরবরাহ এবং কোন কোনো বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য আলোর বিশেষ প্রয়োজন।

২. পরিমিত তাপমাত্রা : বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পরিমিত তাপমাত্রার প্রয়োজন। এনজাইমের কার্যকারিতা তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খুব কম অথবা খুব বেশি তাপে এনজাইমের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই সব উদ্ভিদ প্রজাতির বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য সর্বনিম্ন (minimal) ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্দিষ্ট আছে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার মধ্যবর্তী তাপমাত্রায় অঙ্কুরোদ্গম সবচেয়ে ভাল হয়, এ তাপমাত্রাকে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য সর্বোত্তম (optimum) তাপমাত্রা বলা হয়। সারণি ৮.১-এ কতিপয় উদ্ভিদ প্রজাতির সর্বনিম্ন, সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮.১ : বীজের অঙ্কুরোদ্গমে তাপমাত্রার পরিসর

বীজ	তাপমাত্রা (°সেলসিয়াস)		
	সর্বনিম্ন	সর্বোত্তম	সর্বোচ্চ
Oryza sativa	১০–১২	৩০–৩৭	৪০–৪২
Triticum aestivum	৩–৫	১৫–৩১	৩০–৪৩
Hordeum sativum	৩–৫	১৯–২৭	৩০–৪০
Zea mays	৮–১০	৩২–৩৫	৪০–৪৪
Cucumis melo	১০–১৯	৩০–৪০	৪৫–৫০
Lepidium drabe	০.৫–৩	২০–৩৫	৩৫–৪০

সারণি ৮.১-এ প্রদত্ত সর্বনিম্ন, সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রা অবস্থায় সংগৃহীত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে বীজ সাধারণত অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রা না পেয়ে উচ্চ এবং নিম্ন একান্তর (alternate) তাপমাত্রা পায়। দিন-রাত্রি চক্রে ক্রমিক তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়।

কেন কতিপয় বীজের নিম্নতাপে অঙ্কুরোদ্গম হয়, আবার কোনো কোনো বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য উচ্চতাপের প্রয়োজন এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং ধারণা করা হয় যে, একটি বা একাধিক প্রক্রিয়া তাপমাত্রা-সংবেদনশীল। অল্প সময়ের জন্য হলেও শৈত্য প্রদানে লিমা বীনের বীজের অঙ্কুরোদ্গম বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, পানি ইমবাইবিশনের সময় শৈত্যের প্রভাব পরবর্তী সময়েও থেকে যায়।

সাম্প্রতিককালে তুলাবীজের (শৈত্য সংবেদনশীল বীজ) অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষার ফলাফল থেকে বীজের প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর উপর নিম্নতাপের প্রভাব সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া গেছে। তুলা বীজে প্রচুর পরিমাণ লিপিড থাকে, অঙ্কুরোদ্গমের সময় লিপিড ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং পরিশেষে গ্লাইঅক্সালেট চক্রের মাধ্যমে শর্করাতে পরিণত হয়। গ্লাইঅক্সালেট চক্রের এনজাইমগুলো গ্লাইঅক্সিজোম নামক কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গের (organelle) ভিতরে থাকে। এ চক্রে আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড (TCA চক্র থেকে প্রাপ্ত) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড লায়েজ (lyase) এনজাইমের উপস্থিতিতে গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড এবং সাকসিনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ম্যালেট সিনথেটেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে গ্লাইঅক্সাইলিক অ্যাসিডের সাথে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A (লিপিড ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট) যুক্ত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিড তৈরি হয়। ম্যালিক অ্যাসিড থেকে অক্সালোঅ্যাসিটিক তৈরির ফলে গ্লাইঅক্সালেট চক্র সম্পূর্ণ হয়।

গ্লাইঅক্সিজোম থেকে সাকসিনিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং মাইটোকন্ড্রিয়াতে শর্করায় পরিণত হয়। গ্লাইঅক্সালেট চক্রের দুটি প্রধান এনজাইম হলো আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড লায়েজ এবং ম্যালেট সিনথেটেজ। অঙ্কুরোদ্গমিত তুলা বীজকে ৫ থেকে ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখলে আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড লায়েজ এর কার্যকারিতা কমে যায়। নিম্নতাপে অবশ্য ম্যালেট সিনথেটেজ-এর কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। নিম্নতাপে লিপিড শর্করায় পরিণত হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে অঙ্কুরোদ্গম বিঘ্নিত হয়। নিম্নতাপ সরাসরি আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড লায়েজের কার্যকারিতাকে নষ্ট করে দেয় না। বরঞ্চ নিম্নতাপে গ্লাইঅক্সিজোমের ঝিল্লির পরিবর্তনের ফলে সাকসিনিক অ্যাসিড এর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে না। সাকসিনিক অ্যাসিড গ্লাইঅক্সিজোমের মধ্যে জমা হতে থাকে এবং এটি আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড লায়েজের কার্যকারিতায় বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিম্নতাপ কোষীয় ঝিল্লির ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটায়। লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা কোষীয় ঝিল্লি গঠিত। লিপিড অংশই তাপমাত্রা দ্বারা বেশি প্রভাবান্বিত হয়। শৈত্য প্রতিরোধী উদ্ভিদ প্রজাতির ঝিল্লি ভিন্ন প্রকৃতির লিপিড দ্বারা গঠিত বলে নিম্নতাপে পরিবর্তন হয় না।

৩. **অক্সিজেন সরবরাহ :** অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজে শ্বসনের হার অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। এজন্য এসময় বীজে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন।

৪. **আলো :** অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রজাতির বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। তাই এসব বীজের অঙ্কুরোদ্গমের হার আলো ও অন্ধকারে একই রকম। আবার কতকগুলো প্রজাতির বীজে (যেমন ধুতুরা) কেবল অন্ধকারেই অঙ্কুরোদ্গম হয়, আলোর উপস্থিতিতে এদের অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

৫. **বিষাক্ত ও বৃদ্ধিরোধক পদার্থ :** অনেক রাসায়নিক পদার্থ বীজের অঙ্কুরোদ্গমকে প্রভাবান্বিত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রূণের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে অঙ্কুরোদ্গমে বিঘ্ন ঘটে। যেমন- নিম্নমাত্রায় হাইড্রোজেন সায়ানাইড বর্ধনশীল ভ্রূণকে মেরে ফেলে। কোনো কোনো ফলে অ্যামাইগডালিন (amygdalin) নামক এক প্রকার গ্লুকোসাইড থাকে যা চিনি এবং সায়ানাইড

দ্বারা গঠিত। যদি ফলের কলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে গ্লুকোসাইড এনজাইম কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সায়ানাইড এমন মাত্রায় মুক্ত হয় যা বর্ধনশীল ভ্রূণকে মেরে ফেলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ পরোক্ষভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গমকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন- বীজের সন্নিকটবর্তী উচ্চ মাত্রার লবণ (রাসায়নিক সার অথবা অজৈব লবণ) বীজে প্রচুর পরিমাণ পানি প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। অথবা ভ্রূণমূল বীজাবরণ ভেদ করে বের হলেও ভ্রূণের কলা পানির স্বল্পতাহেতু মারা যেতে পারে।

ফল, পাতা এবং মূলের নির্যাসও বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বিঘ্ন ঘটায়। যেমন- টমেটোর বীজ যতোক্ষণ ফলের মধ্যে থাকবে ততোক্ষণ অঙ্কুরোদ্গম হবে না, কিন্তু এদেরকে ফল থেকে বের করে ভাল করে ধুয়ে আর্দ্র স্থানে রাখলে অঙ্কুরোদ্গম হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতার নির্যাস অপর উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দেয়। এসব নির্যাস থেকে বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব অণু পৃথক করা হয়েছে। অ্যালকালয়েড, উদ্বায়ী তেল, অ্যামাইনো অ্যাসিড, কুমারিন (coumarin), মাস্টার্ড তেল ইত্যাদি হলো জটিল জৈব অণু। কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থও বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই অঙ্কুরোদ্গমিত বীজকে এসব পদার্থ থেকে দূরে রাখতে হবে।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় অঙ্গসংস্থানিক এবং প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো দৃষ্ট হয়—

(১) পানি ইমবাইবেশন, (২) উপ-কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গগুলোর পানিযোজন, (৩) ভ্রূণ এবং সস্য অথবা বীজপত্রের উপ-কোষীয় সংগঠনের পরিবর্তন, ফাইটোক্রোমের কার্যকারিতার পরিবর্তন, (৫) এনজাইমসমূহের সক্রিয়ন, (৬) সঞ্চিত খাদ্যের ভাঙন, (৭) দ্রবণীয় জৈব অণুর ভ্রূণে স্থানান্তর, (৮) প্রোটিন এবং কোষের অন্যান্য গাঠনিক উপাদানের সংশ্লেষণ, (৯) অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ এবং শ্বসনের হার বৃদ্ধি, (১০) কোষের দীর্ঘীকরণ, (১১) কোষ বিভাজন, (১২ বৃদ্ধিকর দ্রব্যের সংশ্লেষণ অথবা সক্রিয়ন, (১৩) ভ্রূণে বিপাকীয় বস্তুর পুনর্বণ্টন এবং (১৪) অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রার পরিবর্তন। এটি সুস্পষ্ট যে, পানি ইমবাইবেশনের পর বীজে অনেকগুলো শারীরতাত্ত্বিক এবং প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজাবরণের বিদীর্ণকরণ এবং মূল ও কাণ্ডের বহিঃপ্রসারণ হুবহু এক রকম না হলেও, এদের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য আছে। নিচে ভুট্টা বীজের অঙ্কুরোদ্গমের বিভিন্ন ধাপগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো।

ভুট্টা বীজের অঙ্কুরোদ্গমে অঙ্গসংস্থানিক ধাপ

ভুট্টা বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও চারাগাছ অভ্যুদয়ের সময় বিভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক ধাপগুলো চিত্র ৮.১-এ দেখানো হয়েছে। একটি ভ্রূণমূল ও একটি ভ্রূণ মুকুল দ্বারা ভুট্টার ভ্রূণাক্ষ গঠিত। ভ্রূণমূলের নিম্নাংশ ভ্রূণমূলাবরণী (coleorhiza) দ্বারা আবৃত থাকে, বীজাবরণ বিদীর্ণ করার সময় এটি ভ্রূণমূলের অগ্রভাগকে রক্ষা করে। ভ্রূণমূল থেকে একটি প্রধান মূলতন্ত্র গঠিত হয়, কিন্তু এটি শিঘ্রই নষ্ট হয়ে যায় এবং কাণ্ডের গোড়ার পর্বসন্ধি থেকে অস্থানিক মূল তৈরি হয়। ভ্রূণমুকুলাবরণীর (coleoptile) মধ্যে ভ্রূণমুকুল আবৃত থাকে, এটা বীজাবরণ বিদীর্ণ ও মৃত্তিকা ভেদ করার সময় ভ্রূণমুকুলকে রক্ষা করে। পরিশেষে ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভুট্টায় একটি বীজপত্র থাকে যা রূপান্তরিত হয়ে স্কুটেলাম (scutellum) গঠন করে। অঙ্কুরোদ্গমের সময় স্কুটেলামের কোষগুলো বিপাকীয়ভাবে বেশ সক্রিয় হয় এবং সস্য থেকে খাদ্যবস্তু বর্ধনশীল ভ্রূণাক্ষে স্থানান্তরে সহায়তা করে।

ভুট্টার সস্য প্রধানত শ্বেতসারপূর্ণ কোষ দ্বারা গঠিত, তবে অসংখ্য প্রোটিনসমৃদ্ধ কোষও এতে থাকে। কয়েকটি অ্যালিউরোন স্তর (aleurone layer) দ্বারা সস্য কোষ আবৃত থাকে, এতে অঙ্কুরোদ্গমের প্রাথমিক পর্যায়ে এনজাইম সংশ্লেষণ হয়। স্কুটেলাম এবং অ্যালিউরোন স্তরের এনজাইমগুলো সস্যে সঞ্চিত খাদ্যবস্তুকে দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করে যা বর্ধনশীল ভ্রূণাক্ষ ব্যবহার করে।

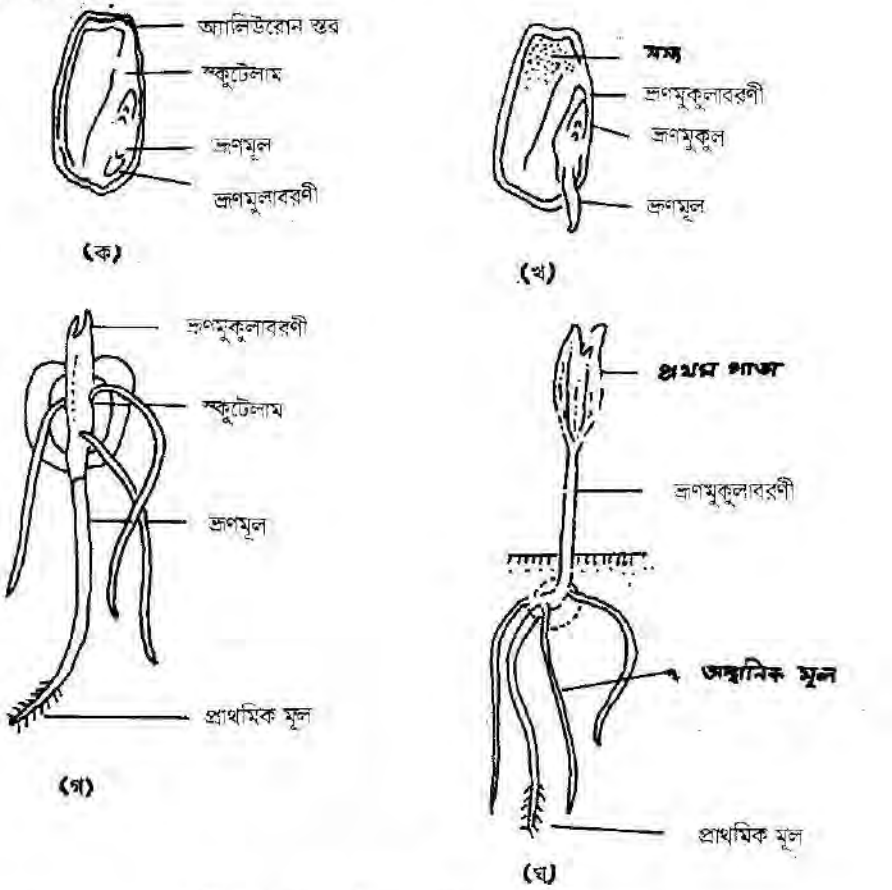

চিত্র ৮.১ : ভুট্টার বীজের অঙ্কুরোদ্গমের বিভিন্ন ধাপ

ভুট্টার বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় রাসায়নিক পরিবর্তন

ভুট্টার দানা কক্ষ তাপমাত্রায় পানিতে রাখলে দানার কণাগুলো পানি ইমবাইব করে স্ফীত হয়। আবরণ প্রথম পানি ইমবাইব করে এবং তারপরে ভ্রূণ ও সস্য ইমবাইব করে। অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরোদ্গমের পানি ইমবাইবেশন পর্যায় প্রায় বারো ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। পানি ইমবাইব করে ভ্রূণমুকুলাবরণীর আকার বৃদ্ধি পায় এবং পানি ইমবাইবেশনের শুরুর প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টার মধ্যে ভ্রূণমূলাবরণী বীজাবরণ বিদীর্ণ করে। কয়েক ঘণ্টা পরে ভ্রূণমূল নির্গত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অনুকূল পরিবেশে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ভুট্টার বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্পূর্ণ হয়।

ভ্রূণমূল নির্গত হওয়ার পর প্রধান সঞ্চিত খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। সাধারণত পানি ইমবাইবেশনের ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাসায়নিক সংগঠনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কুরোদ্গমের প্রথম থেকেই সস্যের শুষ্ক ওজন কমতে থাকে, তবে পানি ইমবাইবেশনের ৭২ ঘন্টা পর সবচেয়ে বেশি ওজন কমে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে সস্য থেকে স্নেহপদার্থ এবং শ্বেতসারের পরিমাণ কমে যায়। ভ্রূণমূল নির্গত না হওয়া পর্যন্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

ভ্রূণমূল নির্গত হওয়ার পর (অঙ্কুরোদ্গমের সমাপ্তি হয়) সস্য, স্কুটেলাম, অ্যালিউরোন স্তর এবং ভ্রূণাক্ষের মধ্যে বিপাকীয় বস্তুর পুনর্বন্টন হয়। এ সময় শ্বেতসার, প্রোটিন এবং লিপিড ভেঙে দ্রবণীয় বস্তু, যেমন– চিনি, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অজৈব ফসফেট, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়াম আয়নে পরিণত হয়। এ বিপাকীয় বস্তুগুলো ভ্রূণাক্ষে স্থানান্তরিত হয়ে চারাগাছের বৃদ্ধি সাধন করে।

ভ্রূণমূল নির্গত হওয়ার পর (পানি ইমবাইবেশনের ২৪ ঘন্টা পর) প্রধান রাসায়নিক সংগঠনের পরিবর্তন হলেও, পানি ইমবাইবেশনের ১/৩ ঘন্টার মধ্যেই এনজাইমের কার্যকারিতা শুরু হয়। সম্ভবত এ এনজাইমগুলো বীজের পরিপক্বতার সময় তৈরি হয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। পানি ইমবাইবেশনের ৫/৬ ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত এনজাইমের সংশ্লেষণ হয়।

বীজের সুপ্তাবস্থা

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের প্রয়োজনীয় প্রভাবকসমূহের উপস্থিতিতেও কোনো কোনো পরিপক্ব, রোগমুক্ত ও জীবন্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজের অভ্যন্তরস্থ প্রতিকূল অবস্থার কারণেই এরকম বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজের অভ্যন্তরীণ অবস্থাগত কারণে অঙ্কুরোদ্গম না হওয়াকে বীজের সুপ্তাবস্থা বলে এবং এ বীজকে সুপ্ত (dormant) বীজ বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পরিমিত পানি, অক্সিজেন ও তাপমাত্রা সত্ত্বেও সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। অপরপক্ষে, অপরিমিত পানি সরবরাহ, স্বল্প মাত্রায় অক্সিজেন এবং প্রতিকূল তাপমাত্রা ইত্যাদি বাহ্যিক কারণেও বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এরূপ অবস্থাকে 'কুইসেন্স' (quiscence) এবং এরূপ বীজকে কুইসেন্স বীজ বলে।

কোনো কোনো বীজ বহুদিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় থাকে, আবার কতকগুলো বীজে সুপ্তাবস্থা মাঝারী ধরনের হয় এবং আর কিছু বীজ আছে যাদের সুপ্তাবস্থা মোটেই নেই। লেগুমিনেসি গোত্রের কিছু কিছু উদ্ভিদের এবং কোনো কোনো আগাছার বীজ ৫০ থেকে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে।

বীজের সুপ্তাবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা

বীজের সুপ্তাবস্থা এর অঙ্কুরোদ্গমে বাধা সৃষ্টি করলেও তা একেবারে নিরর্থক নয়, ব্যবহারিক দিক থেকে এর কিছু মূল্য ও গুরুত্ব আছে। আর এ প্রয়োজনে কোনো কোনো বীজে সুপ্তাবস্থা কৃত্রিম উপায়েও সৃষ্টি করা যায়। কোনো কোনো খাদ্যশস্যের বীজ কিছুদিন সুপ্তাবস্থায় থাকে এর জন্য মাঠ থেকে সংগ্রহ করা, গুদামজাত করা এবং পরবর্তীকালে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা বেশ সুবিধাজনক। এরকম না হলে এসব শস্যের বীজ মাঠে থাকতেই অঙ্কুরোদ্গম হয়ে মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তো। গোলআলু, মিষ্টি আলু ও পিঁয়াজ যতোদিন চারা না গজায় ততোদিনই ব্যবহারোপযোগী থাকে। একবার চারা গজানো শুরু হলে সেগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এদের সুপ্তাবস্থা ৪ থেকে ৬ মাসের

বেশি নয়। তাই আজকাল হরমোন ও আণবিক রশ্মি প্রয়োগ করে এদের সুপ্তাবস্থা বাড়িয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ খাবারের উপযোগী রাখা হয়।

যে বীজের সুপ্তাবস্থা যতো বেশি সে বীজের আকারও ততো বেশি। তাই সুপ্ত বীজ সংরক্ষণ করতে বিপদের ঝুঁকি কম। সুপ্ত বীজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো খুব সুবিধাজনক। এতে বীজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা খুব কম।

কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজ প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্তাবস্থায় থাকে, কিন্তু অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে জীবন-চক্র সমাপ্ত করে। এরকম না হলে অনেক উদ্ভিদ প্রজাতিই আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যেতো।

অঙ্কুরোদ্গমে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়াও বীজের সুপ্তাবস্থার আরো কিছু অসুবিধা আছে। কতকগুলো আগাছার বীজ মৃত্তিকায় অনেকদিন সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। কর্ষণের সময় এ জাতীয় অনেক বীজের সুপ্তাবস্থা ভেঙে যায় এবং অঙ্কুরোদ্গম হয়ে ঐ জমিতে বপন করা অর্থকরী ফসলের সাথে খাদ্য, পানি ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতা করে। যেসব আগাছার বীজ অঙ্কুরোদ্গম হয়ে চারাগাছে পরিণত হয়, কেবল তাদেরকে নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু যেগুলো সুপ্তাবস্থায় মৃত্তিকায় থাকে তাদের নির্মূল সম্ভব নয়। তাই প্রতি বছরই কৃষকদের একই সমস্যায় পড়তে হয়।

বীজের সুপ্তাবস্থার কারণ

বীজের সুপ্তাবস্থা নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে : (১) বীজাবরণের অভেদ্যতার জন্য বীজে পানি প্রবেশ না করা, (২) বীজাবরণের অভেদ্যতার জন্য বায়বীয় পদার্থ প্রবেশ করতে না পারা, (৩) বীজাবরণ কর্তৃক ভ্রূণের বৃদ্ধি রোধের জন্য, (৪) অপরিপক্ব ভ্রূণের জন্য, (৫) সুপ্ত ভ্রূণের জন্য এবং (৬) অঙ্কুরোদ্গম প্রতিরোধকের জন্য।

১. বীজাবরণের অভেদ্যতার জন্য বীজে পানি প্রবেশ না করার কারণে : বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পানি খুবই প্রয়োজন। কতকগুলো উদ্ভিদের শক্ত বীজাবরণের মধ্যদিয়ে পানি বীজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও অঙ্কুরোদ্গম হয় না। লেগুমিনেসি গোত্রের অনেক উদ্ভিদে এরকম দেখা যায়। শক্ত বীজাবরণ ছাড়াও অনেক উদ্ভিদের বীজাবরণের চতুর্দিকে মোমযুক্ত আবরণ থাকে। শক্ত বীজাবরণের বৈশিষ্ট্য বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজ পক্বের সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী। যেমন- ক্লোভারের বীজ যদি গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় পক্ব হয়, তবে বীজাবরণ শক্ত হয় কিন্তু ভেজা আবহাওয়ায় পক্ব হলে বীজাবরণ নরম হয়। কোনো কোনো লেগুম বীজের কেবল হাইলাম (hilum) অংশ দিয়ে বীজে পানি প্রবেশ করে। হাইলামের পার্শ্ববর্তী পানিগ্রাহী (hygroscopic) কলা এ বীজে পানি প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন এ পানিগ্রাহী কলা ফুলে যায়, ফলে হাইলাম ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়, তাই বীজে পানি প্রবেশ করতে পারে না।

২. বীজাবরণের অভেদ্যতার জন্য বায়বীয় পদার্থ প্রবেশ না করার কারণে : অনেক বীজের বীজাবরণের মধ্যদিয়ে পানি প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বায়বীয় পদার্থ প্রবেশ করতে পারে না। *Xanthium caudense* উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গম পদ্ধতি, বীজাবরণের অভেদ্যতার জন্য বীজের অভ্যন্তরে অক্সিজেন প্রবেশ করতে না পারার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ উদ্ভিদের ফলে দুটি বীজ হয়। উপরের বীজ অপেক্ষা নিচের বীজের অনেক আগে অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্রোকার (Crocker) লক্ষ্য করেন যে, দুটি বীজের মধ্যেই পানি প্রবেশ করতে পারে এবং স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিচের বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। কিন্তু উপরের বীজের এ অবস্থায় অঙ্কুরোদ্গম হয় না, যদি এর বীজাবরণ ভেঙে দেয়া না হয় অথবা খুলে ফেলা না হয়। উক্ত বীজটি বেশি পরিমাণ অক্সিজেনের মধ্যে রাখলে এর অঙ্কুরোদ্গম অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। অল্প পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ বীজের বিপাকক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় বলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, অথবা অধিক পরিমাণে অক্সিজেন অঙ্কুরোদ্গমে অন্যভাবে সহায়তা করে তা সুস্পষ্ট নয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়ারিং এবং ফোদা (Wareing and Foda) দাবি করেন যে, *Xanthium*-এর উপরের বীজে এক প্রকারের অঙ্কুরোদ্গম প্রতিরোধক পদার্থ থাকে যা অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে অঙ্কুরোদ্গম হয়। বীজাবরণ অক্সিজেন অভেদ্য হওয়ার জন্য কতকগুলো ঘাসের বীজ এবং কম্পোজিটি গোত্রের অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

৩. বীজাবরণ কর্তৃক ভ্রূণের বৃদ্ধি রোধের কারণে : বীজাবরণ পানি এবং অক্সিজেনে ভেদ্য হলেও কোনো কোনো বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। যেমন- *Amaranthus retroflexus* উদ্ভিদের বীজাবরণ পানিও অক্সিজেনে ভেদ্য, কিন্তু এ বীজাবরণ বেশ শক্ত হওয়ায় ভ্রূণের বৃদ্ধি রোধ করে। ফলে ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল বাইরে আসতে পারে না বলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এই উদ্ভিদের বীজাবরণ যতোদিন পর্যন্ত পানিতে সম্পৃক্ত থাকে ততোদিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং সুপ্তাবস্থার সময়কাল ৩০ বছর কিংবা আরো বেশি হতে পারে। বীজাবরণ শুষ্ক হলে বীজাবরণের কোষপ্রাচীরের কলেয়ডীয় উপাদানগুলোর পরিবর্তন হয়। এরপর বীজ পানিতে সম্পৃক্ত হলে, ভ্রূণের ইমবাইবেশনাল চাপকে আর কোষপ্রাচীর বাধা দিতে পারে না তাই বীজাবরণ ভেঙে যায় এবং অঙ্কুরোদ্গম হয়।

অনেক আগাছার বীজে এ ধরনের সুপ্তাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় বরফ জমাট বাঁধা অথবা গলন, অনুজীবের আক্রমণ, প্রাণীর খাদ্যনালির ভিতর দিয়ে প্রবেশ অথবা আলো এবং তাপমাত্রার জন্য এসব বীজের বীজাবরণ দুর্বল হয়ে যায় বলে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

৪. অপক্ব ভ্রূণের কারণে : অনেক উদ্ভিদের বীজ আপাতভাবে পরিপক্ব মনে হলেও এর অঙ্কুরোদ্গম হয় না। ভ্রূণের বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকার জন্য এরকম হয়। ভ্রূণের পরিপূর্ণতার পরেই এ বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এর সময়কাল *Caltha palustris*-এ প্রায় ১০ দিন থেকে *Fraxinus excelsior*-এ কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। খনিজ মৌল এবং চিনি সরবরাহ করলে অথবা কিছুটা উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে এই বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা যায়। এটি অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে অথবা চলাকালীন হতে পারে। অপরিপক্ব ভ্রূণের জন্য সুপ্তাবস্থা দেখা যায় *Anemone nemorosa, Caltha palustris, Ficaria verna, Fraxinus excelsior, Ginkgo biloba, Gnetum gnemon* এবং অর্কিডেসি ও অরোব্যাঙ্কেসি গোত্রের অনেক উদ্ভিদে।

৫. সুপ্ত ভ্রূণের কারণে : অনেক উদ্ভিদের বীজের পরিপক্বতা লাভের পরপরই অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তবে কিছুদিন পর স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এদের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এ সময়কে পরিপূর্ণতার পরবর্তী সময় (after ripening period) বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির এ সময় বিভিন্ন হয়। কোনো কোনো বীজের এ সময় কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে ধারণা করা হয় যে, পরিপূর্ণতার পরবর্তী সময়ে ভ্রূণে শারীরবৃত্তীয় নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়, এরফলে ভ্রূণ অঙ্কুরোদ্গমের যোগ্যতা লাভ করে। তবে এই শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত এটি বিপাকীয় প্রকৃতির নয়, কেননা

এটি সংঘটিত হয় শুষ্ক বীজে, যখন খুবই কম মাত্রায় বিপাকক্রিয়া হয়। আপেল, পাইন, টিউলিপ প্রভৃতি উদ্ভিদে সুপ্ত ভ্রূণ দেখা যায়।

৬. অঙ্কুরোদ্গম প্রতিরোধকের জন্য : কোনো কোনো রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম বাধাপ্রাপ্ত হয়। সাধারণত যেসমস্ত রাসায়নিক পদার্থ জীবন্ত উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক, তা আবার অঙ্কুরোদ্গমরোধক হিসেবে কাজ করে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে বীজকে মেরে ফেলে। উচ্চ অসমোটিক চাপসম্পন্ন দ্রবণে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। যে সমস্ত যৌগ অসমোটিকরোধক হিসেবে কাজ করে তা হলো অজৈব লবণ (যেমন- সোডিয়াম ক্লোরাইড), চিনি অথবা অন্যান্য পদার্থ।

যেসব যৌগ কতিপয় বিপাকীয় গতিপথকে প্রভাবিত করে তা হলো অপর এক প্রকার অঙ্কুরোদ্গমরোধক। কেননা বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্কুরোদ্গমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এরকম যৌগের উদাহরণ হলো বিভিন্ন প্রকার শ্বসনরোধক, যেমন- অ্যাজাইড, সায়ানাইড, ডাইনাইট্রোফেনল, ফ্লোরাইড, হাইড্রোঅক্সালঅ্যামিন এবং অন্যান্য যৌগ।

সাধারণত উচ্চ ঘনমাত্রায় অক্সিন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিব্বারেলিনও অঙ্কুরোদ্গম বোধ করে। টমেটোর রস টমেটো এবং অন্যান্য অনেক বীজের অঙ্কুরোদ্গমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অ্যালডিহাইড, অ্যালকলয়ড, অ্যামোনিয়া-নির্গতকারী পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড, ফেনল, অসম্পৃক্ত ল্যাকটোন, বিশেষ করে কুমারিন, পারঅ্যাসকরবিক অ্যাসিড, প্রোটোঅ্যানিমোনিন ও মাস্টার্ড তেল অঙ্কুরোদ্গমরোধক হিসেবে কাজ করে বলে মনে করা হয়।

প্রাকৃতিক অঙ্কুরোদ্গমরোধক উদ্ভিদের এক বা একাধিক অঙ্গে থাকতে পারে। অনেক ঘাসের গুমে, রসালো ফলের রস কিংবা পাম্পে এবং অনেক প্রজাতির টেস্টা, ভ্রূণ এবং সস্যে এই পদার্থগুলো থাকে। কেবল বীজ এবং ফলেই এই রোধকগুলো থাকে না। মূল, পাতা এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে থাকে।

বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের পদ্ধতি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের সুপ্তাবস্থা সহায়ক হলেও অর্থকরী ফসলের বীজের সুপ্তাবস্থা একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের নানা প্রকার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তবে কোনো বিশেষ শ্রেণির সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের জন্য কোনো এক বিশেষ পদ্ধতি কার্যকরী হয়। নিচে বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

১. স্ক্যারিফিকেশন (Scarification) : বীজাবরণের অভেদ্যতার জন্য বীজে পানি অথবা অক্সিজেন প্রবেশ করতে না পারলে অথবা শক্ত বীজাবরণ কর্তৃক ভ্রূণের বৃদ্ধিরোধের জন্য সুপ্তাবস্থা হলে স্ক্যারিফিকেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভেদ্য বীজাবরণ পানি ও অক্সিজেনে ভেদ্য হয় অথবা বীজাবরণকে দুর্বল করে দেয়, তাকে স্ক্যারিফিকেশন বলে। এটি প্রধানত দুপ্রকারের হতে পারে : (ক) যান্ত্রিক (mechanical) এবং (খ) রাসায়নিক (chemical)।

ক. যান্ত্রিক : এ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শক্ত বীজাবরণ আঁচড়ানো, ফাটানো অথবা নরম করা হয়। বালি অথবা অন্য কোনো অমসৃণ বস্তু দিয়ে বীজ ঘষা হয়, অথবা ধারাল চাকু দিয়ে বীজাবরণে দাগকাটা, আঁচড়ানো কিংবা ফুটো করা হয়।

খ. রাসায়নিক : কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসায়নিক স্ক্যারিফিকেশনও বেশ কার্যকর হয়। বীজকে ঘন অ্যাসিডে (যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড) জৈব-দ্রবণে (যেমন অ্যাসিটোন, ইথাইল অ্যালকোহল) ডুবিয়ে সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করা যায়। এগুলো বীজাবরণকে দুর্বল করে দেয়।

২. **স্ট্রাটিফিকেশন** (stratification) : এ পদ্ধতি প্রয়োগে সুপ্ত ভ্রূণের পরিপূর্ণতার পরবর্তী সময়কালকে কমিয়ে আনা যায়। নিম্ন তাপমাত্রা এবং আর্দ্র অবস্থায় বীজকে রাখলে এ সয়মকালের পরিসর দ্রুত কমে যায়।

৩. **একান্তর তাপমাত্রা** (Alternate temperature) : কোনো কোনো ক্ষেত্রে একান্তর তাপমাত্রা প্রয়োগ করে বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করা যায়। *Holgus helepensia* নামক এক প্রকার ঘাসের বীজে প্রথম ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা ২০° সেলসিয়াস এবং পরের ৬ থেকে ৮ ঘন্টা ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োগ করায় এদের অঙ্কুরোদ্গমের হার বেড়ে যায়।

৪. **হরমোন** : জিব্বারেলিন নামক উদ্ভিদ হরমোন প্রয়োগ করে কোনো কোনো বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করা যায়।

৫. **আলো** : বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিতে অঙ্কুরোদ্গমের উপর আলোর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। বীজের অঙ্কুরোদ্গমে আলোর প্রভাবের উপর ভিত্তি করে বীজকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (ক) বীজকে মাত্র একবার আলোকপাত করলেই অঙ্কুরোদ্গম হয় [ধনাত্মক ফটোব্লাসটিক (positive photoblastic) বীজ]। আলোর প্রখরতার উপর ভিত্তি করে এ একবার আলোকপাতের সময়সীমা কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে। (খ) আলোর উপস্থিতিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম বাধা প্রাপ্ত হয় (ঋণাত্মক ফটোব্লাসটিক বীজ) এসব বীজের সর্বোচ্চ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারের প্রয়োজন হয়। (গ) অন্ধকার ও আলোকে একই রকম অঙ্কুরোদগম হয় (ননফটোব্লাসটিক বীজ)।

ফাইটোক্রোমের মাধ্যমে অঙ্কুরোদ্গমের উপর আলোর প্রভাব কার্যকরী হয়। কতকগুলো প্রভাবক যেমন- তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব, বীজের বয়স, বীজ পরিপক্কের সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আলোর প্রখরতা ও প্রকৃতির দ্বারা বীজস্থ ফাইটোক্রোম পরিবর্তিত হয়।

লাল অথবা অতিলাল আলো প্রয়োগে ফাইটোক্রোম কেবল Pr অথবা Pfr অবস্থায় থাকে না। ফাইটোক্রোমে লাল আলো (৬৬০ ন্যানোমিটার) প্রদান করলে ৮১% Pfr এবং ১৯% Pr অবস্থা হয়। অতিলাল আলো (৭২০ ন্যানোমিটার) প্রদানের ফলে ৯৮% Pr এবং ২% Pfr অবস্থায় ফাইটোক্রোম থাকে। সূর্যালোকের প্রভাবে ভূমির সমতলে Pr/Pfr অনুপাত দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হয়। অন্ধকারে আস্তে আস্তে pfr অবস্থা Pr অবস্থায় পরিণত হয়। অন্ধকারে Pr অবস্থাও আস্তে আস্তে Pfr অবস্থায় পরিণত হয়। ফাইটোক্রোমের সংশ্লেষণের সময় Pr অবস্থা তৈরি হয়। পরিশেষে Pfr.X যৌগ তৈরি না হলে Pfr নষ্ট অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। Pfr.X অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা করে। ধনাত্মক ফটোব্লাসটিক বীজে (যেমন- গ্র্যান্ড র‍্যাপিড্স জাতের লেটুস, *Chenopodium rubrum, Pinus taeda* ইত্যাদি) একবার মাত্র সাদা আলো প্রদান করলে *Pfr. X* এমন সন্তোষজনক মাত্রায় থাকে যা অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা করে। যদি উপযুক্ত Pfr. X/Pr অনুপাত না হয়, তাহলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম না হয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

ননফটোব্লাসটিক বীজ (যেমন, টমেটো, শসা ইত্যাদি) আলোতে সংবেদনশীল নয়, তাই এর আলো ও অন্ধকার উভয় অবস্থাতেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। ধারণা করা হয় যে, উপযুক্ত অনুপাতে Pfr. X/Pr এসব বীজে থাকে এবং Pr কে Pfr তে পরিণত হওয়ার জন্য আলোর কোনো প্রয়োজন হয় না। যদি নতুন সংশ্লেষিত ফাইটোক্রোম Pr অবস্থায় থাকলে, Pfr অবস্থায় পরিণত হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্ধকারেও Pr অবস্থা থেকে Pfr অবস্থা হতে পারে। তবে কিভাবে এটি হয় তা এখনও অজ্ঞাত।

আরেকটি সম্ভাবনা এই যে, বীজের রোদে পক্বতার সময় ফাইটোক্রোম Pfr অথবা Pfr.X অবস্থায় থাকে। বীজের পরিপক্বতার সময় উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করে ফাইটোক্রোমের রূপান্তর সাধন করা যায়। বীজ পক্বের সময় যদি বীজে পানির পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকে, তাহলে Pr/Pfr অনুপাত একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এসে দাঁড়ায়। তারপর শুষ্ক বীজ যখন পানি শোষণ করে, তখন ফাইটোক্রোম পানিযোজিত হয় এবং যদি Pfr অথবা Pfr. X উপযুক্ত মাত্রায় থাকে তাহলে এটি অঙ্কুরোদ্গম সূচনা করে।

পরিশেষে, ঋণাত্মক ফটোব্লাস্টিক বীজের সাদা আলোতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য এদের অন্ধকারের প্রয়োজন হয়; অন্যান্য বীজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার Pfr এসব বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা করে। কতিপয় প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্ধকারে নিম্ন মাত্রার Pfr বজায় থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বীজের সুপ্তাবস্থা ও অঙ্কুরোদ্গমে ফাইটোক্রোম অংশগ্রহণ করে, তবে কি পদ্ধতিতে এটি কাজ করে তা এখনও ভালভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

বীজের জীবনীশক্তি ও আয়ুষ্কাল

বীজের সজীব অবস্থাকেই এর জীবনীশক্তি বলে। যে বীজের জীবনীশক্তি লোপ পায় তার অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়।

বীজের জীবনীশক্তির উপরই তার আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। যদি কোনো বীজ এক বৎসর পর্যন্ত সজীব থাকে, তাহলে সে বীজের আয়ুষ্কাল ১ বৎসর। অনুরূপভাবে কোনো বীজের আয়ুষ্কাল ২ বৎসর, ৩ বৎসর, ৪ বৎসর অথবা ততোধিক হতে পারে। সাধারণত শস্যবীজের আয়ুষ্কাল বনজ গাছ, ঘাস ও আগাছার বীজের আয়ুষ্কালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। জানা গেছে যে, শস্যবীজের আয়ুষ্কাল ৩ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত হয়। তবে সুষ্ঠুভাবে গুদামজাত করলে গমের বীজ ৬ থেকে ৩২ বৎসর, জই-এর বীজ ৬ থেকে ২৯ বৎসর, যব ২ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

আমাদের দেশে চাষীর ঘরে রক্ষিত ধান, পাট, গম প্রভৃতি মেঠো ফসলের বীজের আয়ুষ্কাল বছর খানেকের বেশি হয় না। চাষীর ঘরে রক্ষিত এসব বীজের স্বল্পায়ুর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বীজ সংরক্ষণকালে উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। যে কোনো বীজে জীবনীশক্তি বজায় থাকাটা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, বীজে কতোটা জলীয় অংশ আছে এবং বীজ কি রকম আধারে রাখা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

বীজের জীবনীশক্তি ও আয়ুষ্কাল নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত প্রভাবক কাজ করে–

১. **তাপমাত্রা ও বীজে জলীয় অংশ :** বীজের জীবনীশক্তির উপর প্রভাব বিস্তারে এ দুটি উপকরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, অধিক জলীয় অংশযুক্ত বীজ অধিক তাপমাত্রায় গুদামজাত করলে সহজেই এর জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, শতকরা ১৮ ভাগ জলীয় অংশযুক্ত সয়াবিনের বীজ ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গুদামজাত করলে এক মাসের মধ্যে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে, আর যে বীজ ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গুদামজাত করা হয় তা ২ বৎসর পর্যন্ত সজীব থাকে এবং যে বীজ ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গুদামে রাখা হয় তা ৬ বৎসর পরেও খুব অল্পমাত্রায় জীবনীশক্তি হারায়। অন্যদিকে বীজের জলীয় অংশের পরিমাণ ১৮ ভাগ থেকে ৮/৯ ভাগে কমিয়ে এনে তা ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে এক বৎসরের মধ্যে সে বীজের জীবনীশক্তি খুব অল্প

মাত্রায় হারায়। আরো কম তাপমাত্রায়, যেমন– ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রক্ষিত বীজে ১০ বৎসরের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশে বর্ষার সিক্ত আবহাওয়ায় রোদে যেভাবে বীজ শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়, তাতে বীজে তখনও বেশ পরিমাণ জলীয় অংশ থেকে যায়। ফলে সে বীজ অল্প দিনেই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।

২. **বীজাবরণ :** যে বীজের আবরণ যতো শক্ত তার জীবনীশক্তি ততো দীর্ঘস্থায়ী। এর কারণ শক্ত বীজাবরণের ভিতর দিয়ে বাইরের জলীয় অংশ সহজে বীজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ধান, পাট প্রভৃতি শস্যবীজের বীজাবরণের তুলনায় লেগুম উদ্ভিদের বীজাবরণ বেশি শক্ত, তাই এরা বেশিদিন সজীব থাকে।

৩. **বীজের পরিপক্বতা :** বীজের পরিপক্বতার উপর এর জীবনীশক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পরিপক্ব বীজে অপরিপক্ব বীজের তুলনায় জলীয় অংশ কম থাকে। এজন্যই পরিপক্ব বীজের সজীবতা অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। জানা গেছে যে, পরিপক্ব ধানের বীজে অ্যামাইলেজ নামক এনজাইমের পরিমাণ অপরিপক্ব বীজ থেকে বেশ কম থাকে। এ কারণে বীজের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ অনেকটা স্তিমিত থাকে বলে বীজের জীবনীশক্তি দীর্ঘায়িত হয়।

৪. **বায়বীয় পদার্থের আদান-প্রদান :** বীজের অভ্যন্তরে নানা প্রকার বায়বীয় পদার্থের আদান-প্রদানের উপর এর সজীবতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে অপেক্ষা বায়ুর সংস্পর্শে বীজ বেশি সময় বেঁচে থাকে। তবে সংরক্ষণের তাপমাত্রা অধিক হলে অল্প অক্সিজেনের সরবরাহ প্রায় সবরকম বীজেরই ক্ষতি করে থাকে।

৫. **বীজের সুপ্তাবস্থা :** যে বীজ সুপ্ত তা সহজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। কাজেই সুপ্ত বীজের আয়ুষ্কাল অনেক দিনের হতে পারে। তাই মটর, সিম ও তামাকের বীজ, ধান, পাট ও চীনাবাদামের বীজ থেকে অধিক দিন সজীব থাকে।

৬. **বংশগত কারণ :** বংশগত কারণেও বীজের আয়ুষ্কাল কম বেশি হয়।

৭. **জীবাণুর প্রভাব :** গুদামজাত অবস্থায় কোনো কোনো সময় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণের ফলে বীজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বীজ জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি থাকলে এ জীবাণুসমূহের আক্রমণ সহজতর হয় এবং এর ফলে বীজের জীবনীশক্তির অবলুপ্তি দ্রুততর হয়।

ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য

বীজের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে :

১. **বীজ উন্নত জাতের হবে :** আজকাল প্রায় সব ফসলেরই উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।

২. **বীজে অন্য কোনো বীজের মিশ্রণ থাকবে না :** অসাধু ব্যবসায়ীর নিকট থেকে বীজ ক্রয় করলে তাতে ঘাসের এবং অন্যান্য ফসলের বীজ মিশ্রিত থাকতে পারে। অনেক সময় চাষীর অসাবধনতাবশত বীজের মিশ্রণ হতে পারে।

৩. **বীজ পরিপক্ব, পুষ্ট, নিটোল ও সবই একই আকারের হবে :** ফসল ভালভাবে পাকার পর বীজ সংগ্রহ করলে তা পুষ্ট ও নিটোল হয়, অন্যথায় অপুষ্ট ও এবড়োথেবড়ো হয়। কোনো ফসলের সব বীজই এক আকারের হয় না, একটু আধটু ছোট বড় হওয়া খুব স্বাভাবিক। চালনি ও কুলার সাহায্যে অপুষ্ট ও ছোট আকারের বীজ পুষ্ট ও বড় আকারের বীজ থেকে পৃথক করা যায়।

৪. **বীজ কীটদ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হবে না :** বীজ ভালভাবে সংরক্ষণ না করলে অর্থাৎ বীজভাণ্ডের মুখ খোলা রাখলে, মাঝে মাঝে রোদে না দিলে অথবা গুদামঘর অপরিষ্কার রাখলে বীজ নানারকম ছত্রাক ও কীট দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রোগাক্রান্ত ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ করলে সে বীজেও রোগের জীবাণু থাকতে পারে। কাজেই রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়।

৫. **বীজ নতুন, ঝকঝকে ও দুর্গন্ধমুক্ত হবে :** সাধারণত নতুন বীজ বলতে এক বৎসরের বীজকে বোঝায়। বীজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে ঝাড়াই-মাড়াই করে ও উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হয়। বীজের জলীয় অংশের পরিমাণ যখন শতকরা ১২ থেকে ১৪ ভাগে নেমে আসে তখনই বুঝতে হবে বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে। এভাবে না শুকিয়ে অধিক পরিমাণ জলীয় অংশসহ যদি বীজ সংরক্ষণ করা হয় তাহলে বীজে সহজেই ছত্রাকের আক্রমণ হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই বীজ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে।

৬. **বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা উচ্চমানের হবে :** ভাল বীজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা। ভালো বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষাগারে শতকরা ৯০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। মাঠে অবশ্য এ হারে বীজ গজাবে না। তবে উত্তমরূপে কর্ষিত ও উপযুক্ত পরিমাণ রস যুক্ত জমিতে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ বীজ গজাতে পারে। অবশ্য সব বীজের গজাবার হার একই রকম নয়। ধান ও পাটের ভালো বীজ মাঠে যেখানে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ হতে পারে, সেখানে তুলা এবং সরগামের বীজ শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগের বেশি গজাবে না।

মুকুলের সুপ্তাবস্থা

মঙ্গক্র বা জনন বৃদ্ধির পূর্বে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক কাষ্ঠল উদ্ভিদের মুকুল সুপ্তাবস্থায় থাকে। গ্রীষ্মের শেষে বা শরৎকালের প্রথমে এই মুকুলগুলোর সুপ্তাবস্থা হয়। প্রকৃতিতে নিম্ন তাপমাত্রার জন্য, যা শীতকালে থাকে, মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভেঙে যায়। তবে নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা ও সময়সীমা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম। একটি গবেষণার ফলাফলে জানা যায় যে, মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙার সবচেয়ে কার্যকর তাপমাত্রার পরিসর হলো ১ থেকে ১০° সেলসিয়াস এবং শৈত্য প্রদানের সময়ের পরিসর ২৬০ থেকে ১০০০ ঘণ্টা। যেসব অঞ্চলের শীতের প্রকটতা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানকার কাষ্ঠল প্রজাতিতে শৈত্য প্রদান সাধারণত সম্পূর্ণ হয় না, তাই বসন্তকালে মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙতে বিলম্বিত এবং অনিয়মিত হয়

কাষ্ঠল উদ্ভিদের মুকুলের সুপ্তাবস্থা সৃষ্টিকারী এবং ভাঙার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় প্রভাবক হলো দিবা-দৈর্ঘ্য। অধিকাংশ প্রজাতিতে স্বল্প দিবালোকে মুকুলের সুপ্তাবস্থা প্ররোচিত হয় এবং দীর্ঘ দিবালোক প্রয়োগে এটি ভাঙা যায়। এজাতীয় ফটোপিরিয়ডিক সুপ্তাবস্থা প্রতিক্রিয়ায় ফাইটোক্রোম অংশগ্রহণ করে, কেননা এক্ষেত্রে লাল/অতিলাল বিপরীতমুখীতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যান্য অঙ্গের সুপ্তাবস্থা

কাষ্ঠল উদ্ভিদের মুকুলের সুপ্তাবস্থা ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গে, যেমন বাল্ব, বুলবিল, কর্ম, রাইজোম, কন্দ, সুপ্তাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পিঁয়াজের বাল্বের সুপ্তাবস্থা দীর্ঘ দিবালোক দ্বারা

উদ্দীপিত হয় এবং নিম্ন তাপমাত্রায় বাল্ব রাখলে সুপ্তাবস্থার সময়সীমা হ্রাস পায়। একইভাবে *Gladiolus* এর কর্ম এবং *Convallaria*-এর রাইজোম নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে সুপ্তাবস্থা ভেঙে যায়। অধিকাংশ জাতের গোলআলুর স্ফীত কন্দকে ১০° সেলসিয়াসে বা তার ২২° সেলসিয়াসে রাখলে সুপ্তাবস্থা অধিকতর দ্রুত ভেঙে যায়।

মুকুলের সুপ্তাবস্থার ভিত্তি

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বয়সেন-জেনসেন (Boysen-Jensen) প্রথম প্রস্তাব করেন যে, বৃদ্ধি-উদ্দীপক অক্সিনের ঘাটতির জন্য সুপ্তাবস্থা হয়। অ্যাভারি এবং সহকর্মীরাও (Avery *etal.*,1937) এই ধারণাকে সমর্থন করেন এবং তাঁরা মন্তব্য করেন যে, বসন্তকালে আপেলের মুকুলের বৃদ্ধির প্রারম্ভে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিন তৈরি হয়। যদি অক্সিনের ঘাটতির জন্যই সুপ্তাবস্থা হয়, তাহলে একটি যুক্তিসংগত ধারণা হলো বহিঃস্থভাবে IAA এবং 2, 4-D প্রয়োগ করলে সুপ্তাবস্থার অবসান হয়। তবে এই ধারণাটি সঠিক নয়।

একটি সম্ভাবনা হলো যে, অন্তঃস্থ রোধকের জন্য বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বলেই মুকুলের সুপ্তাবস্থা হয়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হেমবার্গ (Hemberg) লক্ষ্য করেন যে, *Fraxinus*-এর সুপ্ত মুকুল এবং গোল আলুর স্ফীতকন্দের নির্যাসে এমন পদার্থ থাকে যা *Avena*-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর বৃদ্ধি রোধ করে। তবে সুপ্তাবস্থাবিহীন মুকুল থেকে নির্যাস নিলে অবশ্য বৃদ্ধি সামান্য রোধ হয়। পীচের মুকুলের অক্সিন এবং রোধকের পরিমাণ পরিমাপ করে বিজ্ঞানী ব্লোমকুইস্ট (Blommaert, 1955) মন্তব্য করেন যে, সুপ্তাবস্থা হলে অক্সিনের মাত্রা কমে যায় এবং রোধকের পরিমাণ বেড়ে যায়। একইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির কাষ্ঠল উদ্ভিদ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শীতকালে বিশ্রামরত মুকুলে রোধকের মাত্রা কমতে থাকে। সুপ্তাবস্থা থেকে মুকুল মুক্ত হওয়ার পর *Fraxinus*-এর রোধকের মাত্রা সুস্পষ্টভাবে হ্রাস পায়, কিন্তু *Acer* এবং *Syringa*-এর মুকুলে বেশ দেরিতে এটি হয়। গোলআলুর কন্দের মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙার সময় রোধকের মাত্রা হ্রাস পায় কিন্তু বৃদ্ধি শুরু হওয়ার পর বেড়েও যায়। অধিকন্তু, মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙার সময় জিব্বারেলিক অ্যাসিডের পরিমাণও বেড়ে যায়। এজাতীয় বৃদ্ধি-উদ্দীপক যৌগের জন্য পরিশেষে রোধকের কার্যকারিতা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মুকুলের সুপ্তাবস্থার ব্যাখ্যা করতে বৃদ্ধিরোধক পদার্থের ভূমিকা বেশ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বজনীন স্বীকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বৃদ্ধিরোধক পদার্থের জন্য যদি মুকুলের সুপ্তাবস্থা হয়, তাহলে এই রোধক প্রয়োগে সুপ্তাবস্থা দীর্ঘায়িত হবে অথবা পুনরায় সংঘটিত হবে। বৃদ্ধিরোধক প্রয়োগে এরকম ফলাফল পাওয়া যায়নি। যেমন- পীচ (peach) এর মুকুলের একটি প্রধান বৃদ্ধিরোধক নারিনজেনিন পীচের মুকুলে প্রয়োগে এরকম পাওয়া যায়নি। তবে বার্চের (birch) পাতার আংশিক বিশুদ্ধ মিথানলের নির্যাস অসুপ্ত বিটপে প্রয়োগ করলে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং আপাতভাবে মুকুলের সুপ্তাবস্থা হয়। বৃদ্ধিরোধক প্রয়োগে নিবিড় (compact) মুকুল হয় এবং GA_3 প্রয়োগে এটা আবার স্বাভাবিক হয়।

মুকুলে উপস্থিত বৃদ্ধিরোধক পদার্থ পৃথকও এদের প্রকৃতি নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। হেমবার্গ (Hemberg,1949) এর রোধকের প্রকৃতি অম্লধর্মী। সাইকামোর (sycamore)-এর পাতায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে বৃদ্ধিরোধক পদার্থ আছে, তা হলো ABA। এটি এক প্রকার সেসকুইটারপেনয়েড, এর একটি অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু আছে এবং অপটিক্যাল আইসোমারিজম দেখায়।

মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙনের ব্যাখ্যায় অন্তঃস্থ জিব্বারেলিক অ্যাসিডের সম্ভাব্য ভূমিকা খুবই আশাব্যাঞ্জক। সুপ্তাবস্থার শেষের দিকে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের মাত্রা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যায় এবং সুপ্তাবস্থা শেষ হলে বৃদ্ধিরোধকের পরিমাণও কমে যায়। শীতকালে উঠা-নামা করা প্রাকৃতিক তাপমাত্রায় শৈত্যের সময় ব্লাক কারেন্টের মুকুলের জিব্বারেলিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে। তবে মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙতে বহিঃস্থ জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে দিবাদৈর্ঘ্য অথবা শৈত্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিস্থাপিত হয় না।

অন্যান্য উদ্ভিদ হরমোনও সুপ্তাবস্থা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। কতিপয় কাষ্ঠল উদ্ভিদে সুপ্তাবস্থা ভাঙনে সাইটোকাইনিন বেশ সক্রিয়; সুপ্তাবস্থার শেষের দিকে *Betula* এবং *Populus* এর মুকুলে সাইটোকাইনিনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কন্দ ইথিলিন তৈরি করে, সুপ্তাবস্থা ভঙের জন্য জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

মুকুলের সুপ্তাবস্থার কারণ সম্পর্কে আরো কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি প্রস্তাব হলো যে, গোলআলুর কন্দের সুপ্তাবস্থার সাথে খনিজ মৌল ও পানিতে কোষের আপেক্ষিক ভেদ্যতার সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানী টোমাসজেসকি (Tomaszewski, 1957) একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যার প্রস্তাব করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, অনেক ফলজ বৃক্ষের মুকুলের সুপ্তাবস্থার সাথে ফেনল এবং ফেনলেজের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কিত। বিজ্ঞানী কোর্টুফো এবং লেভিট (Corrufo and Levit, 1958) উল্লেখ করেন যে, সুপ্তাবস্থার সময় কাণ্ডের শীর্ষ থেকে দূরবর্তী স্থানে প্রোটিন সংশ্লেষণ সীমাবদ্ধ থাকে এবং সুপ্তাবস্থা ভঙের সময় আবার শীর্ষদেশে প্রোটিন সংশ্লেষণ স্থানান্তরিত হয়। বিজ্ঞানী পোলক (Pollock, 1960) প্রস্তাব করেন যে, সুপ্তাবস্থা ভঙের সময় শ্বসনের দক্ষতারও পরিবর্তন হয়, সম্ভবত সবাত শ্বসন বৃদ্ধিরোধক পদার্থ দূর করতে সহায়তা করে। গোল আলুর কন্দের সুপ্তাবস্থার জন্য জিনের ডিরিপ্রেশনের (drepression) কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্ত মুকুলের সক্রিয় DNA নির্ভর RNA সংশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে না কিন্তু অসুপ্ত মুকুলের থাকে (Tuan and Bonner, 1964)।

মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের পদ্ধতি

বিশ্রামরত মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

পর্ণমোচী বৃক্ষ ও গুল্ম

বিভিন্ন প্রজাতিতে মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। যেমন– পীচের মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গের জন্য ১,০০০ ঘণ্টা ৭.৩ সেলসিয়াস কিংবা এর চেয়েও কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বিজ্ঞানী ডব্লিউ. জোহানসেন (W. Johansen) আবিষ্কার করেন যে, একদিন বা দুদিন ইথার কিংবা ক্লোরোফরম প্রয়োগ করলে অনেক উদ্ভিদের সুপ্ত মুকুলের বৃদ্ধি শুরু হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ এবং মুকুলের বৃদ্ধি শুরুর মাঝে সময়সীমা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম। শীতের শেষে এই প্রতিক্রিয়া এক বা দুদিনের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মের শেষে কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা যায়।

বিজ্ঞানী মোলিচ (Molisch) 'উষ্ণ-স্নান পদ্ধতি' (warm-bath process) উদ্ভাবন করেন এবং এই পদ্ধতিতে সুপ্ত বৃক্ষের বায়বীয় বিটপ উষ্ণ পানিতে (৩০ থেকে ৩৫° সেলসিয়াস) ৯ থেকে ১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে বৃদ্ধির জন্য উপযোগী এমন একটি কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইথিলিন ক্লোরোহাইড্রিন এবং ইথিলিন ডাইক্লোরাইডের বাষ্প ব্যবহার করে *Prunus avium*, *Syringa vulgaris* এবং অন্যান্য কাষ্ঠল বৃক্ষ প্রজাতির মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙা

যেতে পারে। কাইনেটিন প্রয়োগে আপেল ও আঙুরসহ কতিপয় প্রজাতির মুকুল সুপ্তাবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে।

গোল আলুর কন্দ

গোল আলুর সদ্য সংগ্রহ করা নতুন কন্দকে বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত অবস্থায় রাখলে এদের অঙ্কুর গজায় না। সুপ্ত কন্দের খণ্ডকে ০.৫ থেকে ২% সোডিয়াম থায়োসায়ানেটের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। একইভাবে ১ লিটার পানিতে ৪০% ইথিলিন ক্লোরোহাইড্রিনের দ্রবণের ৩০ থেকে ৪০ মিলিমিটারে গোল আলুর কন্দ ডুবিয়ে একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে ২৪ ঘণ্টা সংরক্ষণ করলে সুপ্তাবস্থার সময়কাল কমানো যায়। কার্বন ডাইসালফাইড, ইথাইল ব্রোমাইড, জাইলল, ডাইক্লোরোইথিলিন, থায়োইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম এবং পটাশিয়াম থায়োসায়ানেট প্রয়োগেও অঙ্কুরিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করা যায়। মাত্-উদ্ভিদে লেগে থাকা অবস্থায় জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে কন্দ অঙ্কুরিত হয়। সংগৃহীত কন্দে যেকোনো সময়, কন্দের প্রসারণ থেকে সুপ্তাবস্থার শেষপর্যন্ত, জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগে অঙ্কুর গজাতে কার্যকর।

গ্লাডিওলাসের কর্ম

গ্লাডিওলাসের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গে ইথিলিন ক্লোরোহাইড্রিন বেশ কার্যকর কিন্তু ইথাইল ইথার এবং ইথিলিন তেমন কার্যকর নয়। তবে, কতকগুলো জাতে সংগ্রহের পরপরই রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ কার্যকর হয়, কিন্তু অপর জাতগুলোতে কর্ম উপযুক্ত তাপমাত্রায় কিছু সময়ের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। কতিপয় প্রজাতিকে আবার কেবল সংরক্ষণ করলেই সুপ্তাবস্থার অবসান হয়।

নবম অধ্যায়

উদ্ভিদের চলন

চলন সজীবতার একটি প্রধান লক্ষণ। চলন শব্দের দ্বারা জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা শাখা প্রশাখার সঞ্চালন এবং সমগ্র জীবের স্থানান্তর গমনকেও বোঝায়। সাধারণত সমগ্র জীবদেহের একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকে গমন (locomotion) বলে। মূলের দ্বারা অধিকাংশ উদ্ভিদ নিজেদের স্থায়িভাবে আবদ্ধ রাখে বলে এদের চলন সীমিত। কতগুলো নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ ব্যতীত অপর সব উদ্ভিদেরই কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন পরিলক্ষিত হয়।

উদ্ভিদের চলনের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদে প্রধানত দু'প্রকার চলন দেখা যায় : ১. যান্ত্রিক চলন (Mechanical movement) এবং ২. জৈব –চলন (Vital movement) ।

১. **যান্ত্রিক চলন :** উদ্ভিদের বিশেষ অঙ্গের কোষে পানির অপেক্ষিক মাত্রার উপর নির্ভর করে এ প্রকার চলন হয়। উদ্ভিদে কয়েক প্রকারের যান্ত্রিক চলন দেখা যায়। লেগুমজাতীয় ফল ফেটে বীজের বিস্তার এবং অপুষ্পক উদ্ভিদের, যেমন মস ও ফার্নের রেণুস্থলী ফেটে রেণুর বিস্তার যান্ত্রিক চলনের উদাহরণ।

২. **জৈব চলন :** বাইরের বা উদ্ভিদের দেহের ভিতরের উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত বহুমুখী চলনকে জৈব চলন বলে। প্রোটোপ্লাজমের জৈবশক্তির উপর এ চলন নির্ভর করে। এ চলন দু'প্রকারের—

ক. স্থানান্তর চলন (Movement of location) এবং খ. বক্র চলন (Movement of curvature)।

ক. স্থানান্তর চলন

এককোষী অথবা বহুকোষী স্বাধীনজীবী শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ এবং পুং জননকোষের একস্থান থেকে অন্যত্র গমনকে স্থানান্তর চলন বলে। এ প্রকার চলন দুপ্রকারের হয়।

১. **স্বতঃস্ফূর্ত গমন** (Spotaneous or autonomous locomtion) এবং

২. **আবিষ্ট গমন** (Induced locomotion)।

১. **স্বতঃস্ফূর্ত স্থানান্তর গমন :** এ প্রকার চলনে কোনো বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রভাব থাকে না। প্রোটোপ্লাজমের অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনাই স্বতঃস্ফূর্ত চলনের মূল কারণ। স্বতঃস্ফূর্ত স্থানান্তর চলন নিম্নলিখিত তিন প্রকারের।

i. **আবর্তন** (Cyclosis) : কোষপ্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ বিভিন্ন উদ্ভিদে কোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তাকে আবর্তন বলে।

Vallisneria, Hydrilla ইত্যাদি কয়েকটি জলজ উদ্ভিদের কোষের প্রোটোপ্লাজমে আবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ প্রকার চলনে প্রোটোপ্লাজম একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় কোষগহ্বরকে পরিবেষ্টন করে প্রবাহ রচনা করে।

সারণি ৯.১ : উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার চলন পদ্ধতি

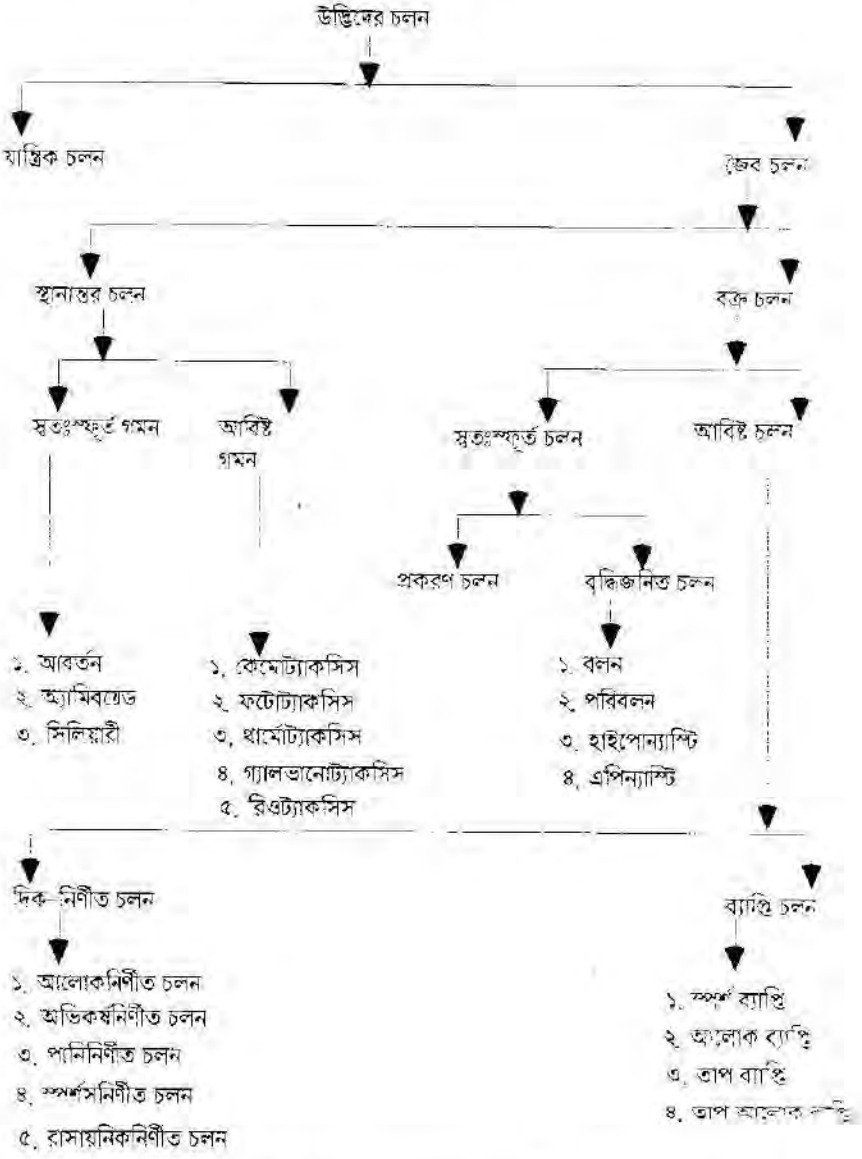

ii. **অ্যামিবয়ড চলন** (Amoeboid movement) : নিম্নশ্রেণির ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ মিক্সোমাইসিটিসে এ প্রকার চলন দেখা যায়। এ উদ্ভিদের কোনো সুনির্দিষ্ট কোষপ্রাচীর থাকে না। অ্যামিবার ন্যায় এদের দেহের প্রোটোপ্লাজম থেকে সাময়িক প্রসারিত অংশ বা স্যুডোপড (pseudopodium) সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা চলন সম্পন্ন করে বলে একে অ্যামিবয়ড চলন বলে

iii. **সিলিয়ারি চলন** (Ciliary movement) : শৈবাল, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট এবং কিছু ব্যক্তজীবী উদ্ভিদের পুং জননকোষে এ প্রকার চলন পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ কোষ থেকে সৃষ্ট অসংখ্য সূক্ষ্ম রোমের ন্যায় সিলিয়ার সাহায্য জনন কোষের গমন সাধিত হয়। সাঁতারের সময় সিলিয়া ছোট ছোট দাঁড়ের ন্যায় পানিকে আঘাত করে এবং ফলে আঘাতের বিপরীত মুখে কোষ গমন করে।

২. **আবিষ্ট স্থানান্তর চলন :** এটি বাহ্যিক উদ্দীপকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাধিত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি চলনের উদ্দীপকরূপে কাজ করে। এ ধরনের চলনকে ট্যাকটিক (tactic) চলনও বলে। উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুসারে ট্যাকটিক চলন নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হতে পারে:

i. **কেমোট্যাকসিস** (Chemotaxis) : রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা প্রভাবিত সমগ্র উদ্ভিদ দেহের অথবা কোষের স্থানান্তর চলনকে কেমোট্যাকসিস বলে। ব্রায়োফাইট এবং টেরিডোফাইট উদ্ভিদের পরিপক্ব স্ত্রীধানী থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শুক্রাণুর চলন কেমোট্যাকসিসের উদাহরণ।

ii. **ফটোট্যাকসিস** (Phototaxis) : এ প্রকার চলনে আলো উদ্দীপকরূপে কাজ করে। যেমন শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ স্বল্প আলোকের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু তীব্র আলোকের বিপরীত মুখে যায়।

iii. **থারমোট্যাকসিস** (Thermotaxis) : অধিকাংশ নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের চলন উত্তাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। উত্তাপের তারতম্য হলে এরা দেহের উত্তাপের উপযোগী তাপমাত্রার অভিমুখে অগ্রসর হয়।

iv. **গ্যালভানোট্যাকসিস** (Galvanotaxis) : নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের যে চলন বৈদ্যুতিক বিভব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে গ্যালভানোট্যাকসিস বলে।

v. **রিওট্যাকসিস** (Rheotaxis) : ডায়াটমজাতীয় উদ্ভিদে পানির স্রোতের পার্থক্যের জন্য যে পেন্ডুলামের ন্যায় চলন দেখা যায়, তাকে রিওট্যাকসিস বলে।

খ. বক্রচলন

এ প্রকার চলন উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকায় এসব উদ্ভিদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে না, তাই এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়।

বক্রচলন দু প্রকার : (১) স্বতঃস্ফূর্ত চলন এবং (২) আবিষ্ট চলন।

১. **স্বতঃস্ফূর্ত বক্র চলন :** যখন উদ্ভিদ অঙ্গে চলন অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে সম্পন্ন হয়, তখন তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বক্র চলন বলে। এটি প্রধানত দু' প্রকারের :

i. **প্রকরণ চলন :** উদ্ভিদের কোনো বিশেষ অঙ্গের রসস্ফীতির তারতম্যের ফলে এ ধরনের চলন দ্রুতগতিতে সাধিত হয়। টেলিগ্রাফ উদ্ভিদের (*Desmodium gyrans*) যৌগিক পাতার দুটি পার্শ্বীয় অনুপত্রিকা দুটিতে এ প্রকারের চলন সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ii. **বৃদ্ধিজনিত চলন :** উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের বিভিন্ন পার্শ্বে অসমান বৃদ্ধির জন্য যে চলনের সৃষ্টি হয়, তাকে বৃদ্ধিজনিত চলন বলে। এটি নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে:

বলন (Nutation) : উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গে যখন ক্রমান্বয়ে একপাশে অধিক বৃদ্ধি এবং অন্যপাশে কম, পুনরায় অন্যপাশে অধিক এবং বিপরীতদিকে বৃদ্ধি কম হয়, তখন তাকে বলন বলে। লতাজাতীয় উদ্ভিদের বর্ধনশীল কাণ্ডে এ প্রকার চলন দেখা যায়।

পরিবলন (Circumnutation) : উদ্ভিদ দেহের কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি কেবল একই দিকে দ্রুততর হলে অঙ্গটি স্প্রিং এর ন্যায় সর্পিলভাবে অগ্রসর হয়, আকর্ষিতে এই প্রকার চলনকে পরিবলন বলে। এ প্রকার চলন মটর, কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের আকর্ষিতে (tendril) দেখা যায়।

হাইপোন্যাস্টি (Hyponasty) : কচু, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার নিম্নত্বকের বৃদ্ধি পত্রত্বক অপেক্ষা অধিক বলে প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে কুণ্ডলিকৃত হয়ে গুটিয়ে থাকে, এই প্রকার চলনকে হাইপোন্যাস্টি বলে।

এপিন্যাস্টি (Epinasty) : এ প্রকার চলন হাইপোন্যাস্টির ঠিক বিপরীত। কচু ও কলাপাতার প্রাথমিক অবস্থায় হাইপোন্যাস্টি প্রকারের চলন সাধিত হওয়ার পর, পরবর্তী পর্যায়ে পত্রের উপরের ত্বকের বৃদ্ধি নিম্নত্বক অপেক্ষা অধিক হয় বলে পত্রফলন খুলে সমান্তরাল হয়ে যায়, একে এপিন্যাস্টি বলে।

২. **আবিষ্ট বক্রচলন** : বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের যে বক্র চলন ঘটে তা দুপ্রকারের। যথা : (i) ট্রপিক চলন (tropic movement) বা দিক-নির্ণীত চলন এবং ন্যাস্টিক চলন (nastic movement) বা ব্যাপ্ত চলন।

(i) **ট্রপিক চলন বা দিকনির্ণীত চলন** : এ প্রকার চলনে উদ্ভিদ অঙ্গ বাহ্যিক উদ্দীপকের অবস্থানের দিকে অথবা বিপরীত অভিমুখে চালিত হয়। অর্থাৎ এরূপ চলনের সাথে অঙ্গ সঞ্চালনের একটি নির্দিষ্ট দিক নির্দেশক সম্পর্ক থাকে। উদ্ভিদ অঙ্গ উদ্দীপকের অভিমুখে অগ্রসর হলে তাকে অভিগ দিকনির্ণীত চলন (positive tropic movement) এবং এর বিপরীত অভিমুখে হলে তাকে প্রতীপ দিকনির্ণীত চলন (negative tropic movement) বলে। উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুসারে দিকনির্ণীত চলন নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হতে পারে :

আলোকনির্ণীত চলন বা ফটোট্রপিজম (Phototropism) : উদ্ভিদ অঙ্গের চলনে আলোকের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত হলে তাকে আলোক নির্ণীত চলন বলে। সাধারণত উদ্ভিদের কাণ্ড আলোর উৎসের দিকে এবং মূল আলোর উৎসের বিপরীতদিকে বর্ধিত হয়। তাই উদ্ভিদের কাণ্ড অভিঃ আলোকবর্তী এবং মূল প্রতীপ আলোকবর্তী। কতগুলো উদ্ভিদের পাতা আলোর উৎসের সাথে লম্বভাবে থাকতে পারে এবং তাই এদেরকে ডায়াফটোট্রপিক (diaphototropic) বলে। এর একটি উদাহরণ হলো (*Neptunia olearacea*) এর পাতা সারাদিনই সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং সূর্যের সাথে সাথে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলন হয়।

সূর্যমুখীর ফুলেরও একই প্রকার চলন হয়। *Arachis hypogea* এর গর্ভাশয়ের দণ্ডের বৃদ্ধির বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন প্রকারের আলোকনির্ণীত চলন হয়। নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত গর্ভাশয় অভিঃ আলোবর্তী, কিন্তু নিষেকের পর এটি প্রতীপ আলোকবর্তী হয়, এরফলে গর্ভাশয় মৃত্তিকার ভিতরে চলে যায়।

আলোকনির্ণীত চলনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা : উদ্ভিদের আলোক-নির্ণীত চলনের সাথে অক্সিন নামক উদ্ভিদ হরমোনের সম্পর্ক বিদ্যমান। আলোর প্রভাবে উদ্ভিদের আলোকিত অংশের অক্সিনের পরিমাণ কমে যায়। কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য মূলের তুলনায় বেশি পরিমাণ অক্সিনের প্রয়োজন হয়। তাই কাণ্ডের ক্ষেত্রে আলোকিত অংশের বিপরীতদিকে অক্সিনের পরিমাণ বেশি থাকায় সে প্রান্তে বৃদ্ধি বেশি হয়, ফলে এটি আলোকাভিমুখী হয়। মূলের আলোকিত অংশে অক্সিনের পরিমাণ থাকায় সে অংশের বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় মূল আলোর বিপরীত দিকে বেঁকে যায়।

অভিকর্ষনির্ণীত চলন বা জিওট্রপিজম (Geotropism) : পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অভিকর্ষের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের চলনকে অভিকর্ষনির্ণীত চলন বলে। উদ্ভিদের প্রধান মূল অভিঃ অভিকর্ষের দিকে এবং কাণ্ড এর বিপরীতদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই প্রধান মূল অভিঃ

অভিকর্ষবর্তী (positively geotropic) এবং কাণ্ড প্রতীপ অভিকর্ষবর্তী (negatively geotropic)। মূলের সেকেন্ডারি শাখা এবং কাণ্ডের শাখা ডায়াজিওট্রপিক, কিন্তু মূলের টারশিয়ারি শাখা অভিকর্ষে সংবেদনশীল নয়, তাই এদেরকে অ্যাজিওট্রপিক (ageotropic) বলে। বৃদ্ধির বিভিন্ন দশায় পপি ফুলের বৃন্তের অভিকর্ষের প্রতি সংবেদনশীলতার পরিবর্তন হয়। কুঁড়ি অবস্থায় পুষ্পবৃন্ত অভিগ অভিকর্ষবর্তী, কিন্তু ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার পর এটি প্রতীপ অভিকর্ষবর্তী হয়ে যায়।

অভিকর্ষনির্ণীত চলনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা

আলোকনির্ণীত চলনের মতো অভিকর্ষ-নির্ণীত চলনও অক্সিনের কার্যের সাথে জড়িত। মাটিতে সমান্তরালভাবে রাখা উদ্ভিদ অঙ্গের নিচে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অক্সিনের পরিমাণ বেশি থাকে। ধারণা করা হয় যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অক্সিনের মেরুদেশীয় চলনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অক্সিনের যে ঘনত্ব কাণ্ডের বৃদ্ধির সহায়তা করে সে ঘনত্ব মূলের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য অক্সিনের সর্বোত্তম ঘনমাত্রা হলো ১০ পি পিএম (PPm), অপরদিকে মূলের জন্য ০.০০০১ পিপিএম। তাই কাণ্ডের নিম্নাংশের কোষে অক্সিনের ঘনত্ব বেশি থাকায়, উপরের অংশের তুলনায় নিম্নাংশের কোষগুলো অধিকতর বৃদ্ধি পায়, ফলে কাণ্ড খাড়াভাবে উপরের উঠে। অপরদিকে, মূলের নিম্নাংশের অধিকতর ঘন অক্সিন সে অংশের কোষের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং উপরের অংশে অক্সিন কম ঘন থাকায় সেখানের কোষ অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল অভিকর্ষ অভিমুখী হয়।

পানিনির্ণীত চলন বা হাইড্রোট্রপিজম (Hydrotropism) : পানির উৎস দ্বারা প্রভাবিত উদ্ভিদ অঙ্গের বক্র চলনকে পানিনির্ণীত চলন বলে। উদ্ভিদের মূল পানির দিকে যায়, তাই এটি অভিগ পানিবর্তী (positively hydrotropic) এবং কাণ্ড বিপরীত দিকে যায়, তাই এটি প্রতীপ পানিবর্তী (negatively hydrotropic).

স্পর্শনির্ণীত চলন বা থিগমোট্রপিজম (Thigmotropism) : উদ্ভিদ অঙ্গের বক্র চলন যদি কোনো বস্তুর স্পর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাকে স্পর্শনির্ণীত চলন বলে। লাউ, কুমড়া, মটর প্রভৃতির আকর্ষ এবং শিম, শতমূলী ইত্যাদির বল্লী কোনো বস্তু বা কঠিন জিনিস পেলে তাকে আঁকড়ে ধরে বড়তে থাকে। এটি স্পর্শনির্ণীত চলনের উদাহরণ।

রাসায়নিকনির্ণীত চলন বা কেমোট্রপিজম (Chemotropism) : কোনো রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উদ্ভিদের যে বক্র চলন ঘটে, তাকে রাসায়নিকনির্ণীত চলন বলে। ফুলের পরাগ সংযোগের সময় পরাগ নালিকা গর্ভমুণ্ড নিঃসৃত রস দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(ii) **ব্যাপ্তি চলন বা ন্যাস্টিক চলন :** এ প্রকার চলনে উদ্ভিদ অঙ্গের সাথে বাহ্যিক উদ্দীপকের কোনো নির্দেশক সম্পর্ক থাকে না। বাহ্যিক উদ্দীপক যে কোনো স্থান থেকেই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, চলন অপরিবর্তিত থাকে এবং উদ্ভিদ অঙ্গের উদ্দীপকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুসারে ব্যাপ্তি চলন কয়েক প্রকারের হতে পারে :

স্পর্শ ব্যাপ্তি বা সিসমোন্যাস্টি (Seismonasty) : যে ব্যাপ্তি চলন স্পর্শ বা আঘাতজনিত কোনো উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাকে স্পর্শ ব্যাপ্তি বলে। লজ্জাবতী গাছ (*Mimosa pudica*) এ প্রকার চলন দেখা যায়। এদের দ্বিপক্ষল যৌগপত্রের বৃন্ত কিছুটা স্ফীত এবং একে পালভিনাস (pulvinus) বলে। পালভিনাসের দুপাশের কোষীর সংগঠন ভিন্নতর। পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট শিথিলভাবে সন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় পালভিনাসের উভয় অংশের কোষগুলো পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায় থাকে এবং পাতা খাড়া অবস্থায় থাকে। উদ্দীপনার প্রভাবে পালভিনাসের নিম্নদিকের কোষ থেকে পানি দ্রুত সন্নিহিত কোষান্তর

বন্ধে চলে যাওয়ার ফলে কোষগুলোর রসস্ফীতির পরিবর্তন ঘটে এবং সংকুচিত হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, মাত্র এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশের মধ্যে লজ্জাবতীর পাতা উদ্দীপকের প্রভাবে মিইয়ে পড়ে এবং দশ মিনিট পরে পালভিনাসের কোষসমূহের রসস্ফীতি পুনরায় ফিরে আসে ও অবনমিত পত্রগুলো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। রসস্ফীতির পরিবর্তনের ফলে লজ্জাবতী গাছের পাতায় এ প্রকার চলন দেখা যায় বলে একে রসস্ফীতি চলনও (turgor movement) বলে।

আলোক ব্যাপ্তি বা ফটোন্যাস্টি : (Photonasty) : কেবল আলোকের তীব্রতার প্রভাবে উদ্দীপিত ব্যাপ্তি চলনকে আলোক ব্যাপ্তি চলন বলে। পদ্মফুল সাধারণত দিনের আলোকে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্যাস্তের পর মুদিত হয়। অপরপক্ষে, সন্ধ্যামালতী সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ রাতে প্রস্ফুটিত হয় এবং দিনে বন্ধ হয়ে যায়। এটি আলোক ব্যাপ্তির উদাহরণ।

তাপ ব্যাপ্তি বা থার্মোন্যাস্টি (Thermonasty) : কেবল উষ্ণতার প্রভাবে উদ্ভিদের যে ব্যাপ্তি চলন সংঘটিত হয়, তাকে তাপ ব্যাপ্তি চলন বলে। অনেক উদ্ভিদের ফুল তাপ বাড়ার সাথে সাথে প্রস্ফুটিত হয় এবং তাপ কমলে মুদিত হয়।

তাপ আলোক ব্যাপ্তি বা নিদ্রা চলন (Nyctinasty) : এ ধরনের চলনে আলোকের তীব্রতা এবং উষ্ণতা উভয়েই একত্রে উদ্দীপকের কাজ করে। এ প্রকার চলন দ্বারা উদ্ভিদের পাতা ও পুষ্পপত্র সূর্যাস্তের পর ধীরে ধীরে বন্ধ হয় এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। আমবুল, তেঁতুল, রাধাচূড়া ইত্যাদি উদ্ভিদের এ প্রকার চলন পরিলক্ষিত হয়।

দশম অধ্যায়

বায়োএনার্জেটিক

জীবদেহে অনবরত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনকে বলা হয় বিপাক। জীবের বিপাক বুঝতে হলে অংশগ্রহণকারী অণুর (মেটাবোলাইট) রসায়ন, যে বিক্রিয়ায় এরা অংশগ্রহণ করে তার প্রকৃতি, এই বিক্রিয়াসমূহে অংশগ্রহণকারী এনজাইম এবং একটি মেটাবোলাইট A থেকে B তে রূপান্তরের হার নির্ধারণে এনজাইমের উপস্থিতির পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কৌশল সম্পর্কে জানা দরকার। এরকম পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিয়ে একটি বিপাকীয় পথ তৈরি হয় এবং উদ্ভিদদেহে এরকম অনেকগুলো বিপাকীয় পথ সক্রিয় থাকে।

বিপাক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) মৌলনীতি এবং শক্তির রূপান্তর কিভাবে প্রধান প্রধান কোষীয় উপাদানের সংশ্লেষণ সম্ভব করে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

উদ্ভিদ কোষের প্রধান প্রধান উপাদানগুলোর সংশ্লেষণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে, খাদ্যবস্তুর জারণে সৃষ্ট শক্তি উচ্চশক্তিসমৃদ্ধ ফসফেট যৌগ ও ATP তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কোষের সব প্রকার অত্যাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র অণু এবং বৃহৎ অণু, যেমন- পলিস্যাকারাইড, প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে যুগল (coupled) বিক্রিয়ায় এই যৌগগুলো ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, খাদ্যবস্তু অথবা বিপাকীয় বিক্রিয়ায় উদ্ভূত অনেক যৌগের কোষ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য জারণ অথবা বিজারণ হয়।

তাপগতিবিদ্যার মৌলনীতি

বিভিন্ন অণুর রূপান্তর ঘটে শক্তি প্রবাহের মাধ্যমে। এটিই হলো তাপগতিবিদ্যার বিষয়বস্তু এবং এর প্রধান ধারণাগুলো (concepts) তাপগতিবিদ্যার প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রগুলো থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দিক বোঝা যায়, অর্থাৎ একটি বিক্রিয়া বাম থেকে ডানে হবে নাকি ডান থেকে বামে অগ্রসর হবে এবং এসব বিক্রিয়ার জন্য কার্যকর কাজ হবে (অর্থাৎ শক্তি নির্গত হবে) অথবা বাইরে থেকে শক্তি প্রদান করতে হবে। এনথালপি (enthalpy), এন্ট্রপি (entropy) এবং মুক্তশক্তি (free energy) এই তিনটি প্যারামিটার তাপগতিবিদ্যায় বিবেচনা করা হয়। এদের মধ্যে শেষোক্তটির গুরুত্ব প্রাণরাসায়নিক ঘটনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি হলো শক্তি সংরক্ষণের (conservation) সূত্র। একটি পাত্রে রাখুন একটি সিস্টেমও U-এর (এই সিস্টেমের মোট শক্তি) মান নির্ণয় সাধারণত অসম্ভব কাজ কিন্তু যদি তাপ আকারে Q, এই সিস্টেমে শক্তি যোগ করা যায়, তাহলে কিছু সময় পর $Q=\Delta U+W$ ...(১০.১), এখানে ΔU হলো মোট শক্তির পরিবর্তন এবং W হলো মোট কাজ, যদি হয়ে থাকে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিস্টেমে তাপ হিসেবে Q শক্তি যোগ করলে এবং চাপ নির্দিষ্ট থাকলে আয়তনের পরিবর্তন হতে পারে। এই পরিবর্তন, $P\Delta V$, প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার কাজ এবং ১০.১ নম্বর সমীকরণের W এর একটি উপাদান। তবে যেহেতু এটি কদাচিৎ কার্যকর কাজ, তাই W-এর এই উপাদানের সাথে Uএর পরিবর্তন যুক্ত করাই সুবিধাজনক এবং এভাবেই H এনথালপি অথবা তাপের পরিমাণ ব্যাখ্যা করা যায়। নির্দিষ্ট চাপে কোনো প্রক্রিয়ার এনথালপি-এর পরিবর্তন হলো

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V \quad ..... (১০.২)$$

তাই প্রথম সূত্রটি পুনরায় নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয়—

$Q = \Delta H + W'$ .... (১০.৩), এখানে W' হলো তাপ প্রয়োগে, Q, কার্যকর শক্তি

একটি আদর্শ, উভমুখী সিস্টেমের অর্থাৎ এই সিস্টেমের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং আবার একই পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়ে অন্য একটি কাজ করে, এ অবস্থায় সিস্টেমটি মূল অবস্থায় ফিরে যায়। বর্ণনার জন্য ১০.৩ নম্বর সমীকরণটি পর্যাপ্ত। তবে প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণ উভমুখীতা হয় না। প্রক্রিয়াটি চলার সময় অতিরিক্ত এনথালপির কিছু অংশ কার্যকর কাজের জন্য লভ্য হয় না। তাই অধিকাংশ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিকে ঘটে, যেমন পানি ঢালুদিকে প্রবাহিত হয় এবং প্রোটন ও হাইড্রোক্সিল আয়ন মিলিত হয়ে তাপ ত্যাগ করে। তবে পানিতে তাপ প্রয়োগ করলে এটি উঁচু স্থানের দিকে উঠতে পারে না অথবা বিশ্লিষ্ট হয়ে নিট প্রোটন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের মিশ্রণ তৈরি করে না। এসব প্রক্রিয়াকে সাম্যাবস্থার ধারণার সাহায্যে বর্ণনা করা যেতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন সাম্যাবস্থায় পৌঁছতে চায় এবং এভাবেই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে বলা যায়। দ্বিতীয় সূত্রের সরলতম বর্ণনা করা যায় অপর একটি তাপগতীয় পরিমাপক, এনট্রপি, S, দ্বারা ; এটা হলো এনথালপির সেই অংশ যা কার্যকর কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ হলো সিস্টেমের অণুগুলোর মধ্যে দৈবাৎ চলন বেড়ে যায়। তাই এনট্রপি হলো দৈবাতায়ন অথবা বিশৃঙ্খলতার পরিমাপক।

T (পরম তাপমাত্রা) এবং S এর গুণফল (TS) হলো অণুর দৈবাৎ চলনের জন্য শক্তির অপচয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে সুযোগ দিলে কোনো সিস্টেমের ঐ দিকে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন হয় এবং এর জন্য এনট্রপি বেড়ে যাবে। এনট্রপি সর্বচ্চ মাত্রায় পৌঁছানোর পর সাম্যাবস্থা হয় ; এ অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর কোনো পরিবর্তন হবে না, যদি না সিস্টেমের বাহির থেকে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করা হয়।

এখন দেখা যাক কোন সিস্টেমে তাপ প্রয়োগে ফলাফল কি হয়। যেহেতু তাপ হলো অণুর দৈবাৎ চলন, তাই তাপ প্রয়োগে এনট্রপি বৃদ্ধি পায়। যখন সিস্টেমটি সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন

$$Q = T\Delta S \quad ... (১০.৪)$$

তবে যদি সিস্টেমটি সাম্যাবস্থায় না থাকে, তাহলে তাপ প্রয়োগ না করা হলেও সিস্টেমের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের জন্য এনট্রপি বৃদ্ধি পাবে। তাই, সাধারণভাবে সিস্টেমটি যদি সাম্যাবস্থায় না থাকে, তাহলে

$$T\Delta S > Q \quad .. (১০.৫)$$

এখন যদি ১০.৩ এবং ১০.৪ নম্বর সমীকরণ দুটি একত্রিত করা হয় অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র একত্রিত করলে সাম্যাবস্থায় না থাকা একটি সিস্টেমে দেখা যায়,

$$\Delta H = T\Delta S - W' \quad ... (১০.৬)$$

তবে প্রাণরসায়নে সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে আমরা কম আগ্রহী। আগ্রহ হলো এমন বিক্রিয়ায় যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সাম্যাবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এরকম সিস্টেমের জন্য সমীকরণ ১০.৫ দ্বারা সমীকরণ ১০.৬ পরিবর্তিত হয় এবং তাই $\Delta H < T\Delta S - W$ ... (১০.৭)

এজন্য প্রাণরসায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাপগতীয় প্যারামিটার মুক্ত শক্তি G, সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এটি হলো—

$$G = H - TS \quad ... (১০.৮)$$

সাধারণভাবে, ΔG হলো মুক্ত শক্তির পরিবর্তন যা কাজ করার জন্য লভ্য হয়। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad ... (১০.৯)$$

এই আকারেই প্রাণরাসায়নিক সিস্টেমের বর্ণনায় তাপগতীয় সূত্রগুলো সবচেয়ে ব্যবহারোপযোগী। একটি সিস্টেম সাম্যাবস্থায় না থাকলে $\Delta G = -W$ ... (১০.১০)

তাই যেসব সিস্টেম সাম্যাবস্থায় থাকে না, সেক্ষেত্রে কেবল ঋণাত্মক মুক্ত শক্তি পরিবর্তনের দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হয়। সাম্যাবস্থায় মুক্ত শক্তির আর কোনো পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারে না এবং লভ্য মুক্ত শক্তির পরিমাণ শূন্য। বিপরীতভাবে, কোনো একটি সিস্টেম যা ইতোমধ্যে সাম্যাবস্থায় আছে, তাকে অসাম্যাবস্থায় আনা যায়, যদি কোনো পন্থায় এরজন্য কেবল মুক্ত শক্তি লভ্য হয়। এভাবে মুক্ত শক্তি ব্যবহারের জন্যই কাজ হয়।

মুক্ত শক্তির ধারণা

মুক্ত শক্তি (G) হলো তাপগতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার। একটি বস্তু A এর মুক্ত শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি কিন্তু পরীক্ষার সাহায্যে এই পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। তবে, যদি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় A বস্তু B বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে মুক্ত শক্তির পরিবর্তন (ΔG) সম্পর্কে বলা সম্ভব। A বস্তু B বস্তুতে রূপান্তরের সময় এটিই হলো সর্বোচ্চ পরিমাণ লভ্য শক্তি।

$$A \rightleftharpoons B \quad ... (১০.১১)$$

যদি উৎপাদিত বস্তু B এর মুক্ত শক্তির পরিমাণ G_B বিক্রিয়ক বস্তু A-এর মুক্ত শক্তির পরিমাণের (G_A) চেয়ে কম হয়, তাহলে ΔG হবে ঋণাত্মক অর্থাৎ $\Delta G = GB - GA$। ΔG ঋণাত্মক হওয়ার অর্থ হলো মুক্ত শক্তি হ্রাসের মাধ্যমে বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। একইভাবে, যদি B, A তে রূপান্তরিত হয়, তাহলে এই বিক্রিয়ায় মুক্ত শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ ΔG ধনাত্মক হবে। এটি দেখা গেছে যে, মুক্ত শক্তির হ্রাসের ($-\Delta G$) মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া হয়। অপরপক্ষে, একটি বিক্রিয়ার ΔG ধনাত্মক হলে এই বিক্রিয়া সংঘটিত হবে কেবল যদি বাইরে থেকে ঐ বিক্রিয়ায় কোনোভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হয়। যেসব বিক্রিয়ার ΔG ঋনাত্মক তাদেরকে এক্সারগোনিক (exergonic) এবং যেসব বিক্রিয়ার ΔG ধনাত্মক তাদেরকে এন্ডারগোনিক (endergonic) বিক্রিয়া বলে। যেমন- উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এন্ডারগোনিক এবং শ্বসন এক্সারগোনিক বিক্রিয়া।

আরো দেখা গেছে যে, যদি কোনো প্রক্রিয়ার ΔG ঋণাত্মক হয়, তাহলে এই তথ্যের সাথে কি হারে বিক্রিয়া অগ্রসর হয় তার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন– অক্সিজেন দ্বারা গ্লুকোজকে জারিত করলে ১০.১২ নম্বর সমীরণ অনুসারে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি তৈরি হয়।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O \quad \ldots (১০.১২)$$

এই বিক্রিয়ার ΔG এর মান একটি বড় ঋণাত্মক সংখ্যা-প্রায়-৬৮৬ কিলোক্যালরি/মোল গ্লুকোজ। তবে এই বৃহৎ মানের ΔG এর সাথে বিক্রিয়ার হারের কোনোই সম্পর্ক নেই। একটি বোম্ব ক্যালরিমিটারে (bomb calorimeter) একটি অনুঘটকের উপস্থিতিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গ্লুকোজের জারণ হতে পারে। অধিকাংশ জীবন্ত কোষে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত ১০.১২ নম্বর বিক্রিয়া চলে।

একটি বিক্রিয়ার মুক্ত শক্তির পরিবর্তনের সাথে A এবং B বস্তুর অপর দুটি তাপগতীয় প্যারামিটার সম্পর্কিত :

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad \ldots (১০.১৩)$$

এখানে ΔH হলো সমীকরণ ১০.১২-এর বিক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট (constant) চাপে অগ্রসর হলে তাপের পরিবর্তনের পরিমাণ, T হলো যে পরম তাপমাত্রায় (সেলসিয়াস - ২৭৩) বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয় এবং ΔS হলো এনট্রপির পরিবর্তন, কোনো সিস্টেমের বৈষাতায়ন অথবা বিশৃংখলার মাত্রা নির্দেশ করে। A এবং B বস্তুর এনথালপি H এবং এনট্রপি S-এর মান নির্ণয় করা বেশ কঠিন, কিন্তু এই প্যারামিটার দুটির পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়; ক্যালরিমিটারে একটি বিক্রিয়ার ΔH পরিমাপ করা যায়, এটি নির্দিষ্ট চাপে উৎপাদিত তাপের পরিমাণগত পরিমাপের একটি পদ্ধতি। ১০.১৩ নম্বর সমীকরণে দেখা যায় যে, বিক্রিয়কের (reactant) তুলনায় উৎপাদিত বস্তুর (product) এনট্রপি বাড়তে থাকলে, $T\Delta S$ হবে অধিকতর ধনাত্মক এবং ΔG হবে অধিকতর ঋণাত্মক।

ΔG নির্ণয়

সমীকরণ ১০.১১-এর জন্য নিম্নলিখিত সম্পর্ক পাওয়া যায়—

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{[B]}{[A]} \quad \ldots (১০.১৪)$$

এখানে ΔG° হলো মুক্ত শক্তির আদর্শ (standard) পরিবর্তন (১ম মোল/লিটারে মুক্ত শক্তি); R হলো গ্যাস ধ্রুবক; T হলো পরম তাপমাত্রা এবং [A] এবং [B] হলো মোলস/লিটার এককে Aএবং B এর ঘনমাত্রা। A এবং B এর ক্রিয়া (activity), a_A এবং a_B দ্বারা [A] এবং [B] কে যথাযথভাবে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। তবে pH-এর মতো এই সংশোধন সাধারণত করা হয় না। কারণ কোষে অবস্থিত যৌগের ঘনমাত্রার কার্যকারিতার গুণাঙ্ক কদাচিৎ করা হয়। ১০.১৪ নম্বর সমীকরণে, একটি বিক্রিয়ার ΔG হলো বিক্রিয়ক এবং উৎপাদিত বস্তুর ঘনমাত্রা এবং আদর্শ মুক্ত শক্তির পরিবর্তনের, ΔG°, কার্য। আমরা যদি ΔGকে সাম্যাবস্থায় বিবেচনা করি, তাহলে ΔG° এর মূল্যায়ন করা সম্ভব। সাম্যাবস্থায় Aথেকে B এর কোনো নিট রূপান্তর হয় না, তাই মুক্ত শক্তির পরিবর্তন ΔG হলো শূন্য। একইভাবে, [B] এবং [A]এর অনুপাত হলো সাম্যাবস্থায় অনুপাত অথবা সাম্যাবস্থা ধ্রুবক, Keq। এই পরিমাপগুলো ১০.১৪ নম্বর সমীকরণে প্রতিস্থাপন করলে,

$$O = \Delta G^\circ + RT \ln Keq.$$

অর্থাৎ $\Delta G^\circ = -RT \ln Keq \quad \ldots (১০.১৫)$

যখন ধ্রুবকগুলোর মূল্যায়ন করা হয় (R=১.৯৮৭ ক্যালরি/মোল/ডিগ্রি, ২৫° সেলসিয়াস = ২৯৮°T, এবং $\ln X$ = ২.৩০৩ $\log_{10}{}^{x}$), সমীকরণটি নিম্নভাবে লেখা যায় :

ΔG° = - (১.৯৮৭) (২৯৮) (২.৩০৩) $\log_{10}$ Keq

= - 1363 $\log_{10}$ Keq ... (১০.১৬)

এই সমীকরণ, যা ΔG° এর সাথে Keq সম্পর্কিত। এটি হলো একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার ΔG° নির্ণয়ের খুবই কার্যকর পদ্ধতি। যদি সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদিত বস্তু উভয়ের ঘনমাত্রা পরিমাপ করা যায়, তাহলে Keq এবং বিক্রিয়ার ΔG° নির্ণয় করা যায়। অবশ্য যদি Keq খুবই বেশি কিংবা খুবই কম হয়, তাহলে এই পদ্ধতিতে ΔG° পরিমাপের মূল্য খুব কম হয়, কারণ সাম্যাবস্থায় যথাক্রমে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদিত বস্তুর ঘনমাত্রা খুব কম হয় যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ΔG° মান প্রতি মোলে জুল অথবা ক্যালরি হিসেবেও প্রকাশ করা যায়।

জীবিত সিস্টেমে শক্তির রূপান্তর

মেশিনে জারণের মাধ্যমে নির্গত শক্তি কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, এক্ষেত্রে, যেমন- স্টিম ইঞ্জিনে, তাপ-প্ররোচিত তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্টের সুবিধা নেয়া হয়। তবে, যেহেতু কোষ খুব বেশি তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট সহ্য করতে পারে না, সেজন্যে জারণের ফলে মুক্ত হওয়া শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট হওয়ার পূর্বে কোনো রাসায়নিক অবস্থায় ধৃত হতে হবে। উদ্ভিদের সব প্রজাতিতেই এটি ঘটে ADP এবং অজৈব ফসফেট (iP) সংযোগে ATP তৈরির মাধ্যমে।

ADP + iP $\Leftrightarrow$ ATP, এখানে ΔG°= -৮.৪ কিলোক্যালরি/মোল ... (১০.১৭)

এই বিক্রিয়ায় ATP তৈরির আদর্শ মুক্ত শক্তি ΔG° এর মান হলো প্রায় +৮.৪ কিলোক্যালরি/মোল। ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, ৭.৪ pH-এ ADP এবং iP এর কোষে স্বাভাবিক মাত্রায় প্রকৃতপক্ষে যে মুক্ত শক্তির ΔG প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ প্রায় ১২ কিলোক্যালরি/মোল। ATP-এর এই শক্তি আবার কোষের বিভিন্ন প্রকার এন্ডারগোনিক প্রক্রিয়ায়, যেমন জৈব-সংশ্লেষণ, আয়ন পরিবহণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

রেডক্স পটেনশিয়াল (Redox Protential)

শ্বসন হলো মূলত একটি সাবস্ট্রেটের জারণ প্রক্রিয়া এবং এর ফলে যে মুক্ত শক্তি নির্গত হয়, তা কোষের বিভিন্ন এন্ডারগোনিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে মূল প্রক্রিয়া হলো একটি সাবস্ট্রেট থেকে অক্সিজেনে ইলেক্ট্রন স্থানান্তর। এসব প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট মুক্ত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় দুটি উপাদানের (সাবস্ট্রেট এবং অক্সিজেন) রেডক্স পটেনশিয়াল থেকে।

কোনো যৌগের রেডক্স পটেনশিয়াল (অথবা রিডাকশন-অক্সিডেশন পটেনশিয়াল অথবা রিডাকশন পটেনশিয়াল) হলো ইলেক্ট্রন গ্রহণ অথবা হারানোর অর্থাৎ এর ইলেক্ট্রন আসক্তির একটি পরিমাণগত পরিমাপক। যদি কোনো ফেরিক লবণের দ্রবণকে একটি রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় প্লাটিনাম ইলেক্ট্রোডের সংস্পর্শে রাখা হয়, তাহলে ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে এবং বিজারিত হয়ে ফেরাস আয়নে (Fe^{2+}) পরিণত হয়, এজন্য প্লাটিনাম ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হয়। বিপরীত অবস্থা হয় যখন একটি প্লাটিনাম ইলেক্ট্রোডকে একটি ফেরাস লবণের দ্রবণে রাখা হয়। দুটি লবণের মিশ্রণে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয় (সমীকরণ ১০.১৮)।

$Fe^{3+} + e^{-} \Leftrightarrow Fe^{2+}$ .. ১০.১৮)

সাম্যাবস্থায় প্লাটিনাম ইলেক্ট্রোডের পটেনশিয়ালকে E দ্বারা অভিহিত করা হয় এবং জারণকারী (oxidant) Fe^{3+} এবং বিজারণকারী (reductant) Fe^{2+} বস্তুর ঘনমাত্রা ও তাপমাত্রার সাথে সমীকরণ ১০.১৯ সম্পর্কিত। n হলো বিক্রিয়ায় স্থানান্তরিত প্রতি গ্রাম তুল্য বিক্রিয়কের ইলেক্ট্রনের সংখ্যা। R হলো গ্যাস ধ্রুবক (৮.৩১৪ জুল মোল$^{-১}$ ডিগ্রি$^{-১}$), T হলো পরম তাপমাত্রা এবং F হলো ফ্যারাডে (৯৬, ৪৯৭ কুলম্ব/গ্রাম তুল্য)।

$$E=Eo+\frac{RT}{nF}\log_e\frac{[Oxidant]}{[Reductant]} \quad \ldots (১০.১৯)$$

সমীকরণ ১০.১৯ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, যখন জারণকারী এবং বিজারণকারী বস্তুর ঘনমাত্রা সমান হয়, এই সমীকরণের ডান দিকের দ্বিতীয় টার্মের মান শূন্য হয় এবং E এর মান Eo এর সমান হয়।

প্রকৃতপক্ষে, একটি বিজারণ–জারণ যুগলের (রেডক্স যুগল) অর্থাৎ ১০.১৮ নম্বর সমীকরণে বর্ণিত অর্ধকোষ (half cell) -এর পটেনশিয়ালের পরিমাপ করা অসম্ভব। তবে অন্য একটি অর্ধকোষের তুলনায় আপেক্ষিক পটেনশিয়ালের পরিমাপ করা সম্ভব অর্থাৎ একটি অর্ধকোষের তুলনায় অপর একটি অর্ধকোষের পটেনশিয়ালের পার্থক্য কতো তা নির্ণয় করা যায়। এটি করা যায় একটি এগার পটাশিয়াম ক্লোরাইড ব্রিজের সাহায্যে দুটি অর্ধকোষের মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে। এখন যদি দুটি অর্ধকোষের ইলেক্ট্রোডকে একটি ধাতব তার দিয়ে সংযোগ করা হয়, তাহলে একটি অর্ধকোষ থেকে অপরটিতে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হবে। ইলেক্ট্রন প্রবাহের দিকে নির্ভর করবে ইলেক্ট্রনের প্রতি দুটি অর্ধকোষের আপেক্ষিক আসক্তির (অর্থাৎ রেডক্স পটেনশিয়াল) উপর। ইলেক্ট্রনের প্রতি কম আসক্তি আছে এমন অর্ধ কোষ থেকে বেশি আসক্তি আছে এমন অর্ধকোষে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হবে। জারণ-বিজারন বিক্রিয়ায় যে অর্ধকোষের ইলেক্ট্রনের প্রতি আসক্তি কম আছে তা বিজারণকারীর ভূমিকা এবং যে অর্ধকোষের বেশি আসক্তি আছে তা জারণকারীর ভূমিকা পালন করে। বিজারণকারী অর্ধকোষ থেকে জারণকারীর অর্ধকোষে ইলেক্ট্রন প্রবাহের মাত্রাকে বৈদ্যুতিক কোষের ইলেক্ট্রোমোটিভ বল (electromotive force বা e.m.f) বলা হয়। ইলেক্ট্রোমোটিভ বল হল বৈদ্যুতিক কোষের দুটি অর্ধকোষের ইলেক্ট্রন আসক্তির পার্থক্য। যেহেতু একটি অর্ধকোষের রেডক্স পটেনশিয়াল হলো এর ইলেক্ট্রন আসক্তির পরিমাপ, তাই বৈদ্যুতিক কোষের ইলেক্ট্রোমোটিভ বল হলো দুটি অর্ধকোষের রেডক্স পটেনশিয়ালের মধ্যে অ্যারিথমেটিক পার্থক্য, অর্থাৎ দুটি অর্ধকোষের মধ্যে পটেনশিয়ালের পার্থক্য। একটি বৈদ্যুতিক কোষের ইলেক্ট্রোমোটিভ বল সরাসরি পরিমাপ করা যায় এবং ভোল্ট (volt) হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

একটি আদর্শ অর্ধকোষের রেডক্স পটেনশিয়ালের সাথে সব অর্ধকোষের রেডক্স পটেনশিয়ালের সম্পর্ক স্থাপন সুবিধাজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। হাইড্রোজেন অর্ধকোষকে আদর্শ অর্ধকোষ হিসেবে ধরা হয়, একে আদর্শ হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোড নামে অভিহিত করা হয়। হাইড্রোজেনের বিজারণের পটেনশিয়ালকে, Eo, শূন্য pH-এ ০.০০০ ভোল্ট হিসেবে ধরা হয় (সমীকরণ ১০.২০) :

$$H^+ + 1e^- \longrightarrow \frac{1}{2}H_2 \quad \ldots (১০.২০)$$

যেহেতু ১০.২০ নম্বর বিক্রিয়ায় একটি প্রোটন ব্যবহৃত হয়, তাই এই অর্ধকোষের পটেনশিয়াল pH-এর জন্য পরিবর্তন হবে। pH-এর মান ৭ হলে ১০.২০ নম্বর বিক্রিয়ার

রেডক্স পটেনশিয়াল, E_o, হবে – ০.৪১৩ ভোল্ট (২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়)। এটিকে আদর্শ ধরে যেসব বস্তু জারণ-বিজারণ ঘটাতে সক্ষম, তার রেডক্স পটেনশিয়াল নির্ণয় করা সম্ভব।

পরিমাণগতভাবে, যেসব বস্তুর অধিক ধনাত্মক বিজারণ পটেনশিয়াল আছে (যেমন- অক্সিজেন, Fe^{3+}), এরা ভাল জারণকারী বস্তু, অপরদিকে যেসব বস্তুর অধিক ঋণাত্মক বিজারণ পটেনশিয়াল আছে (যেমন হাইড্রোজেন, $(NADH+H^+)$, এরা বিজারণকারী বস্তু।

সারণি ১০.১ : কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রেডক্স সিস্টেমের E_o' এর মান

রেডক্স বিক্রিয়া	E_o' (২৫° অথবা ৩০° সেলসিয়াস ; pH ৭.০) ভোল্ট
জারিত অবস্থা → বিজারিত অবস্থা	−০.৬৭
সাকসিনেট → আলফা-কিটোগ্লুটারেট	−০.৪৮
CO_2 + আলফা-কিটোগ্লুটারেট → আইসোসাইট্রেট	−০.৪০
ফেরিডোক্সিন (জারিত) → (বিজারিত)	−০.৩২ক
$NAD^+ \rightarrow NADH + H^+$	−০.১০খ
রাইবোফ্ল্যাভিন → বিজারিত রাইবোফ্ল্যাভিন	−০.২০
অ্যাসিটালডিহাইড → ইথানল	−০.১৮
পাইরুভেট → ল্যাকটেট	−০.১৭
অক্সালোঅ্যাসিটেট → ম্যালেট	−০.০৩
ফিউমারেট → সাকসিনেট	+০.০৪
সাইটোক্রোম বি $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$	+০.১০
ইউবিকুইনোন $(CoQ) \rightarrow CoQH_2$	
সাইটোক্রোম সি $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$	+০.২২
সাইটোক্রোম এ $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$	+০.২৯
কিউপ্রিক $(Cu^{2+}) \rightarrow$ কিউপ্রাস (Cu^{+})	+০.৩৫
অক্সিজেন, $\frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$	+০.৮২

Fe^{3+}/Fe^{2+} অর্ধকোষের Eo বিভিন্ন pH-এ (pH-এ ০–৫) পরিমাপ করলে দেখা যায় যে, Eo এর মান খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন আয়ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে pH-এর পরিবর্তনের সাথে Eo এর মানের পরিবর্তন হয়। তাই, এক্ষেত্রে রেডক্স পটেনশিয়াল পরিমাপের সময় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বিবেচনা করতে হয়। সমীকরণ ১০.১৯-এ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার স্থান করে দেওয়ার জন্য এটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় :

$$E=Eo + \frac{RT}{nF} \log_e \frac{[Oxidant]}{[Reductant]} + \frac{RT}{F} \log_e [H^+] \quad \ldots (১০.২১)$$

Eo কে E_o' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে ১০.১০ নম্বর সমীকরণের পরিবর্তন করা যায় :

$$E_o'= Eo + \frac{RT}{F} \log_e \frac{[Oxidant]}{[Reductant]} \quad \ldots (১০.২২)$$

এটি থেকে সমীকরণ ১০.২৩ পাওয়া যায় :

$$E= E_o' + \frac{RT}{nF} \log_e \frac{[Oxidant]}{[Reductant]} \quad \ldots (১০.২৩)$$

E_0' এবং অক্সিডাইজড এবং রিডাকটান্টের ঘনমাত্রা (অথবা এমনকি এদের ঘনমাত্রার অনুপাত) জানা থাকলে সমীকরণ ১৩.২৩ ব্যবহার করে একটি অর্ধকোষের প্রকৃত রেডক্স পটেনশিয়াল (E_h) পাওয়া যায়। উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ রেডক্স সিস্টেমের E_0' এর মান সারণি দেখানো ১০.১ –এ হয়েছে।

ক NAD^+ এবং $NADP^+$ এর একই রেডক্স পটেনশিয়াল

খ FAD অথবা RMN এর অংশ হিসেবে রাইবোফ্ল্যাভিনের বিভিন্ন রকম রেডক্স পটেনশিয়াল আছে।

শক্তির যুগলায়ন (Energy coupling)

উদ্ভিদ কোষে একটি এক্সারগোনিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয়, তা আবার অন্য একটি এন্ডারগোনিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এটি সংঘটিত হয় শক্তির যুগলায়নের বিক্রিয়ার মাধ্যমে। শক্তি অবশ্য একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে অন্য বিক্রিয়ায় সরাসরি যেতে পারে না। এজন্য দুটি বিক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ বিক্রিয়ক থাকতে হয়। সাধারণত শক্তিসমৃদ্ধ যৌগের মাধ্যমে উদ্ভিদে শক্তির আদান প্রদান হয়।

শক্তিসমৃদ্ধ যৌগ

উদ্ভিদের সব জীবিত কোষে যে যৌগটি এন্ডারগোনিক প্রক্রিয়ার সাথে এক্সারগোনিক প্রক্রিয়ায় সংযোগ ঘটায়, তা হলো ATP। এটি হলো উচ্চ শক্তিসমৃদ্ধ এক প্রকার যৌগ, কারণ আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে এর মুক্ত শক্তি নির্গত হয়।

$$ATP \rightarrow ADP + ip \quad \ldots (১০.২৪)$$

$\Delta G' = -৮.৪$ কিলোক্যালরি/মোল [pH=৭.০]

ADP থেকে ATP তৈরির সময় আরো দুটি শক্তিসমৃদ্ধ ফসফেট যৌগ, ১,৩-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এবং ফসফোএনল পাইরুভিক অ্যাসিড, অংশগ্রহণ করে। গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড রূপান্তরের সময় এবং উভয়েরই আর্দ্রবিশ্লেষণের আদর্শ মুক্ত শক্তি ATP এর তুলনায় অধিকতর ঋণাত্মক।

অ্যাসাইল ফসফেট : ১,৩-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড মূলত অ্যাসাইল ফসফেটের একটি উদাহরণ ; এর আর্দ্রবিশ্লেষণের আদর্শ মুক্ত শক্তির পরিমাণ –১১.৮ কিলোক্যালরি/মোল।

১,৩-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড → ৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ... (১০.২৫)

$\Delta G' = ১১.৮$ কিলোক্যালরি/মোল (pH ৭.০)

এনোলিক ফসফেট : গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড রূপান্তরে ADP থেকে ATP তৈরির সময় যে যৌগ শক্তি সরবরাহ করে, তা হলো ফসফোএনল পাইরুভিক অ্যাসিড। এই শক্তিসমৃদ্ধ এনোলিক ফসফেটের আর্দ্রবিশ্লেষণের সময় যে মুক্ত শক্তি পরিবর্তন হয় তার পরিমাণ –১৪.৮ কিলোক্যালরি/মোল।

অর্থাৎ $\Delta G' = -১৪.৮$ কিলোক্যালরি/মোল (pH ৭.০)।

থায়োল ইস্টার : ADP থেকে ATP তৈরিতে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রকার শক্তিসমৃদ্ধ যৌগ হলো থায়োলইস্টার, অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ। এই যৌগের আর্দ্রবিশ্লেষণের $\Delta G'$ হলো প্রায় –৭.৫ কিলোক্যালরি/মোল।

একাদশ অধ্যায়

জৈব ঘড়ি

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কতকগুলো ছন্দময় বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রকাশ পায় একেই বলা হয় জৈব ঘড়ি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো, বিশেষ করে দিনরাত্রির পরিবর্তনের জন্য প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যগুলো এতো প্রকট যে, তা সহজেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। আবার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বেশ সূক্ষ্ম।

জৈব ঘড়ির ধারণা

জীবের ছন্দময় বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকদিন আগেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেক উদ্ভিদের পাতার অবস্থান দিনের বেলা এক রকম হয় (সাধারণত প্রায় আনুভূমিক) এবং রাতের মাঝখানে অন্য রকম (সাধারণত প্রায় খাড়া) হয়। এটি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন অ্যানড্রোসথেনিস (Androsthenes) খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় চতুর্থ অব্দে। ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি জ্যোতির্বিদ ডিম্যারিয়ান (DeMarian) পাতার চলনের বিষয়ে পুনরায় নতুনভাবে গবেষণা শুরু করেন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য (প্রাত্যহিক আলো-অন্ধকার চক্র) কি এই চলন হয়, নাকি উদ্ভিদের অন্তঃস্থ সময়-পরিমাপন কোনো পদ্ধতি দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কেবল বহিঃস্থ পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য পাতার চলন হয়, তাকে বহিঃস্থ সময় পরিমাপক এবং যদি অন্তঃস্থ ঘড়ির প্রতিক্রিয়ায় হয়, তাহলে তাকে অন্তঃস্থ পরিমাপক বলা হয়। সংবেদনশীল উদ্ভিদ (*Mimosa* প্রজাতি) নিয়ে ডিম্যারিয়ান লক্ষ্য করেন যে, এই উদ্ভিদকে খুব বেশি ছায়াতে রাখলেও এদের চলন হয়। যেহেতু ২৪ ঘণ্টা চক্রের কোনো অংশে এই চলনের জন্য প্রখর সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়নি। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই চলন অন্তঃস্থভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

চার্লস ডারউইন এবং জুলিয়াস ভন স্যাকসসহ কতিপয় প্রাথমিক গবেষক এই ছন্দময়তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ সম্পর্কিত প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। তবে তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটির গভীরে প্রবেশ করেননি। প্রাথমিক গবেষকদের মধ্যে যিনি এ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন, তিনি হলেন উইলহেলম পিফার (Wilhelm Pfeiffer)। তিনি বীন গাছের (*Phaseolus vulgaris*) পাতার চলনের উপর বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং ১৮৭৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। জীবের অন্তঃস্থ ছন্দময় বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি জৈব ঘড়ি (biological clock)নামে অভিহিত করেন। প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ছন্দময়তার কথা প্রথম উল্লেখ করেন বিজ্ঞানী এ কিসেল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। পিফারের সময়ে প্রাণিতত্ত্ববিদগণও প্রাণীতে ছন্দময়তা, বিশেষ করে দিন-রাত্রিগত (diurnal) ছন্দময়তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

১৯২০ দশকে জৈব ঘড়ি সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায়। রোজ স্টোপেল (Rose stoppel) জার্মানির হামবুর্গে পিফারের বীন উদ্ভিদের পাতার চলন বিষয়ক গবেষণা আরো সম্প্রসারিত করেন। বিজ্ঞানী স্টোপেল লক্ষ্য করেন যে, অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অপরিবর্তনীয়

তাপমাত্রায় পাতার চলন পরিমাপ করা হলে প্রত্যেক দিন একই সময়ে সর্বোচ্চ খাড়া অবস্থায় ছিল। যেহেতু এই সময়টি ছিল প্রায় ২৪ ঘন্টা, তাই স্টোপেল মনে করতেন যে, জৈব ঘড়ি সম্ভবত এতো সঠিক হবে না, পরিবেশের কোনো প্রভাবক অবশ্যই এই ঘড়ির প্রাত্যহিক চক্রকে পুনরায় শুরু করায়। যেহেতু উদ্ভিদগুলো অন্ধকারে এবং অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রায় ছিল। এই প্রভাবক দিবাদৈর্ঘ্য অথবা তাপমাত্রা নয়। স্টোপেল একে প্রভাবক X নামে অভিহিত করেন।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের দুজন তরুন উদ্ভিদবিজ্ঞানী আরউইন বানিং (Erwin Bünning) এবং কুর্ট স্টার্ন (Kurt Stern) ধারণা করেন যে, পরিবেশের ভৌত উপাদান, যেমন– বায়ুমণ্ডলের আয়নের পরিমাণ স্টোপেলের পরীক্ষায় পাতার চলনের সময় নির্দেশ করে। তাঁরা দেখতে পান যে, বায়ুমণ্ডলের আয়নে এই ছন্দময়তার উপর কোনো প্রভাব নেই, কিন্তু তাঁরা শনাক্ত করেন যে, স্টোপেলের প্রভাবক X হলো লাল আলো যা তিনি পানি প্রদানের সময় ব্যবহার করতেন। যখন এই প্রভাবক বাদ দেয়া হয়েছিল, তখন স্টোপেলের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পাতার সর্বোচ্চ খাড়া অবস্থা হয়েছিল প্রত্যেকদিন প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, সুতরাং অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বাইরের দিন ও রাত্রির সাথে আর পাতার চলনের সামঞ্জস্য থাকেনি। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রাঞ্জ হলবার্জ (Franz Halberg) একে সারকাডিয়ান (Circadian) ছন্দময়তা নাম দেন। ল্যাটিন ভাষায় সারকা মানে প্রায় এবং ডিয়েম মানে দিন। অর্থাৎ এজাতীয় বৈশিষ্ট্য সঠিক ২৪ ঘণ্টার দিনরাত্রি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

প্রোক্যারিওট–এ জৈব ঘড়ি এবং সারকাডিয়ান ছন্দময়তা অনুপস্থিত। কতিপয় ব্যাকটেরিয়াতে ছন্দময়তার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটি হয় কেবল পর্যায়ক্রমিক আলো ও অন্ধকার চক্রে। প্রোক্যারিওট–এ ছন্দময়তা আবিষ্কারের অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি।

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে ছন্দময় বৈশিষ্ট্য অনেক আছে। শীতকালে কতকগুলো বৃক্ষের পাতা পড়ে ন্যাড়া হয়ে যাওয়া কারোর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। পাতা ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে অ্যাবসিসিক স্তর সৃষ্টির ফলে পত্রপতন হয়। কতকগুলো উদ্ভিদের ফুল গ্রীষ্মকালে (দীর্ঘদিবা), কতকগুলোর ফুল শীতকালে (স্বল্পদিবা) এবং কতকগুলোতে আবার সারা বছরই ফুল ফোটে (ফটোপিরিওডিজম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির উপর এই ফুল ফোটা নির্ভর করে। সবুজ শৈবাল *Euglena*–এর ফটোট্যাকসিস এবং *Paramecium* এর মেটিং বিক্রিয়া হলো ছন্দময়তার উদাহরণ। *Dictyota* নামক এক প্রকার বাদামি শৈবালের পুং এবং স্ত্রী গ্যামেট কেবল পূর্ণিমার সময় নির্গত হয়।

Gonyaulx polyedra তে (একটি সামুদ্রিক দ্বি-ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শৈবাল) জৈব ঘড়ি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করেন ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রিপস ইন্সটিটিউট অব ওসানোগ্রাফিতে কর্মরত বিজ্ঞানী বেট্রিস সুইনি (Beatrice Sweeney) এবং জে. ডব্লিউ. হেস্টিংস (J.W. Hastings)। তাঁরা তিনটি পৃথক ছন্দময়তার অস্তিত্ব এতে পান। সবচেয়ে দর্শনীয় একটি ছন্দময়তা হলো বায়োলুমিনেসেন্স (bioluminescence) বা জৈব আলো। এদের দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয় এবং সর্বোচ্চ আলো বিচ্ছুরিত হয় প্রতি ২৩ ঘণ্টায় যা মধ্যরাতে সংঘটিত হয়। জনসন এবং সহকর্মীরা (Johnson *et al.*, 1984) দেখিয়েছেন যে, বায়োলুমিনেসেন্সের ছন্দময়তা এবং লুসিফারেজের (luciferase) ছন্দময়তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

কতিপয় ছত্রাকে ছন্দময়তা দেখা যায়। *Neurospora crassa*–এর কনিডিওরেণু তৈরিতে সারকাডিয়ান ছন্দময়তা দেখা যায় একটি লম্বা কালচার নলে আগারে জন্মানো মাইসেলিয়াতে পরপর অনেকগুলো কালো দাগ (প্রতিদিন একটি করে) আকারে। এই ছন্দময়তার একটি

বিশেষ গুরুত্ব আছে এই জন্যে যে, *Neurospora*-এর বেশ কয়েকটি ঘড়ি মিউট্যান্ট আছে। ছত্রাকের অপর একটি উদাহরণ হলো *Pilobolus*-এ রেণুর বিসরণে ছন্দময়তা।

অধিকাংশ উদ্ভিদে কোষ বিভাজন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে। সর্বোচ্চ কোষ বিভাজন হয় অতি প্রত্যুষে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতার চলন, সর্বোচ্চ মাইটোটিক এবং মিওটিক কোষ বিভাজন, নিউক্লিয়াসের আয়তন, পুষ্পায়ন, বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধির হার, রাতে যেসব ফুল ফোটে তাদের থেকে সুগন্ধ ছড়ানো (পরাগায়নের জন্য), কতকগুলো রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ, কতিপয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে (যেমন সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, অক্সিন তৈরি) ছন্দময়তা দৃষ্ট হয়।

প্রাণীর ক্ষেত্রেও ছন্দময়তা দেখা যায়। মুরগির ডিম দেয়ার সাথে ঝুঁটি, কণ্ঠের মাংসল উপাঙ্গের বৃদ্ধি এবং গাঢ় লাল রঙের সৃষ্টি ছন্দময়ভাবে পরিবর্তিত হয়। কতকগুলো প্রাণীর যৌন মিলনের সময় নির্দিষ্ট থাকে। যেমন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সাপ ও টিকটিকির ক্ষেত্রে এই সময় বসন্তকাল এবং কুকুরের অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। গুনিয়ন নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র মাছ, যা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে বাস করে, ফেব্রুয়ারির শেষার্ধ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ণিমা রাতে ডিম পাড়ে। ফাইলেরিয়া (গোদ রোগ) রোগীর ব্যথা ও ফোলা শুক্রপক্ষ এবং পূর্ণিময় বৃদ্ধি পায়।

যাযাবর পাখিদের শীতের প্রারম্ভে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার যে প্রবণতা, এটিও একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান এক বছর। একে সারকানুয়াল (circannual) ছন্দময়তা বলে। পরীক্ষাগারে ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সব সময় খাবার থাকলেও, এরা সাধারণত দুঘণ্টা অন্তর অন্তর খাবার খায়। নিশাচর প্রাণীরা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার সক্রিয় হয়। ড্রসোফিলা নামক এক প্রকার পতঙ্গ ভোরের সময় সবচেয়ে বেশি ডিম পাড়ে। এ থেকে কারো কারো ধারণা হতে পারে যে, প্রাত্যহিক দিনরাত্রির পরিবর্তনের সাথে এই ছন্দময়তা সম্পর্কযুক্ত। এটিই একমাত্র কারণ নয়। যখন প্রাণীকে কোনো অপরিবর্তনশীল পরিবেশে (যেমন– গবেষণাগারে অবিচ্ছিন্ন আলোকে) রাখা হয়, তখনও এই রকম অনেক ছন্দময়তা চলতে থাকে।

মানুষের ক্ষেত্রেও, অনেক সারকাডিয়ান ছন্দময়তা পরীক্ষা করা হয়েছে যদিও মানুষের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা বেশ কঠিন। মানুষের এই ছন্দময়তা, যেমন– ঘুম এবং কার্য, মূত্র নিঃসরণ, শরীরের তাপমাত্রা এবং হৃৎস্পন্দন, অন্যান্য জীবের ছন্দময়তার মতোই কাজ করে।

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর এই ছন্দময়তা অন্তঃস্থ প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না। মহাজাগতিক রশ্মি, পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্র, পৃথিবীর আবর্তন প্রভৃতি বহিঃস্থ প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। এই বিতর্ক নিরসনের চেষ্টায় অস্বাভাবিক পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এরজন্য জীবকে খনির অভ্যন্তরে, দক্ষিণ মেরুতে, প্লেনে করে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিয়ে গবেষণা করা হয়। অতি সম্প্রতি স্যাটেলাইট গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা একটি ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, এই ছন্দময়তা অন্তঃস্থ অর্থাৎ এর উৎপত্তি জীবকোষের অভ্যন্তরেই। এই ছন্দময়তা অন্তঃস্থ হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে পরিবর্তিত হয়। যতোদিনই পরিবর্তিত পরিবেশে থাকুক না কেন, স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে ফেলে এদের ছন্দময়তাও স্বাভাবিক হয়।

অনেক উদ্ভিদ দিনের বেলায় তাদের পাতা আনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে দেয় ; এরফলে বেশি পরিমাণ সূর্যালোক শোষিত হয়। রাতে আবার এদের পাতা ঝুলে পড়ে। এছাড়াও কতকগুলো এনজাইমের পরিমাণ, কোষস্থ কতিপয় আয়নের ঘনমাত্রা, অনেক ওষুধ এবং অন্যান্য

রাসায়নিক পদার্থের সংবেদনশীলতা ছন্দময়ভাবে পরিবর্তন হয়। অবশ্য এতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই। কেননা সব জীবের উদ্ভব হয়েছে এমন এক ছন্দময় পৃথিবীতে যেখানে দিন ও রাত্রি একটি সুনির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত হয়। অন্যান্য পরিবেশীয় প্রকরণ, যেমন- তাপমাত্রা এবং বায়ুর চাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু আলোআঁধারের মতো নিয়মিতভাবে নয়। আরেকটি বিষয় হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাত্যহিক ছন্দময়তার উপর তাপমাত্রার প্রভাব খুব সামান্য, যদিও অনেক জৈব প্রক্রিয়া তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

জৈব ঘড়ি কিভাবে কাজ করে

জৈব ঘড়ি কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানীরা দুটি প্রকল্প উপস্থাপন করেছেন। প্রকল্প দুটি পরস্পরবিরোধী হলেও, এদের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। একটি প্রকল্পে বলা হয়েছে যে, ঘড়ি সম্পূর্ণরূপে অন্তঃস্থ এবং কোষীয় পর্যায়ে জৈব-রাসায়নিক দোলন (oscillation) কৌশল কাজ করে। এর সাথে পেন্ডুলাম ঘড়ির তুলনা করা যেতে পারে। কতগুলো কোষীয় পদ্ধতির, যেমন- জটিল এনজাইম বিক্রিয়া সিরিজ, কোষঝিল্লির ভেদ্যতার বৈষম্য ইত্যাদির নিয়মিত পরিবর্তনের ফলে দোলন ক্রিয়া করে।

দ্বিতীয় প্রকল্পেও বলা হয় জৈব ঘড়ি অন্তঃস্থ, তবে বাহ্যিক প্রকরণের জন্য এটি কাজ করে। এই কোষীয় ঘড়িকে বৈদ্যুতিক ঘড়ির মোটরের সাথে তুলনা করা চলে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যেমন- বৈদ্যুতিক ঘড়ি চলে, তেমনি ভৌত পরিবেশের প্রকরণগুলোর (যেমন- চৌম্বক অথবা তড়িৎ ক্ষেত্র, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি) নিয়মিত পরিবর্তনের জন্য ঘড়ি সচল থাকে। পরীক্ষণের জটিলতার কারণে কোন প্রকল্পই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তাই জৈব ঘড়ি জীব-বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময় এবং চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়েই রয়েছে।

জৈব ঘড়ির শারীরতত্ত্ব

একটি প্রশ্ন হলো যে জৈব ঘড়ি কিভাবে শুরু হয়। এর উত্তর হলো যে, একটিমাত্র উদ্দীপনা এটি শুরু করার জন্য যথেষ্ট। এই উদ্দীপনা হতে পারে আলোর প্রখরতা, তাপমাত্রা অথবা পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে জই-এর চারাগাছের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। জই-এর চারা অবিচ্ছিন্ন লাল আলোতে রাখলে এর বৃদ্ধির কোনো ছন্দময়তা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু এই পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে অপসারিত করে অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে রাখলে বৃদ্ধি হারের ছন্দময়তা পরিদৃষ্ট হয়। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি জীবের নিজস্ব দোলন সিস্টেম আছে যার এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বংশানুসরণ হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্দীপিত না হলে এই সিস্টেম কার্যকর হয় না। উপরন্তু, এটি দেখা গেছে যে, কৃত্রিম আলো-আঁধার চক্র প্রদান করে এই ঘড়ি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করা যায়, কিন্তু এই জীবকে এর প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনলে দোলনের প্রাকৃতিক সময় আবার ফিরে আসে।

অক্সিজেনের নিম্ন আংশিক চাপ এবং তাপমাত্রাও আলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে জৈব ঘড়ির রিসেট করা যেতে পারে। যেমন- যদি কোনো জীব দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকারে একটি নির্দিষ্ট ছন্দময়তা দেখায়, তাহলে সামান্য সময়ের জন্য আলোতে ছন্দময়তার পরিবর্তন হয়। তবে এটি অন্যান্য প্রভাবক, যেমন- চক্রের কোনো সময়ে উদ্দীপনা প্রদান করা হয় অথবা উদ্দীপনার স্থিতিকালের উপর নির্ভরশীল। *Bryophyllum* (একটি CAM উদ্ভিদ) এর পাতা নিয়ে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিপাকের একটি অবিচ্ছিন্ন ছন্দময়তা আছে, কিন্তু পাতাগুলোকে প্রায় ৬ ঘণ্টা আলোতে রাখলে ছন্দময়তার দশার পরিবর্তন হয়।

Bryophyllum উদ্ভিদের পাতাকে এক ঘণ্টা আলোতে রাখলে ছন্দময়তার কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু প্রায় ৬ ঘণ্টা রাখলে ছন্দময়তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। তিন অথবা ছয় ঘণ্টার জন্য প্রায় ২৬ থেকে ৩৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য একইভাবে ছন্দময়তার দশার পরিবর্তন ঘটায়। যান্ত্রিক ঘড়ির মতো জৈব ঘড়িও বিশ্বাসযোগ্য এবং কেবল পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য জৈব ঘড়ি ভুল ফলাফল দেখায়। এটি থেকে ধারণা করা যায় যে, জৈব ঘড়ির ভিত্তি হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া, প্রতি ১০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এই হার দ্বিগুণ হয় কিন্তু স্পষ্টতই এদের তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ করার কৌশল আছে যা দোলন সময়ের বিভিন্নতা দূর করার চেষ্টা করে।

জৈব ঘড়ি চালানোর জন্য শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন আছে এবং বিপাক কার্য থেকে এরা শক্তি পায় এবং অবায়ুজীবী অবস্থায় অথবা প্রায় ০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জীবকে রাখলে বিপাককার্য অচল হওয়ায় জৈব ঘড়িও বন্ধ হয়ে যায়। চক্রের বিভিন্ন অংশে জৈব ঘড়ির শক্তির প্রয়োজনীয়তারও ভিন্নতা হয়। *Bryophyllum* এবং বিনের চারাগাছের চক্রের কোনো অংশে কয়েক ঘণ্টার জন্য অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করলে ছন্দময়তার কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু অন্য অংশে ছন্দময়তার পরিবর্তন হয়। নিম্ন তাপমাত্রারও একই রকম প্রভাব আছে, কেননা এটি বিপাকের হারকে কমিয়ে দেয়। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, জৈব ঘড়ির কার্যকারিতার জন্য শক্তির দরকার হয়, তবে এই শক্তির সরবরাহ অবিচ্ছিন্নভাবে হতে হবে কিনা তা অবশ্য সুস্পষ্ট নয়।

জৈব ঘড়ির অবস্থান এবং এর রাসায়নিক গঠন

বিভিন্ন জীবে জৈব ঘড়ির অবস্থান নির্ণয় হলো অপর একটি সমস্যা যা বিজ্ঞানীদের সমাধান করতে হবে। এককোষী জীবে একটিমাত্র কোষেই সবকিছু শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পন্ন হয়। তাই বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো জৈব ঘড়ির অবস্থান কোথায়। কতকগুলো প্রাণীতে, যেমন– আরশোলা, এটি কতিপয় সুনির্দিষ্ট কোষে অবস্থিত অথবা জীবের প্রতিটি কোষেরই নিজস্ব ঘড়ি থাকতে পারে। *Bryophyllum* এর পাতার প্রতিটি মেসোফিল কোষেই এর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকারী সিস্টেম আছে এবং কার্বন ডাই–অক্সাইডের বিপাকের ছন্দময়তা দেখায়। তবে এটি এখনো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, সব উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের সবকোষেই এটি অবস্থিত অথবা কতিপয় সুনির্দিষ্ট কোষে অথবা অঞ্চলে অবস্থিত।

জৈব ঘড়ির অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর প্রকৃত রাসায়নিক কৌশল সুনিশ্চিত করতে এটি সাহায্য করে। এককোষী শৈবাল *Acetabularia* নিয়ে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। পরীক্ষণের জন্য এই শৈবাল ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য যে, এর আকার বৃহৎ এবং পরীক্ষার প্রয়োজনে এর নিউক্লিয়াসকে সহজেই অপসারণ কিংবা সংযোজন করা যায়।

এটি দেখা গেছে যে, সালোকসংশ্লেষণের ছন্দময়তা স্থায়ী হয়। নিউক্লিয়াস উপস্থিত থাকুক বা নাই থাকুক, আলোর প্রখরতার পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ছন্দময়তার পরিবর্তন ঘটানো যায়। এই পর্যবেক্ষণ নির্দেশ করে যে, জৈব ঘড়ি নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নয়, তবে এটিও সরাসরি বলা যাবে না যে, জৈব ঘড়ি নিয়ন্ত্রণে নিউক্লিয়াসের কোনোই ভূমিকা নেই। *Acetabularia*–কে আলো ও অন্ধকার চক্রে, পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য প্রায় ১২ ঘণ্টা, জন্মালে দুটি স্টকের সালোকসংশ্লেষণের ছন্দময়তার পার্থক্যও হয় ১২ ঘণ্টা। এখন একটি স্টকের নিউক্লিয়াস অপসারণ করে অন্য স্টকে স্থাপন করা হলে এবং দুটি স্টককে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা হলে দেখা যায় যে, নিউক্লিয়াস–প্রতিস্থাপিত কোষে এবং আলো অন্ধকার চক্রে রাখা কোষের ছন্দময়তা একই রকম।

তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে, জৈব ঘড়ির অবস্থান সাইটোপ্লাজমে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে, তবে কোষে নিউক্লিয়াস থাকলে কার্য নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।

তবে *Acetabularia*-এর নিউক্লিয়াসবিহীন কোষে ছন্দময়তার স্থায়িত্ব থাকলেও তা প্রমাণ করে না। জৈব ঘড়িতে নিউক্লিক অ্যাসিডের কোনো ভূমিকা নেই। কেননা বিভিন্ন গবেষণায় ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে প্রচুর পরিমাণে DNA পৃথক করা হয়েছে এবং দেখা গেছে এর কারণে নিউক্লিয়াসবিহীন কোষেও RNA সংশ্লেষণ চলতে থাকে। কোষে উচ্চমাত্রার অ্যাকটিনোমাইসিন ডি, প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং RNA এর কাজে যার ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হয় তা, প্রয়োগ করলেও এই ছন্দময়তা স্থায়ী হয়। এই ফলাফল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রভাব ছাড়াই জৈব ঘড়ি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

Bryophyllum-এর পাতার পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, পাতায় অবস্থিত জৈব ঘড়ির পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ছন্দময়তা সৃষ্টি হয়। পাতায় কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণে কতকগুলো এনজাইম অংশ নেয়, কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হলো ফসফোএনল পাইরুভিক কার্বোক্সিলেজ। কিন্তু যে সব উদ্ভিদের কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণের হার শূন্য, তাদের পাতাতেও এই এনজাইম উপস্থিত থাকে। তাই দোলন সিস্টেমের জন্য এনজাইম অথবা নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাকের উপস্থিতির মাধ্যমে *Bryophyllum*-এর কার্বন ডাই-অক্সাইড বিপাকের ছন্দময়তা হয় বলে প্রতীয়মান হয় না।

বর্তমানে জৈব ঘড়ির অবস্থান সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া না গেলেও, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সারকাডিয়ান ছন্দময়তায় নিউক্লিক অ্যাসিডের খুব সামান্য কিংবা একেবারেই কোনো ভূমিকা নেই।

অনেকদিন ধরেই প্রাণিতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রাণীর চোখে জৈব ঘড়ির অবস্থান। কিন্তু ১৯৫০ দশকে একটি পরীক্ষায় দেখা যায় হাঁসের চোখ অপসারিত করলেও, দীর্ঘ দিবালোকের প্রতিক্রিয়ায় গোনাডের বিকাশ হয়। ষাটের দশকে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল মেনাকার (Michael Menaker) দেখান যে, অন্ধ চড়ুই পাখির (দুই চোখই অপসারিত) আলো প্রভাবে ছন্দময়তা পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরো সুনিশ্চিত করেন যে, দীর্ঘ দিবালোকের প্রতিক্রিয়ায় অন্ধ চড়ুই পাখির, অন্ধ হাঁসের মতো, পুংজনন্দ্রীয়ের বিকাশ হয়। উপরন্তু, তিনি দেখান যে, স্বাভাবিক চক্ষুবিশিষ্ট পাখির ছন্দময়তার উপর ক্ষীণ সবুজ আলোর প্রভাব আছে, কিন্তু এটি দিবাদৈর্ঘ্যের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না। মগজের পিনিয়াল (pineal) গ্রন্থি প্রকৃতপক্ষে আলোতে সংবেদনশীল। পর্যাপ্ত আলো, বিশেষ করে লাল আলো, মাথার খুলির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে কার্যকর হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই গ্রন্থিকে 'তৃতীয় নয়ন' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, পাখিতে এটি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। মেনাকার এবং তাঁর সহকর্মীরা পিনিয়াল গ্রন্থির উপর আলোর প্রতিক্রিয়া এবং জৈব ঘড়ির উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করেছেন। গোনাডীয় ঘড়ি পিনিয়াল গ্রন্থিতে অবস্থিত এবং হরমোনের মাধ্যমে এই প্রভাব পরিবাহিত হয়। এক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের কোনো ভূমিকা নেই।

জৈব ঘড়ির ব্যবহারিক গুরুত্ব

জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের উপর জৈব ঘড়ির যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকায়, জৈব ঘড়ির অনেক সুবিধা আছে। যেমন- পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ ড্রসোফিলা বের হয় ঠিক প্রত্যুষের আগে, যখন বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা সর্বোচ্চ থাকে এবং পোকার শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায় দোলন সিস্টেম এই সময় নির্ধারণ করে।

এভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানেও জৈব ঘড়ির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যেমন– দিনের বিভিন্ন সময়ে প্রাণীর ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। একটি জীব থেকে অন্য জীবে জৈব ঘড়ি স্থানান্তর করা যায়, যেমন– আরশোলার সাবইসোফেগাল গ্যাংলিয়নে জৈব ঘড়ি অবস্থিত এবং একে সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

মানুষের অনেক শারীরতাত্ত্বিক কার্যে ছন্দময়তা আছে, যেমন– শরীরের তাপমাত্রা, আয়ন, পানি নিঃসরণ এবং নাড়ির স্পন্দন। অপরিবর্তনশীল পরিবেশে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাপমাত্রা এবং আলোর প্রখরতার পরিবর্তনের সাথে এই ছন্দময়তা সম্পর্কিত নয়। বর্তমানে অনেক উদাহরণ আছে, যেমন– ঘুমের প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তনের জন্য (কলকারখানা, হাসপাতালে শিফট পরিবর্তনের জন্য অথবা দ্রুতগামী জেট এরোপ্লেনে পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ভ্রমণের জন্য) শরীরের ছন্দময়তা এবং পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিক সুসামঞ্জস্যতা নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কার্য এবং ঘুমের নতুন চক্রের সাথে শরীরের ছন্দময়তাকে সামঞ্জস্য করতে হয়। হঠাৎ করে অবশ্য এটি হয় না, নতুন কার্যের সাথে কতকগুলো শরীরের ছন্দময়তার সামঞ্জস্য হয়, অন্যগুলোর হয় না। কি হারে শরীরের ছন্দময়তার সামঞ্জস্য হয় তা বিভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন। এটি দেখা গেছে যে, প্রাত্যহিক কাজ বা ঘুমের পরিবর্তনের জন্য ভ্রমণকারীরা বা কলকারখানার শ্রমিকরা বেশি ক্লান্তি বোধ করেন। তারা অবশ্য নতুন পরিবেশে কয়েকদিন খাপ খাইয়ে নিলেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যান।

একটি জীবের কাজের ধারা এবং ঘুমের উপর এই ছন্দময়তার কি প্রভাব আছে, তা এখনো অজ্ঞাত, কিন্তু এর জন্য প্রায়ই শরীর খারাপ লাগে এবং ক্লান্তিবোধ হয়। শিফট কাজ এবং পূর্ব–পশ্চিম দ্রুত ভ্রমণের জন্য কিছু কিছু মানুষ অধিকতর উপযোগী, কেননা তারা কার্যের নতুন প্যার্টান এবং ঘুমের সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক সমাজে সব জীবে উপস্থিত জৈব ঘড়ি সিস্টেমের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Aronoff, S., J. Dainty, P.R. Gorham, L. M. Srivastava and C.A. Swanson. 1975. *Phloem Transport*. Plenum Press, New York.

Bassham, J.A. and M. Calvin. 1975. *The Path of Carbon in Photosynthesis*. Englewood Cliffs, New Jersey, Prantice-Hall.

Bidwell, R.G.S. 1979. *Plant Physiology*. McMillan Publishing Co., New York.

Carry, M.J. 1973. *Phloem Translocation*. Cambridge University Press.

Conn, E.E., P.K. Stumpf, G. Bruening and R.H. Doi. 1987. *Outlines of Biochemistry*. Wiley, New York.

Davies, P.J. ed. 1987. *Plant Hormones and Their role in Plant Growth* and *Development*. Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands.

Evans, L.T. 1969. *The Induction of Flowering*. MacMillan, Australia.

Epstein, E. 1972. *Mineral Nutrition of Plant : Principles and Perspective*. Wiley, New York.

Goodwin, T.W. and E.I. Mercer, 1982. *Introduction to Plant Biochemistry*. Pergamon Press, Oxford.

Gurr, A.L. and A.T. James. 1980. *Lipid Biochemistry : An Introduction*. Wiley, New York.

House, C.R. 1974. *Water Transport in Cells and Tissues*. Edward Arnold London.

Khan, A. A. Ed. 1982. *The Physiology and Biochemistry of Seed Development, Dormancy and Germination*. Elsevier Biomedical Press, Amsterdam.

Kluge, M. and I.P. Ting. 1978. *Crassulacean Acid Metabolism*. Springer-Verlag, Berlin.

Kozlowski, T. T. 1968-1976. *Water Deficits and Plant Growth*. Vol. I-IV. Academic Press, New York.

Mahler, H.R. and E. H. Cordes. 1971. *Biological Chemistry*. Harper and Row Publishers, New York.

Marschner, H. 1986. *Mineral Nutrition of Higher Plants*. Academic Press, London.

Meidner, H. and D. W. Sheriff. 1976. *Water and Plants*. Blackie, London.

Milburn, J.A. 1979. *Water Flow in Plants*. Longman, London.

Moorby, J. 1981. *Transport Systems in Plants*. Longman, London.

Moore, T.C. 1980 *Biochemistry and Physiology*. Freeman, San Francisco.

Noggle, G.R. and G.J. FritZ. 1991. *Introductory Plant Physiology*. Prantice-Hall (India) Ltd., New Delhi.

Racker, E. 1976. *A New Look at Mechanisms in Bioenergetics*. Academic Press, New York.

Roberts, E. H. (ed.). 1972. *Viability of Seeds*. Chapman and Hall Ltd., London.

Salisbury, F.B. 1963. *The Flowering Process*. Pergaman Press, New York.

Salisbury, F.B. and C.W. Ross. 1986. *Plant Physiology*. CBS Publishers and Distributers, New Delhi.

Slayter, R.O. 1967. *Plant-Water Relationships*. Academic Press, New York.

Smith, H. 1975. *Phytochrome and Photomorphogenesis*. McGraw-Hill, London.

Stryer, L. 1988. *Biochemistry*, CBS Publishers and Distributors, New Delhi.

Thimann, K.V. (ed.). 1980. *Senescence in Plants*. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Wilkins, M.B. 1987. *Advanced Plant Physiology*. Pitman Press, London.

পাল, নিশীথ কুমার। ১৯৯৮। *শস্য শারীরবিজ্ঞান* (১ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পাল, নিশীথ কুমার ১৯৯৮। *শস্য শারীরবিজ্ঞান* (২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রায়, শ্যামল কুমার ও পাল নিশীথ কুমার। ১৯৯৫। *সাধারণ উদ্ভিদবিজ্ঞান* (২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

BANSDOC Library
Accession No. 18137

BANSDOC Library Dhaka